# এগ্রোবেসড ফুড-২

## এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

# এগ্রোবেসড ফুড-২

# Agrobased Food-2

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

## নবম ও দশম শ্রেণি


লেখক ঃ

**কৃষিবিদ মো. মোসারফ হোসেন**

এমএসসি.এজি (উদ্যানতত্ত্ব), এমএড, বিসিএস (কৃষি)

সম্পাদক ঃ

**কৃষিবিদ আব্দুস সাত্তার মোল্লা**

বিএসসি,এজি অনার্স (উদ্যানতত্ত্ব), বি.এ.ইউ, ময়মনসিংহ

এমএস (সম্প্রসারণ) এ.ইউ.বি, লেবানন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড**
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

---

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

**ডিজাইন**
**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

---

মুদ্রণে:

# প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# সূচিপত্র


| ১ম পত্র - নবম শ্রেণি | | |
|---|---|---|
| অধ্যায় | তাত্ত্বিক | পৃষ্ঠা |
| অধ্যায়-১ | ফল ও সবজির পরিচিতি | ১ |
| অধ্যায়-২ | ফল ও সবজি সংগ্রহ | ২৭ |
| অধ্যায়-৩ | ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে বিবেচ্য বিষয় | ৪২ |
| অধ্যায়-৪ | ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর অপচয় | ৫১ |
| অধ্যায়-৫ | ফল ও সবজি প্যাকেজিং | ৬০ |
| অধ্যায়-৬ | ফল ও সবজি প্যাকিং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা | ৭০ |
| অধ্যায়-৭ | ফল ও সবজির মান অনুযায়ী শ্রেণিভুক্তকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ | ৭৭ |
| অধ্যায়-৮ | ফল ও সবজি সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিতরণ | ৮৩ |
| অধ্যায়-৯ | ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ | ৯৮ |
| | ব্যবহারিক | |
| অনুশীলনী -১ | ফল ও সবজি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন অনুশীলন | ১০৫ |
| অনুশীলনী -২ | বিভিন্ন ফল ও সবজির পুষ্টিমান তালিকা তৈরি অনুশীলন | ১০৭ |
| অনুশীলনী -৩ | ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর পরিষ্কার, বাছাই ও গ্রেডিং করা অনুশীলন | ১০৮ |
| অনুশীলনী -৪ | ফল পাড়া ও সবজি সংগ্রহের পাত্র ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন, ব্যবহার অনুশীলন | ১০৯ |
| অনুশীলনী -৫ | বিভিন্ন ধরনের মোড়ক ও প্যাকেজিং দ্রব্য ব্যবহার অনুশীলন | ১১১ |
| অনুশীলনী -৬ | প্যাকিং শেডের কার্যক্রম অনুশীলন | ১১২ |
| অনুশীলনী -৭ | কলা সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা অনুশীলন | ১১৪ |
| অনুশীলন -৮ | আম সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা অনুশীলন | ১১৬ |
| অনুশীলনী -৯ | আনারস সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা অনুশীলন | ১১৭ |
| অনুশীলনী-১০ | স্টিপিং পদ্ধতিতে সবুজ ফল সংরক্ষণ অনুশীলন | ১১৯ |
| অনুশীলনী-১১ | অপরিপক্ব বীজযুক্ত সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা অনুশীলন | ১২১ |
| অনুশীলনী-১২ | পরিপক্ব বীজযুক্ত সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা অনুশীলন | ১২২ |
| অনুশীলনী-১৩ | মাইক্রো ওভেনের ব্যবহার অনুশীলন | ১২৩ |
| অনুশীলনী-১৪ | প্রেসারকুকার ব্যবহার অনুশীলন | ১২৪ |
| অনুশীলনী-১৫ | এগ্রোবেসড ফুড ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতির পরিচিতি ও ব্যবহার অনুশীলন | ১২৬ |
| অনুশীলনী-১৬ | ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সাধারণ নিয়মাবলি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন | ১৩৩ |

| ২য় পত্র - দশম শ্রেণি | | |
|---|---|---|
| অধ্যায় | তাত্ত্বিক | পৃষ্ঠা |
| অধ্যায়-১ | ফল ও সবজি সংরক্ষণ | ১৩৭ |
| অধ্যায়-২ | ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ | ১৫৬ |
| অধ্যায়-৩ | ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি ও ব্যাবস্থাপনা | ১৭৪ |
| অধ্যায়-৪ | আম ও কাঁঠালের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য | ১৯৪ |
| অধ্যায়-৫ | কলা থেকে উৎপাদিত খাদ্য | ২১৩ |
| অধ্যায়-৬ | পেয়ারা, কমলা ও লেবু জাতীয় ফল থেকে খাদ্য | ২২০ |
| অধ্যায়-৭ | আনরস, পেঁপে ও লিচু থেকে খাদ্য | ২৩২ |
| অধ্যায়-৮ | কুল, আমড়া, চালতা, তেঁতুল, করমচা, জলপাই ও আমলকী থেকে খাদ্য | ২৪৫ |
| অধ্যায়-৯ | টমেটো থেকে উৎপাদিত খাদ্য | ২৬১ |
| অধ্যায়-১০ | বিভিন্ন ধরনের সবজি থেকে খাদ্য | ২৭২ |
| | ব্যবহারিক | |
| অনুশীলনী -১ | ফল ও সবজির সংরক্ষণ দক্ষতা সম্পর্কে অনুশীলন | ২৮১ |
| অনুশীলনী -২ | খাদ্য প্রক্রিয়াজাকরণে পরিচ্ছন্নতা ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ অনুশীলন | ২৮১ |
| অনুশীলনী -৩ | কলার চিপস তৈরির দক্ষতা অর্জন | ২৮৩ |
| অনুশীলনী -৪ | লবণের দ্রবণে ফল, সবজি ও মসলা সংরক্ষণ | ২৮৪ |
| অনুশীলনী -৫ | ফ্রিজিং পদ্ধতিতে মটরশুঁটি ও গাঁজরের ফালি সংরক্ষণ | ২৮৫ |
| অনুশীলনী -৬ | রিফ্র্যাক্টোমিটারের ব্যবহার | ২৮৬ |
| অনুশীলনী -৭ | সোলার ড্রায়ার ব্যবহার | ২৮৭ |
| অনুশীলনী -৮ | আম ও আনারসের স্কোয়াশ তৈরি অনুশীলন | ২৮৮ |
| অনুশীলনী -৯ | পেয়ারা ও আনারসের জেলী তৈরি অনুশীলন | ২৯০ |
| অনুশীলনী -১০ | চিনির সিরায় ফল সংরক্ষণ অনুশীলন | ২৯৪ |
| অনুশীলনী -১১ | ফলের রস বা পাল্প সংরক্ষণ অনুশীলন | ২৯৫ |
| অনুশীলনী -১২ | মিশ্র ফলের জ্যাম তৈরি | ২৯৬ |
| অনুশীলনী -১৩ | আমড়ার ঝাল আচার ও বরই তেঁতুলের চাটনি তৈরি অনুশীলনী | ২৯৭ |
| অনুশীলনী -১৪ | চালকুমড়ার মোরব্বা তৈরি | ৩০০ |
| অনুশীলনী -১৫ | টমেটের কেচাপ তৈরি | ৩০২ |
| অনুশীলনী -১৬ | ভিনেগার তৈরি | ৩০৩ |
| তথ্যপঞ্জি | | ৩০৪ |

# এগ্রোবেসড ফুড–২
## (১ম পত্র)
## নবম শ্রেণি
## ১ম অধ্যায়
## ফল ও সবজির পরিচিতি

### ১.১ ফল ও সবজির পরিচিতি

**ফলের পরিচিতি ও গুরুত্ব**

ফল আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন যথেষ্ট নয় বলে এর গুরুত্ব সেভাবে বিবেচনা করা হয় না। কোনো দেশের জীবনযাত্রার সাধারণ মান নির্ভর করে সে দেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণের ওপর।

স্মরণাতীত কাল থেকেই ফল আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকল মানুষের নিকট পছন্দের তালিকায় একটি সুখাদ্য হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ বছর পূর্বে খেজুর চাষ এর সাক্ষ্য বহন করে। মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক কলিকাতায় দারভাংগায় এক লক্ষ আমগাছের লাখবাগ নামে বাগান তৈরি, পর্তুগিজদের দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে আনারস ও পেঁপে চাষের প্রবর্তন ইত্যাদি হতে বোঝা যায় যে, ফলের প্রতি মানুষের আগ্রহ অতীতকাল থেকেই ছিল। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ফলকে বেহেস্তী খাবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলের স্বাদের প্রতি আমরা সবাই অনুরাগী হলেও অনেকে এর পুষ্টিমান এবং ফল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নই। ফল মানুষের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে ভরপুর। অন্যান্য খাবারের পরিপূরক হিসেবে ফল খাওয়া যায়। অধিকাংশ ফল দেখতে আকর্ষণীয়, সুস্বাদু এবং সকলের কাছে পছন্দনীয়। ফল রান্না ছাড়া সরাসরি খাওয়া যায় বলে এর পুষ্টিমান নষ্ট হয় না; তাই ফলের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সবটুকুই শরীর গ্রহণ করতে পারে। ফল প্রচুর পরিমাণ খেলেও তেমন অসুবিধা হয় না এবং পুষ্টিতে কোনো সমস্যা থাকে না। ফলে ভিটামিন এ (বিশেষ করে ক্যারোটিন যা ভিটামিন 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়). ভিটামিন 'সি'. ক্যালসিয়াম, লৌহ ও অন্যান্য উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাই মানবদেহের পুষ্টিতে ফলের অবদান অনেক বেশি। খাদ্য ঘাটতি পূরণেও ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। উন্নত দেশের মানুষ আমাদের তুলনায় বেশি পরিমাণে ফল খায় বলে তারা সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী এবং তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।

পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে, চিকিৎসা কাজে, খাদ্যে ঘাটতি পূরণে, নতুন শিল্প সংস্থাপনে, কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে, আয় বৃদ্ধিতে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে, রুচির পরিবর্তন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ফল বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিদিন মাথাপিছু কমপক্ষে ১১৫-১২০ গ্রাম করে ফল খাওয়া উচিত; কিন্তু সেখানে আমরা পাই প্রায় ৩৮ গ্রাম। বাংলাদেশে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুব ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ার চেয়ে কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ ফলই ব্যবসায়িক চাহিদার ভিত্তিতে বেশি করে চাষাবাদ হয়। যার ফলে প্রকৃতপক্ষে চাষের আওতায় জমির পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। মনে করা হয় বাংলাদেশের মোট চাষভুক্ত জমির মধ্যে ফলের আওতায় মাত্র ১-২% জমি আছে। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ফসলভিত্তিক আয়ের ১০% আসে ফল থেকে। বর্তমান বিশ্বে ফলের পুষ্টিমূল্য ছাড়াও ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। বাজারে ফলের চাহিদা ছাড়াও মূল্য বেশি বিধায় এটি চাষাবাদে অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত হয়। যার ফলে ফল উৎপাদনের সাথে জড়িত সম্প্রদায়ের আর্থিক সচ্ছলতা আসে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। অধিক ফল উৎপাদন করে এবং তা রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা সম্ভব।

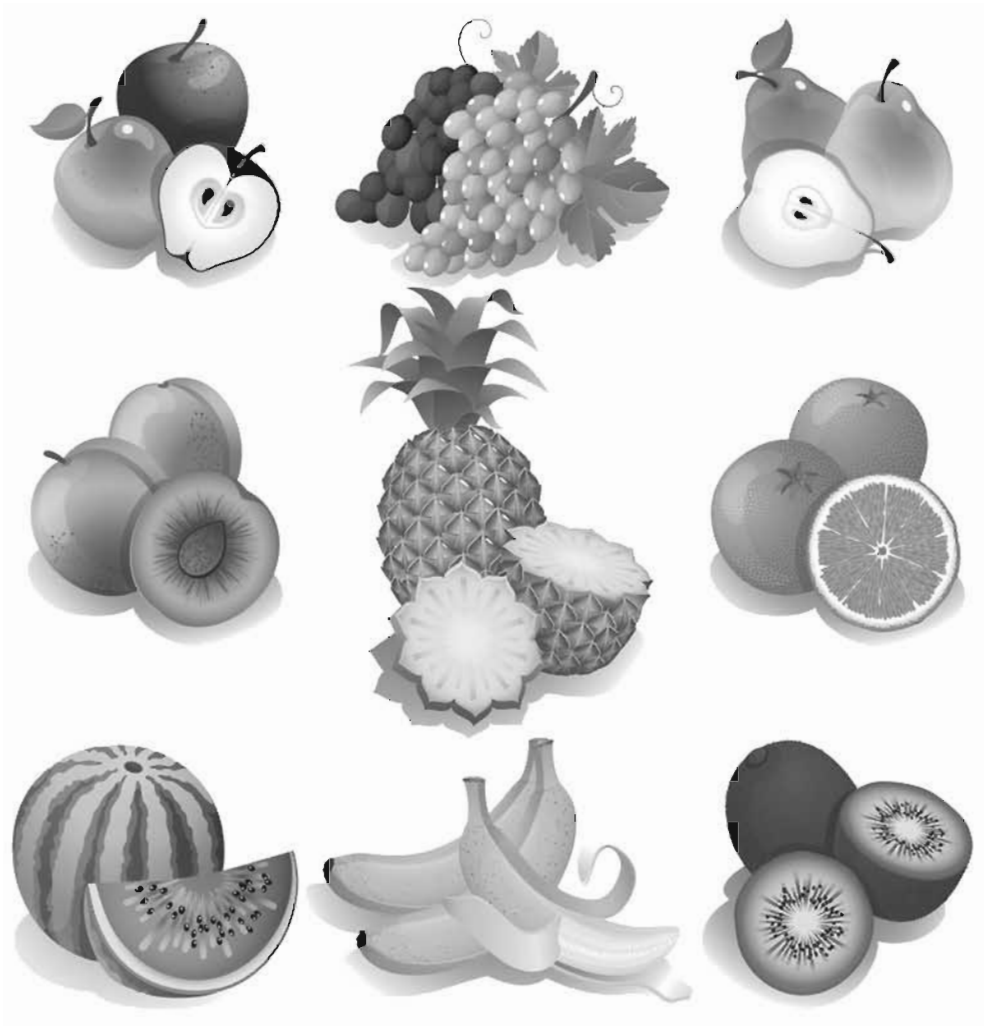

চিত্র : কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের ফল

## শাক সবজির পরিচিতি ও গুরুত্ব

শাক-সবজি প্রধানত রসাল প্রকৃতির গুল্মজাতীয় গাছ। তবে বিরুৎ (Herb) ও বৃক্ষজাতীয় গাছও শাক-সবজি হতে পারে। সবজিভেদে এগুলোর খাওয়ার উপযোগী অংশ অর্থাৎ পাতা, কাণ্ড, ফুল, বীজ ও মূল কাঁচা অথবা রান্না করে খাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগ সবজিই রান্না করে খাওয়া হয়। পাতা রান্না করা হলে একে শাক এবং পাতা ছাড়া গাছের অন্য অংশ রান্না করা হলে তাকে সবজি বলা হয়। বেশিরভাগ শাক-সবজি একবর্ষজীবী উদ্ভিদ । যেগুলো দুই বা বহুবর্ষজীবী সেগুলোকে ও সাধারণত এক বর্ষজীবীর মতো জন্মানো হয়ে থাকে। শাক-সবজিতে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় মানবদেহের-পুষ্টিতে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে শরীর সুস্থ সবল, কর্মঠ রাখার জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ২০০ গ্রাম সবজি খাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ প্রতিদিন যে সবজি খায় তার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩০ গ্রাম। উল্লেখ্য যে, শরীরের চাহিদার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ ভিটামিন 'সি' ৬০-৮০ ভাগ ভিটামিন 'এ' এবং ২০-৩০ ভাগ 'বি' একমাত্র সবজি ও ফল থেকে আসা উচিত। এছাড়া শাক-সবজিতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। পুষ্টিগত গুরুত্বের এসব কথা আমাদের অনেকের জানা নেই বলে সবজি খাওয়ার প্রতি আমাদের আগ্রহ ততটা বাড়েনি ফলে এর চাষাবাদও এদেশে সীমিত রয়েছে। বর্তমানে অধিক আয়ের উৎস হিসেবে এবং ধান ও গমের বিকল্প হিসেবে সবজির চাষাবাদ ও ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

চিত্রঃ কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের সবজি

## ফল ও সবজির উদ্ভিদতাত্ত্বিক সংজ্ঞা

পরাগরেণু ও ডিম্বকের নিষেক বা মিলনের ফলে ফুলের গর্ভাশয় বা অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গসমূহ (বৃতি, দল, পুষ্পমঞ্জরী ইত্যাদি) পরিবর্তিত ও পরিপূর্ণ হয়ে গাছের যে অংশ গঠিত হয় সেটিই ফল। তবে নিষেক ক্রিয়া ছাড়াও পার্থেনোকার্পিক বা অযৌন উপায়ে ফল উৎপাদন সম্ভব। প্রায় প্রতিটি ফলই উদ্ভিদতাত্ত্বিক এই সংজ্ঞার অন্তভূক্ত। সবজির বেলায় কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন- বেগুন, টমেটো, মটরশুঁটি, করলা প্রভৃতি সবজি উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয়ে ফল অর্থাৎ নিষেককৃত গর্ভাশয়ে থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

কিন্তু আরও অনেক সবজি রয়েছে যেগুলো মোটেই ফল নয়। যেমন-মুলা, গাজর, শালগম, মিষ্টি আলু ইত্যাদি এগুলো রূপান্তরিত মূল। কচু, আলু, পেঁয়াজ, রসুন হচ্ছে রূপান্তরিত কাণ্ড। পাতাজাতীয় সবজি যেমন-পুঁইশাক, লালশাক, পালংশাক হচ্ছে স্বাভাবিক কাণ্ডের অংশসহ পাতা, বাঁধাকপি হচ্ছে একটি অপ্রস্ফুটিতে কুঁড়ি এবং ফুলকপি একটি বৃহৎ পুষ্পমঞ্জরী ছাড়া আর কিছু নয়। গাছের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হওয়ার কারণে তাদের গঠন প্রকৃতি ও জৈব রাসায়ানিক কাজকর্ম বিভিন্ন রকমের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-পাতার কাজ হচ্ছে সালোক-সংশ্লেষণের (Photosynthesis) মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করা এবং প্রস্বেদনের (Evaporation) মাধ্যমে অতিরিক্ত জলীয় অংশ ত্যাগ করা। অপরিদকে মুলা, গাজর, শালগম হচ্ছে মূল। স্বাভাবিকভাবেই এগুলোর বেলায় উপরোক্ত জৈব রাসায়ানিক ক্রিয়াকর্ম চলে অনেক ধীরে। ফলে এদের সংগ্রহোত্তর জীবনকাল অপেক্ষাকৃত বেশি।
উদ্ভিদতাত্ত্বিক দিক থেকে ফল ও সবজির মধ্যে গভীর কোনো সীমারেখা না থাকলেও ব্যবহারের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন ফল সাধারণত তাজা অবস্থায় খায়, আর সবজি-খাওয়া হয় রান্না করে তরকারি বা ব্যঞ্জন হিসেবে। আবার কোনো কোনো ফল কাঁচা অবস্থায় সবজি, কিন্তু পাকলে ফল হিসেবে ব্যবহারোপযোগী, যেমন-পেঁপে।

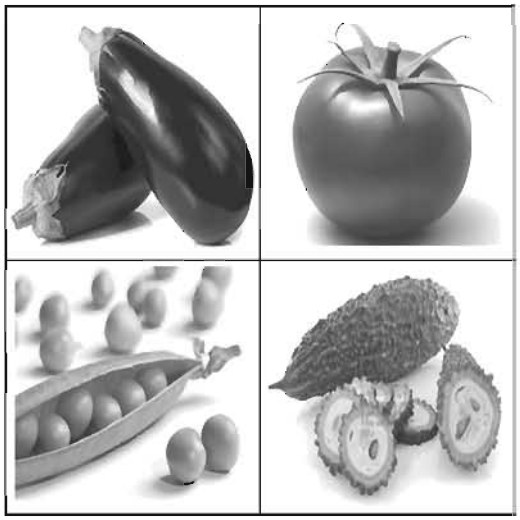

চিত্র : বেগুন, টমেটো, মটরশুঁটি, করলা (এগুলো ফল কিন্তু সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়)

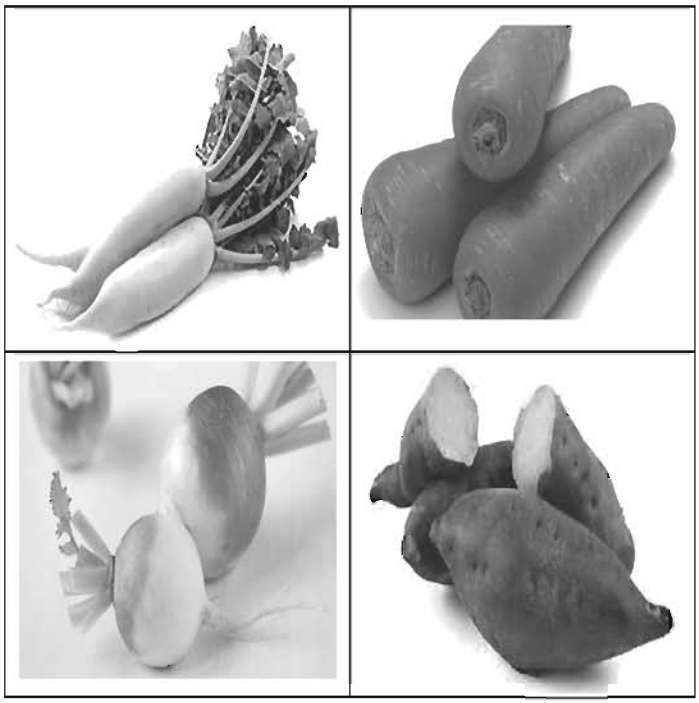

চিত্র : মুলা, গাজর, শালগম, মিষ্টি আলু (এগুলো রূপান্তরিত মুল জাতীয় কিছু সবজি)

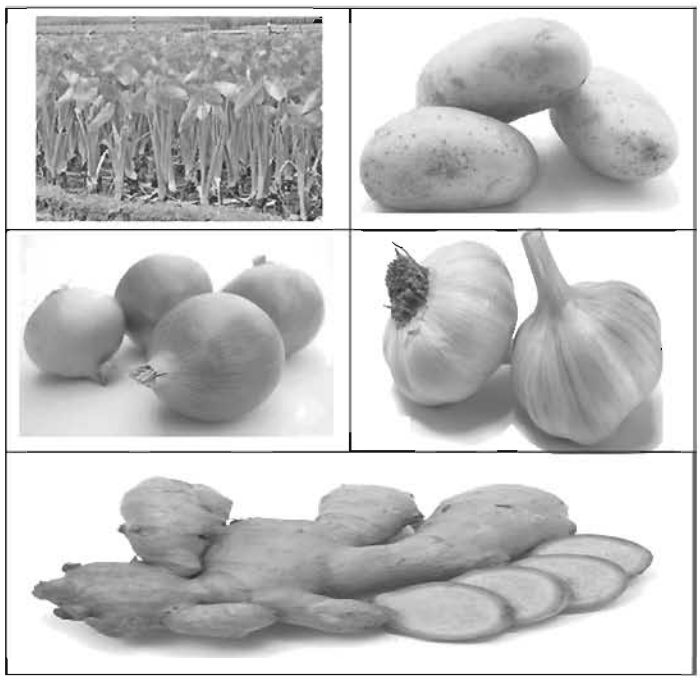

চিত্র : কচু, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা (এগুলো রূপান্তরিত কাণ্ড জাতীয় কিছু সবজি বা মশলা)

চিত্র : বাঁধাকপি ও ফুলকপি (এগুলোর একটি অপ্রস্ফুটিত কুঁড়ি অপরটি পুষ্পমঞ্জরী কিন্তু উভয়ই সবজি)

## ১.২ পচনশীল ফল ও সবজি

### পচনশীল ফল ও সবজি

কৃষিজাত সকল ফসলকে সংরক্ষণ যোগ্যতার দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

**(ক) সংরক্ষণোপযোগী ফসল**

যে সকল ফসল বা ফল ও সবজি উত্তোলনের পর ঘরে বা গুদামে সংরক্ষণ করা যায় সেগুলোকে সংরক্ষণোপযোগী ফসল বলে। যেমন- ধান, গম, ভুট্টা, তৈলবীজ ইত্যাদি। ফল ও সবজির ক্ষেত্রে যেমন- নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি।

**(খ) পচনশীল ফসল**

যে সকল ফসল (ফল ও সবজি) নরম শাঁসযুক্ত, রসালো এবং সাধারণত গুদামজাতকরণের জন্য শুকানো হয় না, সেগুলো পচনশীল ফসল বা পণ্য। পচনশীল ফল এবং সবজির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোর আর্দ্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে সংরক্ষণ করতে হয়। আম, কলা, পেঁপে প্রভৃতি পচনশীল এবং কপি, বেগুন, পটোল, টমেটো, কুমড়া ইত্যাদি অপচনশীল সবজি।

শ্রেণিভেদ থেকে বোঝা যায় ধান, গম, ডাল ইত্যাদি খাদ্যশস্য ক্ষেত থেকে সংগ্রহের পর শুকিয়ে নিয়ে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দীর্ঘকালের জন্য গোলাজাত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু ফল ও সবজির বেলায় সহজ, সরল পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যায় না। পচনশীল দ্রব্য শুকনা দ্রব্যের চেয়ে অধিকতর সবজি ও ক্রিয়াশীল আর এগুলো তাপ ও আর্দ্রতা উৎপাদন করে বলে গুদামজাতকরণ অনেক ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। এগুলোর তাজা অবস্থা ক্রেতাদের বেশি আকৃষ্ট করে আর সামান্য পরিমাণ শুকালেই এই তাজা, মসৃণ গঠন

আকৃতিতে এদের জলীয় অংশের কারণে যে নিটোল ভরাট ও চকচকে ভাবটি থাকে তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। ফল ও সবজিতে পানির অংশ থাকে ফসলভেদে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ। দেখা গেছে শতকরা ৫ ভাগ জলীয় অংশ কমে গেলেই ফল ও সবজি নেতিয়ে আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে। তাই দানাশস্যের মতো শুকিয়ে নিরাপদ আর্দ্রতায় নামানোর এই প্রযুক্তিটি তাজা অবস্থায় ফল ও সবজি সংরক্ষণের বেলায় খাটে না (তবে প্রক্রিয়াজাতকরণের বেলায় এটি উপযোগী)। তাছাড়া পচনশীল দ্রব্যের গুদামজাতকরণ স্থিতিকাল একটি অপচনশীল দ্রব্যের গুদামজাতকরণ স্থিতিকাল অপেক্ষা ভিন্ন ধরনের। আরো লক্ষণীয় যে, পচনশীল ফল ও সবজিতে পানি বেশি থাকার করণে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সামান্য আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ আঘাত যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, সেখানে থেকেই পচনক্রিয়া শুরু হয় যায়। তাই ফল ও সবজি পরিবহন ও বাজারজাতকরণ দুটি ব্যাপারে যত্নবান হতে হয়। যথা-

১. যাতে কোনো জলীয় অংশ কমে না যায়, এবং
২. সুষ্ঠু প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে আঘাত প্রতিরোধ করা।

পচনশীল ফসলকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-
১. ক্লাইমেকটরিক ফল
২. নন ক্লাইমেকটরিক ফল

## ক্লাইমেকটরিক ফল

যে সকল ফল পাকার বা পরিপক্বতার পর শ্বসন বেড়ে যায় এবং সঞ্চিত শর্করা চিনিতে রূপান্তরিত হতে থাকে, স্বাভাবিক সুষমা ছড়ায় এবং রং ধারণ করে সে সকল ফলকে ক্লাইমেকটরিক ফল বলে। উদাহরণ- আম, কলা, পেঁপে, বেল, কাঁঠাল ইত্যাদি। এ জাতীয় ফল পেকে যাওয়ার পূর্বে গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় যাতে ফল পেকে যাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার সময়ের মধ্যে এগুলোর পরিবহন ও বাজারজাত করার কাজগুলো যথাযথভাবে সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করা হয়।

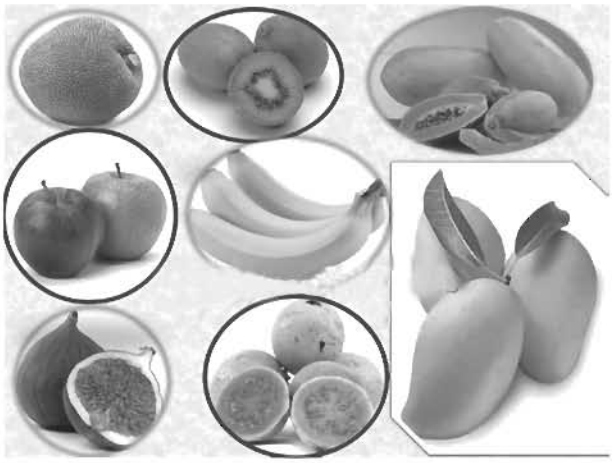

চিত্র : ক্লাইমেকটরিক ফল

**নন ক্লাইমেকটরিক ফল**

যে সকল ফল পাকার পরও তাদের শ্বসনকার্য ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি সমানভাবে চলতে থাকে, সে সকল ফলকে নন ক্লাইমেকটরিক ফল বলে। এসব ফলে খুব কম পরিমাণে শর্করা জমা থাকে। গাছ থেকে পাড়ার পর এসব ফলের শর্করা চিনিতে রূপান্তরিত হয় না। উদাহরণ- কামরাঙ্গা, লেবু, নারিকেল, তরমুজ, জাম্বুরা, আমলকী, আঙ্গুর, লিচু, আনারস, চালতা, শাকসবজি ইত্যাদি।

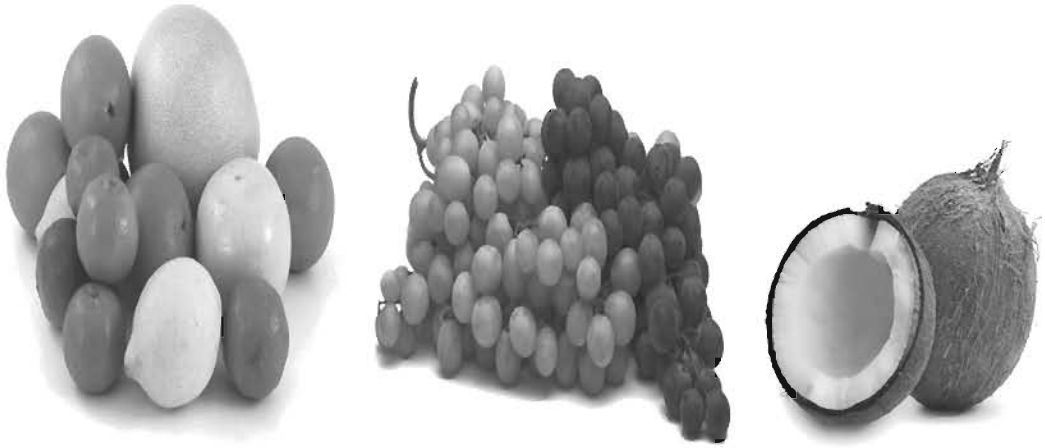

চিত্র : নন ক্লাইমেকটরিক ফল

## ১.৩ ফল ও সবজির পুষ্টিমান

**ফল ও সবজির পুষ্টিমান**

শিশুর সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্য ও পুষ্টি। পুষ্টিহীন একটি শিশু কখনই বলবান, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ মানুষে পরিণত হতে পারে না। মানুষের খাদ্য তালিকায় শ্বেতসার বা শর্করা, আমিষ বা প্রোটিন, চর্বি ও তেল, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি পরিমিত পরিমাণে থাকা বাঞ্ছনীয়। সকল খাবারে এ সকল উপাদান সমানভাবে থাকে না। কোনো খাদ্যে এসব উপাদানের কোনোটি বেশি আবার কোনোটি কম থাকে। তাই সুষম খাদ্য পেতে হলে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য খাওয়া দরকার। ফলমূল ও শাকসবজি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

**খাদ্য উপাদানের কাজ ও তাদের উৎস**

**আমিষ (Protein)**

শরীরর গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা আমিষের কাজ। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং ডাল শস্য আমিষের প্রধান উৎস। টাটকা ফল ও সবজিতে সাধারণত শতকরা ২-৫ ভাগ আমিষ থাকে। সবুজ পাতাজাতীয় সবজিতে খুব কম পরিমাণ আমিষ থাকে তবে তা উন্নত মানের।

## শ্বেতসার (Carbohydrate)

শ্বেতসার বা শর্করা শরীরে শক্তি ও কাজ করার ক্ষমতা যোগায়। দানাজাতীয় এবং চিনি বা গুড় শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। এছাড়াও আলু, মিষ্টি আলু, কচু, মুখীকচু ও কচুশাকে এবং কলা, আম কাঁঠাল, পেঁপে এসব ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শ্বেতসার থাকে।

## তেল (Oil) ও চর্বি (Fat)

তেল বা চর্বি শরীরের কর্মক্ষমতার উৎস হিসেবে কাজ করে। দুধ ও দুধজাত দ্রবাদি, সকল ভোজ্যতেল যেমন- সরিষা, সয়াবিন, নারিকেল, পাম, সূর্যমুখী, তিল, তিসি, চালের কুঁড়ার তেল ইত্যাদি এবং চর্বিযুক্ত মাছ ও মাংস তেল ও চর্বির উৎস। তাজা ফলমূল ও শাকসবজিতে শতভাগের এক ভাগেরও কম তেল ও চর্বি থাকে।

## ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Vitamin)

ভিটামিন রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। ভিটামিন অনেক প্রকার যেমন- ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই এবং কে ইত্যাদি। ভিটামিন বি ও সি পানিতে দ্রবনীয় এবং ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে তেলে দ্রবনীয়।

## ভিটামিন 'এ'

ভিটামিন 'এ' এর অভাবে শিশুর রাতকানা রোগ হয়। এর অভাব পূরণ না করলে ছেলেমেয়েরা অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সব ধরনের রঙিন শাকসবজি ও ফলে ভিটামিন 'এ' থাকে Carotene হিসেবে যা ফ্যাট বা পতল দ্রবণীয় কেননা শাকসবজি ও ফলে কোনো ফ্যাট নেই। তাই রান্নার সময় পর্যাপ্ত তেল ব্যবহার করতে হবে। মাংসে প্রচুর ফ্যাট আছে। মেয়েরা মাংসে বেশি মাত্রায় তেল ব্যবহার করে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকে বলা হয়- তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

## ভিটামিন 'বি'

ভিটামিন 'বি' এর অভাবে বেরিবেরি রোগ, রক্তশূন্যতা, অপরিণত সন্তান প্রসব, চর্ম ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগ হয়। সবুজ পাতা জাতীয় সবজি ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সের যেমন- নিয়াসিন, থায়ামিন ও রিবোফ্লাভিনের প্রধান উৎস। ঢেঁকি ছাঁটা চাল, ডাল ও অন্যান্য সবজিতে ভিটামিন 'বি' পাওয়া যায়। ঢেঁকি ছাঁটা সিদ্ধ চালে এটি বেশি পরিমাণে থাকে। এটা পানিতে দ্রবণীয় তাই শাকসবজি কাটার আগে ধুয়ে নিতে হবে কাটার পরে নয়।

## ভিটামিন 'সি'

ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। এ রোগে দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। আমলকী ও পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। তবে রান্নার সময় তাপে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য টাটকা ও তাজা ফল সবজিতে ভিটামিন 'সি' থাকে। এর কোনো প্রাণিজ উৎস নেই। সব ধরনের সাইট্রাস বা লেবু জাতীয় ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' রয়েছে। এটা পানিতে দ্রবণীয় তাই কাটার পরে ধোয়া যাবে না। ভাত খাবার সময় এক টুকরা লেবু অথবা ১টি কাঁচা মরিচ খেলে শরীরে ভিটামিন 'সি'-এর অভাব হবে না।

## খনিজ লবণ (Minerals)

পুষ্টি রক্ষার জন্য খনিজ লবণ অত্যন্ত দরকারি। আমাদের খাবারে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও আয়োডিন ইত্যাদি খনিজ লবণের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

## লৌহ (Iron)

লৌহ জাতীয় খনিজ লবণের অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ হয়। মেয়েরা সাধারণত এ রোগে বেশি ভুগে থাকে। লালশাক, সবুজশাক (যেমন- কালো কচুশাক) ইত্যাদিতে লৌহ উপাদান বেশি থাকে। কলিজা, মাছ, ডিম ও গুড়ে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়।

## ক্যালসিয়াম (Calcium)

পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম খনিজ লবণের মধ্যে অন্যতম উপাদান। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় ও দাঁত ঠিকমতো গঠিত হয় না। এর অভাবে ছোট বাচ্চাদের পা বাঁকা হয়ে যায়। কচুশাক, লালশাক, পালংশাক, কাঁটানটে, পুনর্নভা ইত্যাদি শাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। দুধ, দুধের তৈরি খাবার এবং ছোট মাছ ও মাছের কাঁটায় এটি পাওয়া যায়।

## আয়োডিন (Iodine)

আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ হয়। সামুদ্রিক মাছে প্রচুর আয়োডিন আছে। আয়োডিনযুক্ত আয়োডাইজড লবণ খেলে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ হয় না।

## নিম্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন ফলের পুষ্টিমানের তালিকা ছকে দেখানো হলোঃ

| ক্র.নং | খাদ্যের নাম | খাদ্যশক্তি (কিঃ ক্যালরী) | পানি (গ্রাম) | আমিষ (গ্রাম) | চর্বি (গ্রাম) | শর্করা (গ্রাম) | খাদ্য আশ (গ্রাম) | ক্যালসিয়াম (গ্রাম) | লৌহ (মিঃ গ্রাম) | জিংক (মিঃ গ্রাম) | ভিটামিন এ (মিঃ গ্রাম) | ভিটামিন ই (মিঃ গ্রাম) | থায়ামিন (মিঃ গ্রাম) | রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম) | ভিটামিন সি (মিঃ গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ফজলি আম (পাকা) | ৭০ | ৮১.৭ | ০.৯ | ০.৫ | ১৪.৭ | ১.৬ | ১৪ | ০.৫ | ০.৮৭ | ২৯২ | ১.১২ | ০.০৩ | ০.০৪ | ৩৪.৭ |
| ২ | ল্যাংড়া আম (পাকা) | ৮২ | ৭৮.৪ | ০.৮ | ০.৪ | ১৮.০ | ১.৬ | ১৩ | ০.২ | ০.৬০ | ২৫ | ০.৯২ | ০.০৯ | ০.১০ | ১০৩.০ |
| ৩ | কাঁঠাল (পাকা) | ৭৪ | ৭৭.০ | ১.২ | ০.২ | ১৩.৩ | ৭.২ | ১৩ | ০.৩ | ০.৫৯ | ২ | ০.১১ | ০.১১ | ০.০৫ | ৩.৪ |
| ৪ | লিচু | ৬২ | ৮১.৮ | ১.৪ | ০.৫ | ১০.২ | ৫.৫ | ১১ | ০.৫ | ০.২৭ | ০ | - | ০.০২ | ০.০৬ | ১১.০ |
| ৫ | সাগর কলা (পাকা) | ৯৫ | ৭৫.২ | ১.৩ | ০.৮ | ১৯.২ | ২.৬ | ১১ | ০.৩ | ০.২৪ | ২ | ০.৭৫ | ০.০৫ | ০.০৮ | ১.০ |
| ৬ | আনারস (পাকা) | ৪৩ | ৮৮.৭ | ০.৮ | ০.৪ | ৮.৩ | ১.৪ | ২০ | ১.৬ | ০.৬০ | - | ০.১ | ০.১১ | ০.০৪ | ২০.৯ |
| ৭ | পেঁপে (পাকা) | ৪৭ | ৮৭.২ | ১.০ | ০.১ | ৯.৭ | ১.৪ | ১৮ | ০.৭ | ০.২২ | ৫ | ০.১ | ০.২০ | ০.১২ | ৩৩.৯ |
| ৮ | তরমুজ (লাল পাকা) | ৩৩ | ৯০.৫ | ০.৬ | ০.১ | ৬.৫ | ১.৭ | ২৯ | ০.৩ | ০.১৭ | ৬০ | ০.৩ | ০.০৮ | ০.০৩ | ৬১.৮ |
| ৯ | কালোজাম | ২২ | ৯৪.২ | ০.৫ | ০.২ | ৪.৪ | ০.৪ | ১২ | ০.৪ | ০.১৫ | ২৯ | ০.০৫ | ০.০২ | ০.০৪ | ২৩.৯ |
| ১০ | তাল (পাকা) | ৩৯ | ৮৮.২ | ০.৯ | ০.৫ | ৬.১ | ৩.৫ | ২৩ | ০.৮ | ০.২১ | ৯৩ | - | ০.০৯ | ০.০২ | ৭৪.১ |
| ১১ | বাংগী (পাকা) | ৭৮ | ৭৯.৭ | ০.৫ | ০.৪ | ৭১.২ | ০.৭ | ১৬ | ১.৭ | ০.২৭ | ২০৮ | - | ০.০৪ | ০.০২ | ৩৫.১ |
| ১২ | পেয়ারা (বিভিন্ন প্রকার কাঁচা) | ১৬ | ৯৫.৫ | ০.৩ | ০.২ | ২.৮ | ০.৮ | ২১ | সামান্য | ০.০৬ | ৪ | ০.০৭ | ০.১১ | ০.০৮ | ২৬.০ |
| ১৩ | আমলকী | ৬৩ | ৮১.৪ | ১.০ | ০.৫ | ১০.৯ | ৪.৪ | ১৭ | ০.৭ | ০.৩১ | ৩৩ | ০.৭৩ | ০.২১ | ০.০৯ | ২২৮.৩ |
| ১৪ | কামরাঙ্গা (পাকা) | ৪৪ | ৮৮.৭ | ০.৮ | ০.১ | ৮.৩ | ৩.৪ | ৩২ | ০.৯ | ০.৩০ | ১ | - | ০.০২ | ০.০৮ | ৪৫৩.৪ |
| ১৫ | জাম্বুরা | ৪১ | ৮৯.৯ | ০.৫ | ০.৭ | ৬.৭ | ২.৮ | ১০ | ০.৮ | ০.৩৮ | ৭ | ০.১৫ | ০.১২ | ০.০৪ | ৪৯.৪ |
| ১৬ | বেল (পাকা) | ৩৮ | ৬৮.৫ | ০.৪ | ০.৩ | ৭.৭ | ১.০ | ৩৬ | ০.২ | ০.০৬ | ৩ | ০.২৪ | ০.০৬ | ০.০৪ | ১২১.৭ |
| ১৭ | বিলাতি গাব (পাকা) | ১১১ | ৮১.৭ | ২.৯ | ০.৩ | ২০.৯ | ৭.০ | ৪১ | ০.৪ | ০.২৬ | - | - | ০.০৩ | ০.০২ | ১১.৩ |
| ১৮ | আমড়া | ৬৭ | ৮৬.৭ | ০.৭ | ০.২ | ১৩.৯ | ৩.৮ | ২৪ | ০.২ | ০.০৭ | ৮১ | ১.৮ | ০.০৩ | ০.১৪ | ১২.৮ |
| ১৯ | বড়ই | ৫১ | ৮৪.৩ | ১.১ | ০.৮ | ৮.৯ | ১.৬ | ৫৭ | ২.৮ | ০.১৭ | - | - | ০.২৮ | ০.০৪ | ৭৭.০ |
| ২০ | কদবেল | ৬০ | ৮০.৯ | ১.৯ | ০.২ | ১২.৬ | - | ১৪ | ০.৮ | ০.৩২ | ২ | - | ০.০২ | ০.০৬ | ৬৬.১ |
| ২১ | লেবু (কাগজি) | ৬৪ | ৮৬.০ | ৩.১ | ০.৪ | ১০.৩ | ৩.৫ | ৭৪ | ০.৭ | ০.৩৭ | - | - | ০.৮০ | ০.০৩ | ১২.৮ |
| ২২ | কমলা | ৫৬ | ৮৭.৭ | ০.৮ | ১.০ | ১০.২ | ১.৩ | ৬৫ | ০.৩ | ০.০৭ | ৪ | ০.৮০ | ০.০২ | ০.০৩ | ৪৫.৯ |
| ২৩ | ডেউয়া (পাকা) | ৪৪ | ৭২.৩ | ০.৭ | ০.২ | ৮.৭ | ২.৪ | ২৩ | ০.২ | ০.০৭ | ১৯ | ০.২৪ | ০.০৪ | ০.০১ | ৫৪.০৬<br>৫.৬ |
| ২৪ | আঙ্গুর (হালকা সবুজ) | ১০৩ | ৭৫.৩ | ১.২ | ০.৭ | ২১.১ | ৩.৬ | ৫৭ | ০.৮ | ১.৬৮ | ৩১০ | - | ০.০৩ | ০.২৩ | ২৯.০ |
| ২৫ | জামরুল | ৯৪ | ৮৯.৫ | ০.৫ | ০.৬ | ২০.২ | ২.৯ | ২২ | ০.৫ | ০.০৭ | ৩ | ০.৪০ | ০.১০ | ০.০৬ | ২২.৩ |
| ২৬ | মিষ্টি তেতুঁল (পাকা) | ৪০ | ২৭.৯ | ০.৭ | ০.৩ | ৮.০ | ১.২ | ৯ | ০.৩ | ০.০৮ | - | - | ০.০১ | ০.০৫ | ১১.২ |
| ২৭ | আতাফল | ২৭০ | ৭৬.১ | ৩.২ | ০.৪ | ৬০.৮ | ৫.১ | ১২৭ | ৪.০ | ০.১১ | ১ | ০.০৯ | ০.৩৫ | ০.১২ | ৩৮.০ |
| ২৮ | ডুমুর (পাকা) | ৮৫ | ৮৮.১ | ১.৮ | ০.৩ | ১৬.৬ | ৪.৪ | ১৭ | ১.০ | ০.৩৩ | ০ | - | ০.০৭ | ০.১৪ | ৫.০ |
| ২৯ | কচি তালের শাঁস | ৪০ | ৯২.০ | ১.৩ | ০.২ | ৬.৭ | ৩.১ | ৮০ | ১.১ | ০.১৫ | ৭ | ০.১১ | ০.০৬ | ০.০৫ | ৫.০ |
| ৩০ | কচি তালের শাঁস | ৩১ | ৮৩.৩ | ০.৬ | ০.১ | ৬.৯ | ০.৩ | ৪৩ | ০.৫ | - | - | - | ০.০১ | ০.০১ | ৪.০ |
| ৩১ | আপেল খোসাসহ | ৬২ | ৮৩.০ | ০.৩ | ০.২ | ১৩.৫ | ২.৪ | ৬ | ০.১ | ০.০৪ | ৩ | ০.১৮ | ০.০৯ | ০.০৩ | ৪.০ |
| ৩২ | নাশপাতি | ৬২ | ৮৩.০ | ০.৬ | ০.৩ | ১২.৩ | ৩.৬ | ৬ | ০.৫ | ০.০৮ | ০ | ০.১২ | ০.০৩ | ০.০৩ | ৩.৮ |

**সূত্র : বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ২০১৬**

## সারণি :- বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজির পুষ্টি উপাদান (খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

| ক্র. নং | খাদ্যের নাম | খাদ্যশক্তি (কিঃক্যালরী) | পানি (গ্রাম) | আমিষ (গ্রাম) | চর্বি (গ্রাম) | শর্করা (গ্রাম) | খাদ্য আশ (গ্রাম) | ক্যালসিয়াম (গ্রাম) | লৌহ (মিঃ গ্রাম) | জিংক (মিঃ গ্রাম) | ভিটামিন-এ (মিঃ গ্রাম) | ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম) | থায়ামিন (মিঃ গ্রাম) | রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম) | ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ডাঁটা | ২১ | ৯২.৩ | ০.৯ | ০.১ | ৩.৭ | ১.২ | ১১৪ | ১.৮ | ০.৫২ | ২৬ | - | ০.০১ | ০.১৮ | ৩৫.৮ |
| ২ | শিম | ৫৪ | ৮৫.০ | ৩.৯ | ০.১ | ৮.৩ | ২.০ | ৪৪ | ১.১ | ০.৪৮ | ৩২ | ০.০৬ | ০.০৫ | ০.০১ | ৮.৭ |
| ৩ | বেগুন কালো লম্বা | ২৪ | ৯১.৪ | ১.৯ | ০.১ | ২.০ | ৪.১ | ২১ | ০.৪ | ০.৫৭ | ৪ | ০.১০ | ০.০৩ | ০.০৭ | ১.৩ |
| ৪ | বাঁধা কপি | ২৪ | ৯২.৭ | ১.৫ | ০.৩ | ২.৬ | ২.৫ | ৩০ | ০.৫ | ০.৪০ | ৫ | ০.২০ | ০.০৬ | ০.০৫ | ১৬.১ |
| ৫ | গাজর | ৩৪ | ৮৯.৭ | ০.৯ | ০.৩ | ৬.০ | ২.৬ | ২৬ | ০.৪ | ০.০৭ | ৩২৯ | ০.৫৫ | ০.০৪ | ০.০৯ | ১.৪ |
| ৬ | ফুলকপি | ২৭ | ৯১.৮ | ২.৬ | ০.৩ | ২.৫ | ২.০ | ৩৩ | ০.৮ | ০.৪১ | ১ | ০.২২ | ০.০৩ | ০.০৩ | ৭২.৭ |
| ৭ | কাঁচা মরিচ | ৪৫ | ৮৫.৮ | ২.৮ | ০.১ | ৫.৯ | ৪.৭ | ২২ | ১.৬ | ১.৯৭ | ১০ | ০.২৯ | ০.০৩ | ০.০৫ | ১০২.৩ |
| ৮ | শশা | ১৭ | ৯৫.১ | ০.৮ | ০.১ | ২.৯ | ০.৭ | ১৩ | ০.৬ | ০.১৭ | ৪ | ০.০৭ | ০.১৬ | ০.০২ | ৭.২ |
| ৯ | রসুন | ১৪৭ | ৬১.৬ | ৬.৯ | ০.৬ | ২৭.৬ | ২.১ | ২৫ | ১.৬ | ১.০৮ | ০ | ০.০৮ | ০.১৩ | ০.১২ | ২৪.১ |
| ১০ | চাল কুমড়া | ১০ | ৯৬.৫ | ০.৪ | ০.১ | ১.০ | ১.৭ | ৩০ | ০.৮ | ০.১০ | ০ | - | ০.০৬ | ০.০১ | ৩১.০ |
| ১১ | করলা | ৩১ | ৯০.৪ | ২.১ | ০.৩ | ৩.৬ | ২.৬ | ১৬ | ১.৮ | ০.৩৫ | ২৪ | - | ০.০৫ | ০.০৩ | ৯০.৬ |
| ১২ | লাউ | ৩৪ | ৯০.৮ | ১.১ | ০.১ | ৬.৮ | ০.৬ | ২৬ | ০.৭ | ০.৫৮ | ১ | - | ০.০১ | ০.০২ | ৮.৭ |
| ১৩ | পটোল | ২৪ | ৯২.৬ | ২.০ | ০.৩ | ২.২ | ২.২ | ১৬ | ১.৭ | ০.৪০ | ৫ | - | ০.১৭ | ০.০৩ | ১৯.৪ |
| ১৪ | চিচিংগা | ২৪ | ৯৩.৪ | ০.৫ | ০.৩ | ৪.৫ | ০.৮ | ৩১ | ০.৪ | ০.৩২ | - | - | ০.০৪ | ০.০৬ | ১৮.৮ |
| ১৫ | ঢেঁড়শ | ৩৯ | ৮৭.৭ | ২.১ | ০.২ | ৫.৭ | ৩.১ | ৯৩ | ০.৯ | ০.৩৪ | ১৯ | ০.২৭ | ০.০৪ | ০.১৬ | ১৭.৫ |
| ১৬ | পিঁয়াজ | ৫৯ | ৮৩.৭ | ১.৪ | ০.১ | ১২.২ | ১.৯ | ২৪ | ০.৯ | ০.৪১ | ২ | ০.০২ | ০.০৫ | ০.১৪ | ৪.৫ |
| ১৭ | পেঁপে (কাঁচা) | ৩০ | ৯০.৬ | ০.৮ | ০.১ | ৫.৭ | ১.৫ | ১৫ | ০.৬ | ০.২২ | ১ | - | ০.০৩ | ০.০২ | ১৮.৬ |
| ১৮ | কলা (কাঁচা) | ৭৭ | ৭৮.৯ | ২.০ | ০.৩ | ১৫.৫ | ২.৩ | ২২ | ০.৬ | ০.১৪ | ৫৬ | ০.১৪ | ০.০৯ | ০.০৬ | ৭.৩ |
| ১৯ | মিষ্টি কুমড়া | ১৮ | ৯৩.৯ | ১.৪ | ০.৩ | ১.৩ | ২.৪ | ৫২ | ০.৭ | ০.১১ | ৩৬৯ | ১.০৬ | ০.০৭ | ০.০৬ | ২১.১ |
| ২০ | টমেটো (কাঁচা) | ২৩ | ৯৩.৩ | ১.৯ | ০.২ | ২.৫ | ১.৭ | ১৬ | ০.৩ | ০.১৯ | - | ০.৩৮ | ০.০৭ | ০.০১ | ৩০.৬ |
| ২১ | টমেটো (পাকা) | ১৬ | ৯৫.০ | ১.১ | ০.২ | ১.৪ | ১.৭ | ১৩ | ০.২ | ০.৪১ | ৯ | ০.৫৪ | ০.০৪ | ০.০৪ | ১২.৩ |
| ২২ | কচুর মুখী | ১০৩ | ৭১.১ | ২.২ | ০.২ | ২১.০ | ৪.১ | ৩৫ | ০.৭ | ০.২৩ | ৪ | ২.৩৮ | ০.১২ | ০.০৩ | ৬.১ |
| ২৩ | গোল আলু (খোসা ছাড়া) | ৬৬ | ৮১.৭ | ১.২ | ০.২ | ১৪.০ | ২.১ | ১১ | ০.৫ | ০.৭৯ | ৭১৯ | ০.০২ | ০.০৮ | ০.০৯ | ১৯.১ |
| ২৪ | মিষ্টি আলু (কমলা সুন্দরী) | ৯৭ | ৭৩.৭ | ০.৯ | ০.৩ | ২১.১ | ৩.০ | ৩০ | ০.৬ | ০.৩০ | ৩ | ০.২৬ | ০.০৮ | ০.০৬ | ২৩.০ |
| ২৫ | মিষ্টি আলু (হলদি) | ১০৫ | ৭১.৭ | ০.৯ | ০.৩ | ২৩.১ | ৩.০ | ২৫ | ১.০ | ০.১৪ | ১ | ০.২৬ | ০.০৬ | ০.০২ | ২০.৪ |
| ২৬ | মিষ্টি আলু (সাদা) | ৯৮ | ৭৩.৫ | ০.৬ | ০.৩ | ২১.৮ | ৩.০ | ২৫ | ১.৫ | ০.৩৮ | ৭৯৩ | ০.২৬ | ০.০৮ | ০.০৬ | ২০.৩ |
| ২৭ | লালশাক | ৩২ | ৮৮.৮ | ৪.৫ | ০.৩ | ০.৫ | ৪.২ | ২৫৬ | ৬.০ | ০.৯৬ | ৭৪৩ | - | ০.০৩ | ০.১৩ | ৪২.০ |
| ২৮ | ডাঁটাশাক | ২৫ | ৯১.০ | ২.০ | ০.৩ | ১.৫ | ৪.৪ | ১৭১ | ৮.৪ | ০.৯৮ | ১৯৮ | - | ০.০৩ | ০.১৮ | ৩৭.১ |
| ২৯ | লাউশাক | ২৬ | ৯০.২ | ২.৫ | ০.৬ | ০.৬ | ৪.৪ | ৯৪ | ৩.১ | ০.৪৯ | ৬৯৯ | - | ০.০৭ | ০.১৭ | ৪৭.৭ |

সূত্র : বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ২০১৬

## ১.৪ ফল ও সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

### ফল ও সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ফল ও সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ফল ও সবজি উৎপাদনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব প্রধানত ৩টি পর্যায়ে বিবেচ্য ১/ খাওয়ার জন্য (Comsumption Purpose) ২/ ব্যবসায়িক (Commercial Purpose) ৩/ প্রসাধনী হিসেবে (Cosmatic Purpose) আমাদের দেশে মাথাপিছু গড় আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ জমিতে দানা জাতীয় শস্যের চাষ। বর্তমানে ফল ও সবজির বাজার মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় হেক্টরপ্রতি জমিতে কলা বা পেঁপে বা আনারস বা তরমুজ চাষ করে বছরে দেড় বা দুই লক্ষ টাকা সহজেই আয় করা সম্ভব। এক হেক্টর জমিতে টমেটো আলু, বেগুন বা বাঁধাকপি চাষ করেও এক থেকে দেড় লাখ টাকা উপার্জন করা সম্ভব।

**সারণি : বাংলাদেশে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ, মোট উৎপাদন এবং হেক্টরপ্রতি ফলন**

| সাল | মোট জমির পরিমাণ (হাজার একর) | মোট উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টন) | ফলন (কেজি/একর) |
|---|---|---|---|
| ২০১৪-১৫ | ৩১০.০ | ৪৬৩৪.০ | ১৪৯৫.০ |
| ২০১৫-১৬ | ৩৫৪.০ | ৪৭৬৩.০ | ১৩৪৫.০ |
| ২০১৬-১৭ | ৩৭৩.০ | ৫০১৮.০ | ১৩৪৫.০ |

**বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো : ২০০৫ ও ২০০৭**

**সারণি : বাংলাদেশে সবজি চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদনের হেক্টর/ফলন**

| সাল | মোট জমির পরিমাণ (হাজার একর) | মোট উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টন) | ফলন (কেজি/একর) |
|---|---|---|---|
| খরিফ সবজি | | | |
| ২০১৪-১৫ | ৫২৮.০ | ২১৯২.০ | ৪১৫১.০ |
| ২০১৫-১৬ | ৫২৯.০ | ২২৩৯.০ | ৪২৩৪.০ |
| ২০১৬-১৭ | ৫৩৮.০ | ২৩৬৬.০ | ৪৩৯৭.০ |
| রবি সবজি | | | |
| ২০১৪-১৫ | ৪৭৩.০ | ১৫৮০.০ | ৩৩৪০.০ |
| ২০১৫-১৬ | ৪৭৬.০ | ১৬২৬.০ | ৩৪১৬.০ |
| ২০১৬-১৭ | ৪৮৭.০ | ১৬৮২.০ | ৩৫৫৪.০ |

**ফল ও সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো –**

**১. অধিক মুনাফা অর্জন**

আমাদের কৃষকদের জমি অত্যন্ত কম। সেক্ষেত্রে অল্প জমিতে দানাশস্যের পরিবর্তে ফল ও সবজি চাষ করে বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

**২. দৈনিক চাহিদা পূরণ**

বসতবাড়ির চারপাশে ফল ও সবজি চাষাবাদ করে সারা বছরের দৈনিক চাহিদা পূরণ করে বাড়তি ফসল বিক্রি করা যায়।

**৩. পতিত জমির সদ্ব্যবহার**

অফিস, স্কুল-কলেজ, রাস্তা, মসজিদ, ক্লাব, বাঁধ, রেললাইনের আশপাশের জমিতে ফল ও সবজি বাগান করে পতিত জমির সদ্ব্যবহার করা যায়। খনার বচনে উল্লেখ আছে 'বাড়ির উপর পতিতভূঁয়ে সবজি শিগ্র ভায়ে'।

**৪. ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ**

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফল ও সবজি আবাদ করে তা সময়মতো বড় শহরে বাজারজাত করে আয় বৃদ্ধি করা যায়। যেমন- কলা, পেয়ারা,আম, তরমুজ, মাশরুম ইত্যাদি ফল ও সবজি চাষ করে ধান ও গম থেকে বেশি আয় করা সম্ভব। বেশি করে ফল চাষে-বেশি করে অর্থ আসে।

**৫. কাঠের চাহিদা পূরণ**

আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের বাগান থেকে ফল ছাড়াও পরিণত বয়সে আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পাওয়া যায়। এ সকল ফল বাগানের মূল্য স্থাবর সম্পত্তির মতো বাড়তে থাকে।

**৬. কর্মসংস্থান**

ফল ও সবজির নার্সারি স্থাপন করে এর চারা, কলম, বীজ বিক্রি করে কর্মসংস্থান সম্ভব। এ ছাড়া বাড়ির নারী ও শিশুরা গার্হস্থ্য নার্সারি স্থাপন করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। চাকরি যদি নাহি করো মিলেমিশে যাও চাষির দলে।

**৭. ক্ষুদ্র শিল্প**

মৌসুমকালীন উদ্বৃত্ত ফল ও সবজি যেমন- কলা, আম, পেয়ারা, আনারস, তাল, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করে আমসত্ত্ব, আচার, চাটনি, জ্যাম-জেলি, সস ও চিপস ইত্যাদি তৈরি করার কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা যায়। এভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করে অর্থ আয় করা সম্ভব।

**১.৫ ফল ও সবজির প্রকারভেদ**

পৃথিবীর সকল দেশেই কোনো না কোনো ফল উৎপাদিত হয়। কিছু কিছু ফল ১২ মাসী তাই বেশি উৎপাদিত হয় এবং জনসাধারণ তা বেশি খেয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু ফল কম উৎপন্ন হয়, দাম বেশি তাই চাহিদা সকলের কাছে একই রকম নয়।

ফলের প্রকারভেদ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে যেমন-

১. গুরুত্ব অনুযায়ী ফলের প্রকারভেদ

২. খাদ্যের জীবনকাল অনুযায়ী ফলের প্রকারভেদ

৩. ভৌগোলিক অঞ্চল বা জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ফলের প্রকারভেদ

গুরুত্ব অনুযায়ী ফলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

(ক) মুখ্য ফল **(Major Fruit)**

এ সকল ফলের চাহিদা বেশি এবং খেতে সুস্বাদু। যেমন- আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, নারিকেল, আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি।

(খ) গৌণ ফল **(Minor Fruit)** : এ সকল ফলের চাহিদা কম তাই উৎপাদন কম। যেমন- কামরাঙ্গা, লটকন, করমচা, গাব, কদবেল, ডেওয়া ইত্যাদি।

গাছের জীবনকাল অনুযায়ী ফলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(গ) স্বল্পমেয়াদি ফল **(Quick Growing Fruit)**: এ জাতীয় ফলের গাছ এক বছর বা তার কম বা বেশি এবং একবার ফল দিয়েই মারা যায়। স্বল্পমেয়াদি ফলের গাছ কোমলাঙ্গি, যেমন- কলা, আনারস, পেঁপে, তরমুজ ইত্যাদি।

(ঘ) দীর্ঘমেয়াদি ফল **(Perennial Fruit)**: এ জাতীয় ফলের গাছ বহুবছর পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি ফল সাধারণত কাষ্টল হয়। যেমন- আম, কাঁঠাল, নারিকেল, পেয়ারা ইত্যাদি।

ভৌগোলিক অবস্থান বা জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ফলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) নিরক্ষীয় ফল **(Tropical Fruit)**: কর্কট ও মকরক্রান্তির মধ্যবর্তী যে সব এলাকায় উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চ আর্দ্রতা বিরাজ করে, সেখানে নিরক্ষীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল ভালো জন্মে। যেমন– কলা, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, কাঁঠাল, সফেদা ইত্যাদি।

(খ) উপ-নিরক্ষীয় ফল **(Subtropical Fruit)** : যেসব এলাকায় বছরে একটি সুনির্দিষ্ট শীতকাল আছে অথচ শীত তীব্র নয়, সেখানে উপ-নিরক্ষীয় বা অব-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল ভালো জন্মে। যেমন- আঙ্গুর, লিচু, আম, কুল, লেবু, খেজুর ইত্যাদি। অনেক উপ-নিরক্ষীয় ফল নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং অনেক নিরক্ষীয় ফল উপ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সহজেই জন্মানো যায়।

(গ) শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল **(Temperate Fruit)** : যেসব ফলগাছ প্রচুর শৈত্য বা শীত না পেলে ফুল উৎপাদন করতে পারে না সেগুলো শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল। শীতকাল দীর্ঘ ও তাপমাত্রা অন্তত কিছুকাল হিমাঙ্কের নিচে অবস্থান করে এমন স্থানেই এসব ফল উৎপাদিত হয়। যেমন– আপেল, নাশপাতি, পীচ, বাদাম, আলুবোখারা, আখরোট ও চোরি ইত্যাদি।

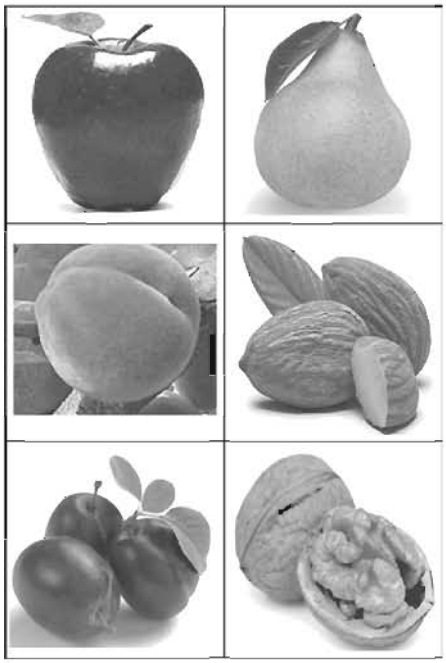

চিত্র : আপেল, নাশপাতি, পিচ, কাজু বাদাম (Almond), আলুবোখারা, আখরোট (Walnut)

(ঘ) ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফল (**Mediterranean Fruit**) : ভূমধ্যসাগর বা মেডিটেরিনিয়ান সী এলাকার দেশগুলোতে যে ফল উৎপাদন হয়, তাই ভূমধ্যসাগরীয় ফল। এ অঞ্চলে সাইপ্রাস, ইতালি, গ্রিস, তুরস্ক, স্পেন, মিশর, ইসরায়েল, আলজেরিয়া, পর্তুগাল, মরক্কো ইত্যাদি দেশ অবস্থিত। এখানে জলপাই, কমলা, নাশপাতি, ডালিম, খেজুর, আঙ্গুর বেশি উৎপাদিত হয়।

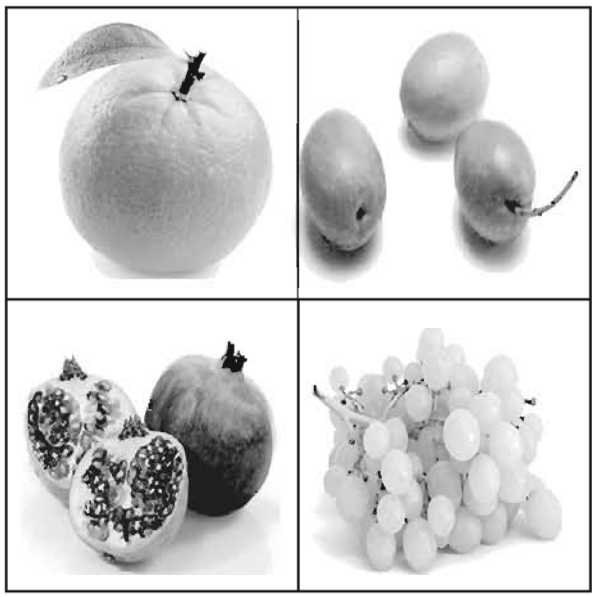

চিত্রঃ আপেল, নাশপাতি, পীচ, কাজু বাদাম (almond), আলুবোখারা, আখরোট (Walnut)

২০২০

## সবজির শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশ আদিকাল থেকেই শাক-সবজি চাষ হয়ে আসছে। কালের বিবর্তনে সবজির আবাদ যেমন কমে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি নতুন নতুন সবজি প্রবর্তিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কোনো সুনির্দিষ্ট প্রথায় সবজির চিরস্থায়ী শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব নয়। তবে সবজিকে নিম্নের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণি বিভাগ করা যায়। যেমন-

১. উদ্ভিদ তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী
২. জীবনকালের স্থায়িত্ব অনুযায়ী
৩. উৎপাদন মৌসুম অনুযায়ী এবং
৪. ব্যবহার্য অঙ্গ অনুযায়ী

নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী সবজি দুই রকমের হয়ে থাকে। যথা-

### (ক) কোমলাঙ্গী বা হার্বাসিয়াস (Succulent)

এ সবজিগুলো নরম বা আধা নরম। এগুলোর মধ্যে যেগুলোর কাণ্ড খাটো এবং গাছ নিজের উপর ভর করে খাড়া থাকতে পারে, সেগুলোকে বিরুৎ বা হার্ব (Herb) বলে। যেমন- ডাঁটা।

### (খ) কাষ্ঠলাঙ্গী বা উডি (Woody)

এগুলো শক্ত ও কাঠ জাতীয় বা শ্রাব (Shrub) ও কাষ্ঠল লতা (Woodyvine) বৃক্ষ সাধারণত উঁচু হয় এবং একটি সুস্পষ্ট কাণ্ড থাকে। বৃক্ষের মধ্যে সবজির সংখ্যা অত্যন্ত কম, যেমন- বকফুল। গুল্ম আকারে ছোট এবং অনেক সময় এতে প্রধান কাণ্ড বলে কিছুই থাকে না। যেমন- বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়স। কাষ্ঠল লতানো তবে এর শির বেশ শক্ত। উদাহরণ- সীতালাউ।

চিত্র : সীতালাউ

জীবনের স্থায়িত্বকাল অনুযায়ী সবজিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) এক বর্ষজীবী বা অ্যানুয়াল (Annual)

যেসব সবজির জীবনচক্র এক মৌসুমেই শেষ হয়ে যায়, সেগুলোকে একবর্ষজীবী সবজি। যেমন– লাউ, মুলা, ঢেঁড়স।

(খ) দ্বিবর্ষজীবী বা বাইনিয়াল (Biennial)

যে সকল সবজির জীবনচক্র শেষ হতে দুই বছর সময় লাগে। যেমন– শালগম, গাজর, বিট এবং বিশেষ জাতের মুলা ইত্যাদি।

(গ) বহুবর্ষজীবী বা দীর্ঘজীবী বা পেরিনিয়াল (Perennials)

যেসব সবজির গাছ অনুকূল পরিবেশে অনেক দিন বেঁচে থাকে সেগুলোকে দীর্ঘজীবী সবজি বলে। যেমন- শতমূলী, মানকচু ইত্যাদি।

উৎপাদন মৌসুম অনুযায়ী বাংলাদেশের সবজিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) রবি সবজি : যেসব সবজি রবি মৌসুমে অর্থাৎ অক্টোবর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত জন্মে, সেগুলোকে রবি সবজি বলে। যেমন- আলু, মিষ্টিআলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

(খ) খরিপ সবজি : যেসব সবজি খরিপ মৌসুম অর্থাৎ এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জন্মে সেগুলোকে খরিপ সবজি বলে। যেমন- চিচিঙ্গা, ধুন্দল ইত্যাদি।

(গ) বারোমাসী সবজি : যেসব সবজি সারা বছরই জন্মানো যায়, তাদের বারোমাসী সবজি বলে। যেমন- বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক ইত্যাদি।

উদ্ভিদের ব্যবহার্য অঙ্গ অনুযায়ী সবজিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(ক) পত্রবহুল সবজি বা লিফী ভেজিটেবল **(Leafy vegetable)** : যেসব সবজির প্রধানত ডগাসহ পাতা খাওয়া হয়, সেগুলোকে পত্রবহুল সবজি বা শাক বলা হয়। যেমন– লালশাক, পুঁইশাক ইত্যাদি।

(খ) ফলপ্রধান সবজি বা ফ্রুট ভেজিটেবল **( Fruit Vegetable)** : যেসব সবজির কেবল ফল খাওয়া হয় সেগুলোকে ফলপ্রধান সবজি বলে। যেমন- টমেটো, বেগুন, ঢেঁড়স ইত্যাদি।

(গ) কন্দাল সবজি বা টিউবার সবজি **(Tuberous Vegetable)** : যেসব উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড বা পাতা রূপান্তরিত হয়ে কন্দ উৎপাদন করে, সেগুলোকে কন্দাল সবজি বলে। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুযায়ী কন্দ নানা রকমের হয়ে থাকে। যথা–

মূলজ কন্দ– মূলা, শালগম, গাজর, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

কাণ্ডজ কন্দ- আলু, কচু, গাছ আলু, আদা ইত্যাদি।

পত্রজ কন্দ- পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

## ১.৬ ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর শারীরতত্ত্বীয় পরিবর্তন

ফল ও সবজি গাছ হতে পাকার পর এদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন হয়ে পেকে যায় এবং আরও পরে বিভিন্ন কারণে তা নষ্ট হতে থাকে। ফল ও সবজি সংগ্রহের যে সকল পরিবর্তন ঘটে থাকে তা নিম্নরূপ:

১. মেটাবলিক পরিবর্তন
২. গঠনমূলক পরিবর্তন
৩. বর্ধন ও ক্রমবিকাশ পরিবর্তন
৪. জলীয় অংশ কমে যাওয়া পরিবর্তন ও
৫. শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন

### ১. মেটাবলিক পরিবর্তন

পাকা ফল ও সবজি সংগ্রহের পর এদের দেহে মেটাবলিক পরিবর্তন হতে থাকে। মেটাবলিক পরিবর্তন বলতে শ্বসনক্রিয়া, ইথাইলিনের উৎপত্তি ও উপাদানগত পরিবর্তন ইত্যাদি বোঝায়। এ সকল পরিবর্তনগুলো ফল ও সবজিতে সঞ্চিত খাদ্যের মধ্যে চলতে থাকে। ফলে খাদ্যের মান, স্বাদ, গন্ধ এবং ওজন কমে যায়। শ্বসন প্রক্রিয়া বলতে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্জন বুঝায়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০ ভাগ শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসে। কচি ও অপরিপুষ্ট পণ্যসামগ্রী যেমন– কচি পাতা, কুঁড়ি, ফুলের কুঁড়ি, কচি ফল ইত্যাদির তুলনায় পরিপক্ব পাতা, পেয়াজের বাল্ব, গাজরের শিকড় এবং আলুর কন্দ ইত্যাদিতে শ্বসনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এছাড়া গুদামের পরিবেশগত তাপমাত্রা, শ্বসনের মাত্রা দারুণভাবে প্রভাবিত করে। প্রতি ১০০ সে. বর্ধিত তাপমাত্রায় শ্বসন বাড়ে ২-৪ গুণ। অধিকাংশ উদ্যানজাত পণ্য পাড়ার পর এগুলোর শ্বসনের পরিমাণ কমে যায় অথবা একই থাকে কিন্তু ক্লাইমেকটরিক ফলে হয় এর উল্টোটি। এগুলো পাকার সময় শ্বসনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এবং ইথাইলিন নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

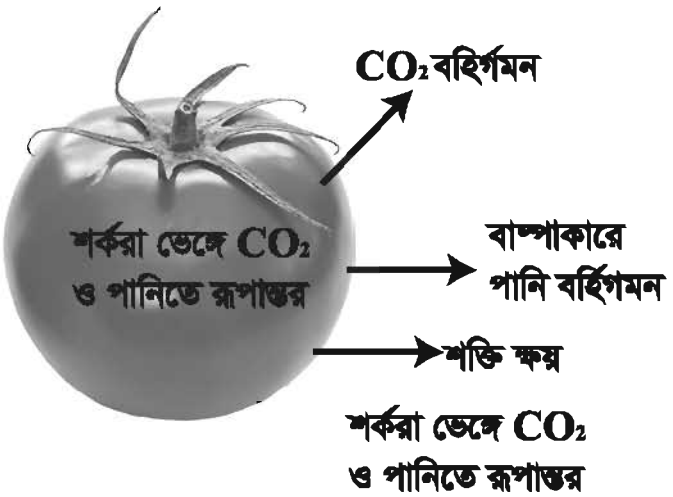


চিত্র: সংগৃহীত ফলের শ্বসন প্রক্রিয়া

### ইথাইলিন ক্রিয়া (Ethylene)

ইথাইলিন একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা গ্যাস আকারে সৃষ্টি হয়। খাদ্য বিনষ্টকারী জীবাণু এটি উৎপন্ন করে। একে ফল পাকার হরমোন বলা হয়। ইহা গাছের বর্ধন ও পরিপক্বতা নিয়ন্ত্রণ করে। ইথাইলিনের সংস্পর্শে এলে গাছ থেকে তোলা পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। বেশি মাত্রার ইথাইলিন ফল ছাড়া সব উদ্যানজাত পণ্যের জন্য ক্ষতিকর।

### ২. গঠমূলক পরিবর্তন

গাছ থেকে তোলার পরবর্তী সময়ে ফলমূল ও শাকসবজির গঠনে কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত দুই রকমের পরিবর্তনই ঘটতে পারে। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে স্বাদ, সুবাস, রং এবং অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রয়োজনীয় বিন্যাস ইত্যাদি। আর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিতক সবুজ রং নষ্ট হয়ে যাওয়া, কান্ডের কোষ বা কলা আঁশালো হওয়া (ডাটা শাকের ডাটায়, পরিপক্ক ঢেঁড়সে), ফলের অত্যন্তরে শর্করা এ্যালকোহলে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

### ৩. বর্ধন ও ক্রমবিকাশ পরিবর্তন

গাছ থেকে পাড়ার পর ফলমূল ও শাক-সবজির যে বর্ধন ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলতে থাকে তাতে তাদের ক্ষতিও হতে থাকে। যেমন- আলু ও পেঁয়াজের অঙ্কুর বের হওয়া, অ্যাসপ্যারাগাসের লম্বা হয়ে বেঁকে যাওয়া, ফলের মাঝে থাকা অবস্থাতেই বীজ থেকে চারা গজানো (পেঁপে, টমেটো, কাঁঠাল ও বাতাবি লেবু) ইত্যাদি।

### ৪. জলীয় অংশ কমে যাওয়া

ফল ও সবজিতে জলীয় অংশ দুইটি কারণে কমে যায়। তা হলো প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ও ক্ষত সৃষ্টি হওয়া। প্রস্বেদন হচ্ছে উদ্ভিদ কোষ থেকে পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। ক্ষত সৃষ্টি হলে বেশি প্রস্বেদন হয়ে অভ্যন্তরিণ পানি শুকিয়ে যায় এবং বিনষ্টকারী জীবাণুর প্রবেশ ঘটে। ফলে ফল ও সবজির রং বিবর্ণ হয়ে যায় এবং থেঁতলে যাওয়া ফলমূলের গুণগত মান কমে যায়। আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে, কুঁচকে যায়, সতেজ তরতাজা চেহারা নষ্ট হয়ে যায় এবং ওজন কমে যায়।

### ৫. শরীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন

যে সকল কারণে ফল ও সবজির শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো হলো– হিমায়িতকরণে, অতিরিক্ত তাপ, গুদামের পরিবেশ, ঠাণ্ডাকরণ ইত্যাদি। হিমায়িতকরণের নিচের তাপমাত্রায় উদ্যানজাত পণ্যের বিভিন্ন ক্ষতি এবং এগুলোর কোষ বা কলার ধ্বংস হয়। ঠাণ্ডাজনিত কারণে আম, পেঁপে, টমেটো ইত্যাদি ফলের গায়ে ছোট ছোট গর্ত, স্বাভাবিক রং নষ্ট, ভেজা ভেজা দাগ, ঝলসানো দাগের সৃষ্টি হয়। এতে পণ্যের স্বকীয় সুবাস ও গন্ধ নষ্ট হয়ে যায় এবং ঠিকমতো পাকে না। বাংলাদেশে ফল ও সবজির জন্য হিমাগার বা হিমায়িত গাড়ির ব্যবস্থা এখনও বৃদ্ধি পায়নি বিধায় ঠাণ্ডাজনিত ক্ষত তেমন দেখা যায় না। ফল ও সবজি পরিবহনকালে গুদামের অবস্থা ও আলো-বাতাসের কারণে ক্ষতি হতে পারে। পণ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ২ ভাগের উপরে গেলে ক্ষতি হয় এবং অক্সিজেনের মাত্রা ১ ভাগের নিচে চলে গেল উদ্যান ফসলের কোনো না কোনো ক্ষতি হয়। ইথিলিনের আধিক্য সবজির জন্য ক্ষতিকর।

## ফল ও সবজির পেকে যাওয়ার কারণ

ফল ও সবজি গাছেও পাকতে পারে আবার সংগ্রহের পরও পাকতে পারে। এ প্রক্রিয়া নির্ভর করে ফল ও সবজির জাত এবং ব্যবহারের উপর। ফল পাকার পর রং, স্বাদ, গন্ধ ও চেহারার আমূল পরিবর্তন হয় যা ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করে থাকে। ফলের এ চেহারা শ্বসন প্রক্রিয়ার জন্যই হয়ে থাকে এবং পরোক্ষভাবে নির্ভর করে ফলের পুরো বৃদ্ধির উপর। অপরিপক্ব ফলের রং ও স্বাদ ভালো হয় না। ফল ও সবজি যখন পাকে তখন শ্বেতসারের পরিমাণ কমে এবং শর্করা বা চিনির পরিমাণ বাড়ে, যার ফলে মিষ্টি লাগে। ফলের পাকা অবস্থায় মাংসল অংশে ক্ষারীয়ভাব কমে যায়, যার ফলে সংগ্রহ আকর্ষণীয় ও সহজতর হয়। ফল পাকার সময় একপ্রকার সুগন্ধী রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় যা মানুষ ও জীবজন্তুকে আকর্ষণ করে।

কাচা ফলের উপর ইথাইলিন ছিটালে ফলের শ্বসন ক্রিয়া বেড়ে যায় এবং অপুষ্ট ফলও পেকে যায়। এর ব্যবহারে আম তাড়াতাড়ি পাকে। এমনকি অসময়ে বেলও পেকে যায়। কার্বাইডের সাহায্যেও ফল পাকানো যায় এবং এতে ফলের রং ও স্বাদ উন্নতমানের হয়। ইথাইলিনের ০.১ নিযুতাংশ বা পার্টস পার মিলিয়ন অথবা একটু বেশি পরিমাণ ব্যবহারে সবুজ কলা তাড়াতাড়ি পেকে যায়।

শাক-সবজি কাঁচা অবস্থায় খেতে হয়। তাই শাক-সবজি পেকে গেলে আর খাওয়া যায় না। এ জন্য সবজি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে এগুলো সংগ্রহ করতে হয়। শাক-সবজি সংগ্রহের একটি ছক নিম্নে দেওয়া হলো।

| ক্র. নং | শাকসবজির নাম | সংগ্রহের স্তর |
|---|---|---|
| ১. | পাতাজাতীয় সবজি | লেটুস পাতা মচমচে, বাঁধাকপি ও চীনা বাঁধাকপি শাঁস শক্তভাবে বাধা অবস্থায়। |
| ২. | মূলজাতীয় সবজি | গোল আলু, মিষ্টি আলু, মুখীকচু, মেটে আলু ইত্যাদি পুরো পরিপক্ব আর মূলা, শালগম, ওলকপি, বিট, গাজর কিছুটা কচি ও রসালো অবস্থায় কিন্তু আঁশালো হওয়ার পূর্বে। |
| ৩. | ডগা ও কাণ্ডজাতীয় সবজি | কচি ও রসালো অবস্থায় আঁশালো হওয়ার পূর্বে। যেমন- ডাঁটা। |
| ৪. | ফুল জাতীয় সবজি | ফুলে ঠাসা, সুঠাম ও আকর্ষণীয় পাকা অস্থায়, যেমন-ফুলকপি। |
| ৫. | ফল জাতীয় সবজি | টমেটো, তরমুজ ও ফুটি পুরো পাকার পূর্বে আর মিষ্টি কুমড়া ও চালকুমড়া পুরো পাকার পর। |
| ৬. | দানা জাতীয় সবজি | মটরশুঁটি, শিম ও বরবটি ইত্যাদির দানা খাওয়ার পর্যায়ে পৌছালে। |

## ১.৭ ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর পোকামাকড় ও জীবাণু আক্রমণ

ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর সময় বিভিন্ন পোকামাকড় ও জীবাণু আক্রমণের ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ সকল পোকামাকড় ও জীবাণু সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ক্ষতি করে থাকে। এগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

### (ক) প্রাণিজনিত কারণ

ইঁদুর, পাখি বা অন্য কোন প্রাণী ফল ও সবজি খেয়ে দংশন করে বা অন্য কোনো প্রকারে ফল ও সবজির সরাসরি ক্ষতি করে। যার ফলে পরিমাণের দিক থেকে ওজন কমতে থাকে এবং বাজারজাতকরণের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া উপরোক্ত প্রাণীর পরিত্যক্ত মল-মূত্র, বিষ্ঠা, লোম, চুল, পাখার অংশ দ্বারা ফল ও সবজির গুণগত মানের অবনতি ঘটাতে পারে।

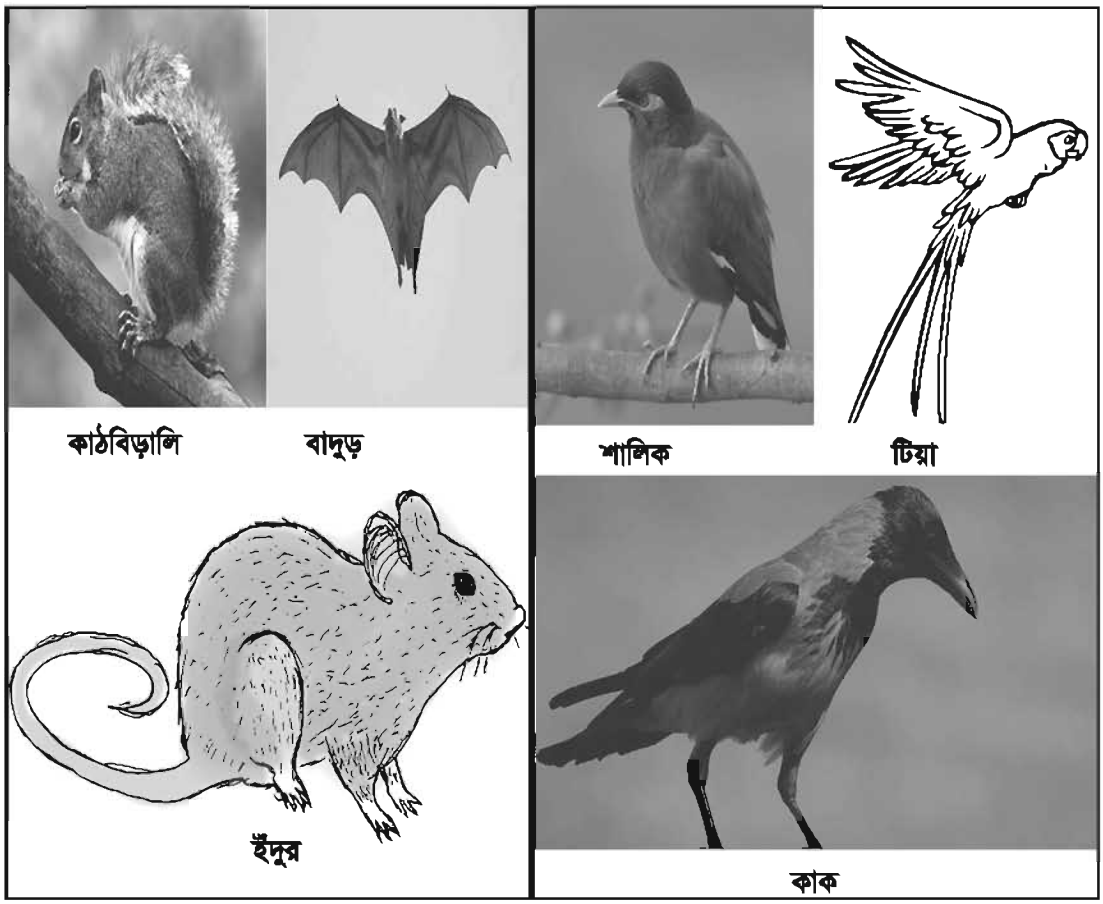


চিত্র : ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, বাদুড়, শালিক, টিয়া, কাক

### (খ) পোকামাকড়জনিত কারণ

বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় যেমন- এফিড, হপার, ফ্রুট ফ্লাই, বিটল, মথ, স্পাইডার ইত্যাদি দ্বারা ফল ও সবজি আক্রান্ত হয়ে থাকে। আক্রান্ত হলে ফল ও সবজির আকার, আকৃতি ও মান নষ্ট হয়ে যায়। কৃষক তার কাঙ্ক্ষিত দাম বাজার থেকে পায় না। এছাড়া আক্রান্ত ফল ও সবজিতে বিষক্রিয়ার প্রচুর আশঙ্কা থাকে।

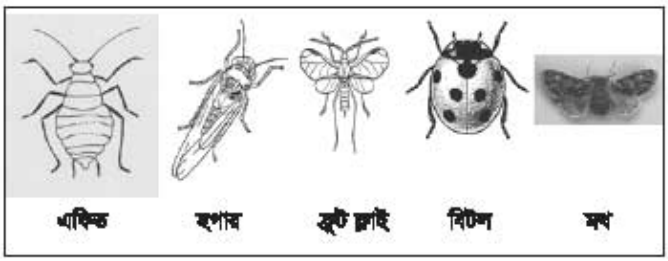


চিত্র: ফল ও সবজিতে আক্রান্তকারী বিভিন্ন পোকামাকড়

### (গ) জীবাণুঘটিত কারণ

পরিপক্কতার সঠিক পর্যায়ে সুস্থ ও পুষ্ট ফল ও সবজি গাছ থেকে সংগ্রহ করা হলে সেগুলোতে সাধারণত জীবাণুর আক্রমণ হতে পারে না কিন্তু পরিবহন ও বিতরণের বিভিন্ন স্তরে যদি ফল ও সবজিতে আঘাত লাগে, তাহলে ক্ষতস্থানে গিয়ে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা ইস্টের আক্রমণ ঘটে এবং পণ্য পচে যায়। আবার যদি গাছে থাকা অবস্থায় সংগৃহীত ফল ও সবজি সঠিক পরিপক্কতার পর্যায়টি অতিক্রম করে, তাহলে অল্প দিনের মধ্যে পেকে নরম হয়ে যায় এবং জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে অতি সহজেই ফল ও সবজি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

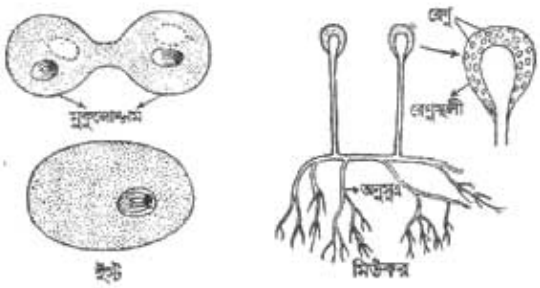


চিত্র : ইস্ট ও ছত্রাক জীবাণু

### (ঘ) আঘাতজনিত কারণ

ফল ও সবজি পেড়ে বাজারে নেয়ার সময় আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। আঘাতের ফলে জীবাণুর আক্রমণ সহজতর হয়। এ ছাড়া ফসলের অভ্যন্তরে কোষকলার অপরিহার্য গঠন মোটামুটি নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরিত গতিতে হতে থাকে। যেমন- আলু বা বেগুন আঘাতপ্রাপ্ত হলে আঘাতের জায়গাটি বেগুনি রং ধারণ করে। এটি বেগুনিকরণ এনজাইম দ্বারা ঘটে থাকে। বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে এটি রাসায়নিকভাবে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে এবং কোষের ক্ষতি করে। পরে সে জায়গা থেকেই পচন ক্রিয়া শুরু হয়। ফল ও সবজি আঘাতপ্রাপ্ত হলে একদিকে যেমন শ্বসন ও প্রস্বেদনের গতি বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি ফসলের অভ্যন্তরে ইথাইলিনের তৈরি প্রক্রিয়াও বৃদ্ধি ঘটে। এতে ফল দ্রুত গতিতে পেকে গিয়ে পরিবহন ও বিতরণের পর্যায়েই নষ্ট হয়ে যায়।

২০২০

## অনুশীলনী -১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কোন মোগল সম্রাট ১ লাখ আম গাছের বাগান করেছিলেন?
২. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ফল গাছকে কী খাবার বলা হয়ে থাকে?
৩. ফলে বিশেষ কী থাকে যা পরবর্তীতে ভিটামিন-'এ' - তে রূপান্তরিত হয়?
৪. প্রতিদিন মাথাপিছু কত গ্রাম ফল খাওয়া উচিত?
৫. মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ কেন কমে যাচ্ছে?
৬. মোট ফসল ভিত্তিক আয়ের শতকরা কত ভাগ ফল থেকে আসে?
৭. প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন কী পরিমাণ সবজি খাওয়া উচিত?
৮. আমাদের দেশের মানুষ প্রতিদিন যে সবজি খায় তার পরিমাণ কত?
৯. মানব শরীরের কত ভাগ ভিটামিন 'সি' ফল ও সবজি থেকে পাওয়া যায়?
১০. বেগুন, টমেটো, মটরশুঁটি প্রভৃতি সবজিকে উদ্ভিদতাত্ত্বিক দিক দিয়ে কী বলা হয়?
১১. মুলা, গাঁজর, শালগম ও মিষ্টি আলু আসলে কী?
১২. কচু, আলু, পেঁয়াজ, রসুন আসলে কী?
১৩. পাতার কাজ কী?
১৪. কয়েকটি পচনশীল ও কয়েকটি অপচনশীল সবজির নাম লেখ।
১৫. ফল ও সবজি কখন আকর্ষণহীন হয়ে নেতিয়ে পড়ে?
১৬. ফল ও সবজি পরিবহন ও বাজারজাতকরণে কোন দুটি জিনিসের ব্যাপারে যত্নবান হতে হয়?
১৭. পচনশীল ফলকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে ও কী কী?
১৮. আম, কলা, পেঁপে, কাঁঠাল ও বেল কি জাতীয় ফল?
১৯. কামরাঙ্গা, লেবু, নারিকেল, জাম্বুরা, তরমুজ, আমলকী কী জাতীয় ফল?
২০. আমিষের প্রধান উৎসগুলো কী কী?
২১. টাটকা ফল ও সবজিতে শতকরা কত ভাগ আমিষ পাওয়া যায়?
২২. মানব শরীরে শ্বেতসারের কাজ কী?
২৩. ভোজ্যতেলগুলো কী কী?
২৪. ভিটামিন- 'বি' -এর অভাবে কী কী রোগ হয়?
২৫. সবুজ পাতা জাতীয় শাক কোন কোন ভিটামিনের উৎস?
২৬. কলিজা, মাছ, ডিম ও গুড়ে কোন পুষ্টি উপাদান বেশি পাওয়া যায়?
২৭. কোন জিনিসের মূল্য স্থাবর সম্পত্তির মতো বাড়তে থাকে?
২৮. জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ফলকে কতভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
২৯. আপেল, নাশপাতি, পিচ কোন অঞ্চলের ফল?
৩০. কমলা, জলপাই ও ডালিম কোন অঞ্চলের ফল?
৩১. ভূমধ্যসগরীয় অঞ্চলে কোন কোন দেশ অবস্থিত?
৩২. সীতা লাউ কোন ধরনের সবজি?
৩৩. পেরিনিয়াল সবজি বলতে কী বুঝায়?
৩৪. ফলপ্রধান সবজি কোনগুলো?
৩৫. মেটাবলিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়?

৩৬. শ্বসন প্রক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?
৩৭. শ্বসন প্রক্রিয়ার কতভাগ শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসে?
৩৮. ক্লাইমেকটরিক ফল পাড়ার পর কী পরিবর্তন ঘটে?
৩৯. বেশি মাত্রার ইথাইলিন ফল ছাড়া কিসের জন্য ক্ষতিকর?
৪০. প্রস্বেদন মানে কী?
৪১. ঠান্ডাজনিত কারনে আম, পেঁপে ও টমেটোর কী কী ক্ষতি হয়?
৪২. গুদামজাত পণ্যে $CO_2$ এবং $O_2$ এর মাত্রা কীরূপ হলে কোনো না কোনো ক্ষতি হয়?
৪৩. ফল ও সবজি যখন পাকে তখন শ্বেতসার ও চিনির কী অবস্থা হয়?
৪৪. কী পরিমাণ ইথাইলিন ব্যবহার করলে সবুজ কলা তাড়াতাড়ি পাকে?
৪৫. কোন কোন প্রাণী ফল ও সবজির ক্ষতি করে?
৪৬. কোন কোন পোকামাকড় ফল ও সবজির ক্ষতি করে?
৪৭. বেগুনিকরণ এনজাইম কী কাজ করে?

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি আমাদের জীবনে কী কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
২. আমাদের প্রতিদিন কতটুকু ফল ও সবজি খাওয়া উচিত? আমরা তা কতটুকু পেয়ে থাকি?
৩. ফল কাকে বলে?
৪. নিষেক ক্রিয়া ছাড়া উৎপাদিত কোনগুলো সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়?
৫. কোনগুলো পচনশীল ও অপচনশীল ফল ও সবজি?
৬. তাজা অবস্থায় ফল ও সবজির আকৃতি কীরূপ থাকে?
৭. ক্লাইমেক্টরিক ও নন ক্লাইমেক্টরিক ফল ও সবজি বলতে কী বুঝায়?
৮. টাটকা ফল ও সবজিতে আমিষ, শ্বেতসার ও চর্বির পরিমাণ কীরূপ থাকে?
৯. গুরুত্ব অনুযায়ী ফল কত প্রকার ও কী কী?
১০. নিরক্ষীয় ও উপ-নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফলের বর্ণনা দাও।
১১. শীতপ্রধান ও ভূমধ্যসগারীয় অঞ্চলের ফলের বর্ণনা দাও।
১২. সবজিকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
১৩. জীবনকালের স্থায়িত্ব অনুযায়ী সবজিকে কতভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
১৪. মেটাবলিক পরিবর্তনে ফল ও সবজিতে কী ঘটে?
১৫. ফল ও সবজিতে ইথাইলিনের ক্রিয়া বর্ণনা কর।
১৬. ফুল ও ফল জাতীয় সবজির সংগ্রহের স্তর বর্ণনা কর।
১৭. ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর জীবণুঘটিত কারণ বর্ণনা কর।
১৮. ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর আঘাতজনিত কারণ বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফল ও সবজির পরিচিতি ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. ফল ও সবজির উদ্ভিদতাত্ত্বিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কর।

৩. পচনশীল ও অপচনশীল ফল ও সবজি কাকে বলে। এগুলো কত প্রকার ও কী কী বর্ণনা দাও।

৪. ফল ও সবজির পুষ্টিমানের বর্ণনা দাও।

৫. ফল ও সবজির বিভিন্ন অর্থনৈতিক গুরুত্বের বর্ণনা দাও।

৬. ফলের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭. বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সবজির শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৮. ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন বর্ণনা কর।

৯. ফল ও সবজির পেকে যাওয়ার কারণ কী? বিভিন্ন প্রকার সবজির সংগ্রহের স্তর বর্ণনা কর।

১০. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর পোকামাকড় ও জীবাণুর ক্রিয়া বর্ণনা কর।

# অধ্যায়-২
# ফল ও সবজি সংগ্রহ

## ভূমিকা

ফসলের লাভজনক ফলন এবং তার গুণাগুণ শুধু উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না, সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ প্রণালির ওপরও তা অনেকটা নির্ভর করে। ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফল ও সবজিকে উৎপাদন পর্যায় থেকে ব্যবহারিক পর্যায়ে আনা হয়। যত্নের সাথে এ কাজের তদারকি এবং সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহের ফলে আমরা বাড়তি আর্থিক মূল্যসম্পন্ন গুণগতমানের ফসল পেতে পারি। ফলে অক্ষত অবস্থায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য এবং উৎকৃষ্ট মানের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য তৈরি করার জন্য ফল ও সবজি যথাসময়ে সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের লক্ষ্য অনুযায়ী ফসল যখন নিজ নিজ জাতের সর্বোৎকৃষ্ট আকার, রং, স্বাদ এবং গুণাগুণ অর্জন করে তখনই ফসল সংগ্রহ করা উচিত। অপরিপক্ব ফল সংগ্রহ করলে যেমন গুণাগুণ বজায় থাকে না, তেমনি চাষি ফলের ন্যায্য মূল্য পায় না। আবার বেশি পরিপক্ব হলেও গুণগত মান তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে ফল দ্রুত পচে যায়। ফলের পরিক্বতা বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায় যখন ফলের আকার ও আয়তন এবং বয়সের সর্বশেষ অবস্থা, অর্থাৎ এরপর ফলের আকার ও আয়তন আর বৃদ্ধি পায় না এবং গুণাগুণের এমন পরিবর্তন ঘটে, যার মধ্যমে ফল ভক্ষণযোগ্য বা খাবার উপযোগী হয়। ফল পাকার সাথে সাথে ফলের রং, গন্ধ ও বুনটের পরিবর্তন হয় যার দরুন ফল ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

## ২.১ সংগ্রহ কার্য ব্যবস্থাপনা

ফল ও সবজি সংগ্রহ কার্যক্রম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে একটি শক্ত সাংগঠনিক ও উত্তম ব্যবস্থা না থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের মান ও গুণাগুণ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বাগান থেকে ফল পাড়া ও ক্ষেত থেকে সবজি তোলার বিভিন্ন রকম সুব্যবস্থা থাকা খুবই প্রয়োজন। ফসল সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নে দেওয়া হলো :

১. সঠিক পরিপক্বতা নির্ধারণ
২. সতর্কতার সাথে সংগ্রহ
৩. প্রখর সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করা
৪. কর্তনযন্ত্রের ব্যবহারে সাবধানতা
৫. ভালো তদারকির নিশ্চয়তা করা
৬. কাজের দায়িত্ব বণ্টন
৭. পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

## সঠিক পরিপক্কতা নির্ধারণ

ফল ও সবজির গুণাগুণ বহুলাংশে তার পরিপক্কতার উপর নির্ভর করে। অপক্ক ফল যেমন খেতে বিস্বাদ লাগে এবং পুষ্টি কম থাকে। তেমনি অতিরিক্ত পরিপক্ক ফল বা সবজিও উত্তম মানের হয় না। আবার সকল ফল বা সবজির পরিপক্কতার সূচকও এক নয়। ফল ও সবজির পরিপক্কতার ধরন ভালো করে জানতে হবে। তারপর সঠিক সময়ে তা সংগ্রহ করতে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তাই ফসলের ধরন এবং তার ব্যবহার ও বাজারের দূরত্ব বিবেচনা করে সঠিক পরিপক্ক অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

## সতর্কতার সঙ্গে সংগ্রহ

ক্ষেত বা বাগান থেকে ফল ও সবজি অতি সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। খেয়াল রাখা উচিত যে, সংগ্রহকালীন সময়ে মনের অজান্তে হাতের নখ দ্বারা বা সংগ্রহকারী নারীর গয়নার দ্বারা, ছুরি বা ছাঁটাইযন্ত্র যেমন- কাঁচি বা সিকেচারের আঘাতে ফল ও সবজিতে ক্ষত সৃষ্টি না হয়। ফল বা সবজি গাছের উপর থেকে মাটিতে না ফেলে ঝুড়ি বা থলেতে সংগ্রহ করতে হবে, কারণ ফলের গায়ে মাটি না লাগাই ভালো।

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের কাঁচি বা সিকেচার

## প্রখর সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করা

ফল বা সবজি সংগ্রহের জন্য এমন সময় বেছে নিতে হবে যাতে এগুলো প্রখর সূর্যতাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আবার মাঠ থেকে পরিবহনকালেও যাতে প্রচণ্ড গরমে ও বোঝার চাপে ফসলের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেজন্য ফল ও সবজি যথাসম্ভব ভোর বেলা বা পড়ন্ত বিকেল বেলা সংগ্রহ করা উচিত।

## কর্তনযন্ত্রের ব্যবহার

ফল বা সবজি হাত দিয়ে টেনে, ভেঙ্গে, দুমড়িয়ে বা মুচড়িয়ে না তুলে যথাসম্ভব বা কাঁচি দিয়ে কেটে নামানো উচিত। এছাড়া সিকেচার, উন্নতমানের ছুরি, বাডিং নাইফ, ট্রাওয়েল, ছাঁটাই করার যন্ত্র, শিকড় তোলার যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার কর্তন যন্ত্র

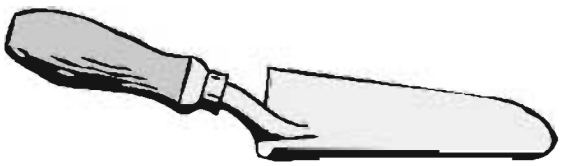

চিত্র : ট্রাওয়েল (Trowel).

## ভালো তদারকি নিশ্চিত করা

ফসলের পরিপক্বতা নির্ধারণ, সংগ্রহ, প্যাকিং করা এবং পরিবহণসহ সকল স্তরে দক্ষ কর্মীবাহিনীর তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়।

## কাজের দায়িত্ব বণ্টন

বাগানের বা খামারের সকল শ্রমিক বা কর্মচারী সকল কাজে সমান দক্ষ হয় না। যিনি যে কাজে দক্ষ তাকে সে কাজে নিয়োজিত করা উচিত। তাছাড়া কাজের মান ও গুণাগুণের উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। সকল কাজের মধ্যে যেন একটি সমন্বয় থাকে, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখা উচিত।

## পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

বাগান, মাঠ, ফসলের ক্ষেত, গুদাম ও প্যাকিং-এর স্থানে ময়লা জমিয়ে রাখা যাবে না। এতে করে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফসল সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদেরও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

## ২.২ সংগ্রহের জন্য পরিপক্বতা যাচাই

ফল ও সবজি বাজারজাত করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে হলে পরিপক্বতার সঠিক পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের পর ফল ও সবজি কতদিন ভালো অবস্থায় থাকবে তা অনেকটা নির্ভর করে এর পরিপক্বতার উপর। ফল ও সবজির বৃদ্ধির পূর্ণতালাভের পর এবং পরিপক্বতার প্রাথমিক অবস্থায় ফল ও সবজি পাড়া হয় তবে কোন অবস্থায় পাড়তে হবে সেটি নির্ভর করে ফলের প্রকৃতি ও বাজারের দূরত্বের উপর। পুরোপুরি পাকা ফল দীর্ঘপথ বা দীর্ঘ সময় ধরে পরিবহনের জন্য উপযোগী থাকে না যেমন– আম. কলা. কাঁঠাল ইত্যাদি। আবার নারিকেলের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। তাই নির্ধারিত বাজরে পৌছানোর জন্য কতটুকু সময় লাগতে পারে সেটি বিবেচনায় রেখে ফল পাড়ার পরিপক্বতা নির্ধারণ করা উচিত। দূরের বাজারের জন্য অপেক্ষাকৃত কম পরিপক্ব অবস্থায় এবং কাছের বাজারের জন্য অপেক্ষাকৃত পরিপক্ব অবস্থায় ফল ও সবজি পেড়ে সংগ্রহ করতে হয়। ফল ও সবজির পরিপক্বতাকে দুই ভাবে ভাগ করা যায়–

(ক) উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিপক্বতা
(খ) বাণিজ্যিক পরিপক্বতা

### উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিপক্বতা

এটি হলো পরিপক্বতার সেই অবস্থা যে অবস্থায় পৌছানোর অব্যবহিত পরেই ফসলের জীবনাবসান শুরু হয়। যেমন- পাকা নারিকেল ও তাল পেকে যখন ধপ করে মাটিতে পড়ে তখন তাল ও নারিকেলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিপক্বতা সম্পন্ন হয়। এ অবস্থা বংশবৃদ্ধির জন্য চারা উৎপাদনে খুবই উপযোগী।

### বাণিজ্যিক পরিপক্বতা

যে অবস্থায় ফল ও সবজি পেড়ে বাজারজাত করা হয় তাকে বাণিজ্যিক পরিপক্বতা বলে। যেমন-ডাব ও তাল উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিপক্বতার অনেক আগেই যথাক্রমে ডাবের পানি ও তালের শাঁসের জন্য বাজারজাত করা হয়। এ অবস্থাটি হচ্ছে ডাব ও তালের বাণিজ্যিক পরিপক্বতা। আবার তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়ার জন্য গাছপাকা অবস্থায় পেঁপে পাড়া হলে সেটিকেও বাণিজ্যিক পরিপক্বতা বলে। এক্ষেত্রে পেঁপের বাণিজ্যিক ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিপক্বতার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। ফল ও সবজির পরিপক্বতা যাচাই করতে যে জিনিস দুটি জানা প্রয়োজন, তা হলো– শ্বসন প্রক্রিয়া ও ইথিলিনের ক্রিয়া।

### শ্বসন প্রক্রিয়া

সকল ফল ও সবজি শ্বসনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে মেনে চলে। বয়স বাড়ার সাথে ফলের শ্বসনের হার ক্রমাগত কমতে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাকার পূর্ব মুহূর্তে শ্বসনের হার বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুতগতিতে ফল পাকার ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। এসব ফলকে বলে ক্লাইমেকটরিক ফল। কলা, আম, পেঁয়ারা, কাঁঠাল, পেঁপে, টমেটো এ শ্রেণির ফল। পক্ষান্তরে নন-ক্লাইমেকটরিক শ্রেণির ফলে শ্বসনের হার ক্রমাগতই কমতে থাকে এবং কখনই এ হার হঠাৎ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় না। কামরাঙ্গা, শসা, বেগুন, লেবু, বাতাবিলেবু, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি এ শ্রেণির ফল।

## ইথাইলিনের ক্রিয়া

শ্বসনের সাথে ইথাইলিন বা ইথিলিনের উৎপাদন প্রক্রিয়া সরাসরি সম্পৃক্ত বলে নন-ক্লাইমেকটরিক ফলের পাকার প্রক্রিয়াটি ধীরগতিতে হয়, ক্লাইমেকটরিক ফলের মতো দ্রুতগতিতে ঘটে না। তাই ক্লাইমেকটরিক শ্রেণির ফল গাছে পাকার প্রক্রিয়া শুরুর আগে, পরিপুষ্ট অবস্থায় পেড়ে বাজারজাত করা হয়। এতে ইথিলিনের ক্রিয়ার কারণে ফলের গুণ ও মানের তেমন তারতম্য হয় না এবং সকল ফলই একসাথে পাকতে থাকে। কিন্তু নন-ক্লাইমেকটরিক শ্রেণির ফলে এমনটি হয় না। এ শ্রেণির ফল গাছে পাকার আগে সংগ্রহ করে পরে পাকিয়ে নিলে গুণে ও মানে নিকৃষ্ট হয়। তাই এ শ্রেণির ফল গাছে থাকা অবস্থায় কিছুটা পাকার পর রং ধরা শুরু হলে পেড়ে বাজারজাত করা হয়। কয়েকটি ফল ও সবজির বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক নিম্নের ছক দেখানো হলো–

| ক্র নং | ফলের নাম | বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক |
|---|---|---|
| ১ | আম | প্রথমে ২/১টি আমের রং হলুদ বর্ণ হবে। জাতভেদে এ রঙের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। সাধারণত ফুল আসার ৫-৬ মাসের মধ্যে আম পেকে ওঠে। কম দূরত্বের বাজারের জন্য পুরোপুরি পেকে ওঠার ঠিক আগের অবস্থায় আম গাছ থেকে পাড়া হয়। পক্ষান্তরে দূরের বাজারের বিক্রির জন্য গাঢ় সবুজ রঙের পরিপক্ব আম পাড়তে হয়। |
| ২ | পেঁপে | পেঁপে পরিপক্ব হলে এর গায়ের সবুজ রঙ হালকা সবুজ রঙে রূপান্তরিত হয়। বোঁটার কাছের দিকে সবুজ রং হালকা হয়ে হলুদ রঙের আভা দেখা দেয়। কাছের বাজারের বিক্রির জন বেশি পরিপক্ব অবস্থায় অর্থাৎ ফলের অর্ধেক ভাগ হলুদ হলে পাড়া যায়। দূরবর্তী বাজারের জন্য পুষ্ট হওয়ার পর কিন্তু সবুজ রং থাকতেই ফল পাড়তে হয়। পেঁপের কষ দুধালো অবস্থা থেকে পানিরমতো হলে পরিপক্ব হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। |
| ৩ | আনারস | আনারস পাকতে থাকলে ফলের বাইরের আবরণে ক্লোরোফিলের পরিমাণ দ্রুত কমতে থাকে। ফলের গোড়ার দিকের রং সবুজ থেকে হলদে বা হালকা বাদামি রঙে পরিণত হয়। আনারসের চোখের উপরের আবরণ শুকিয়ে যায়। টাটকা বিক্রির জন্য ফলের রঙ পুরোপুরি পরিবর্তিত হওয়ার আগেই আনারস তুলতে হয়। |
| ৪ | লিচু | লিচু পাকলে ফলের রং সাধারণত লালচে উজ্জ্বল হয়ে আসে এবং কাঁটাগুলো আর শক্ত থাকে না। কাঁটার গোড়াগুলো মোটা হয়ে যায় এবং ফলের গা ভরাট হয়। অর্থাৎ কাটাগুলোর মাঝের খাঁজ বেশি নিচু থাকে না। |
| ৫ | কলা | কলা পরিপক্ব হলে ফুল শুকিয়ে যায়। খোসার উপরের শিরাগুলো ভরে গিয়ে সুডৌল হয় এবং বোঁটার দিকে হলুদাভ হতে থাকে। কলার গায়ের সবুজ রং হালকা হয়ে যায় এবং ২/১টি কলায় হলদে ভাব দেখা যায়। |
| ৬ | তরমুজ | তরমুজ পাকলে ফলে টোকা দিলে ড্যাব ড্যাব শব্দ হয়। ফলের যে অংশটি মাটিতে লেগে থাকে সে অংশের সাদা রং হলুদ বা ঘিয়ে রঙে রূপান্তরিত হয়। পাঁকা ফলের বোঁটার খসখসে ভাব দূর হয়ে মসৃণ হয় এবং আকর্ষি শুকিয়ে যায়। |

| ক্র নং | সবজির নাম | বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক |
|---|---|---|
| ১ | ফুলকপি | ফুলকপির ফুল দেখা যাওয়ার পর হতে ১৫-২০ দিনের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিপক্বতা আসে। একটি নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হওয়ার পর ফুল আর বাড়ে না, তখনই সংগ্রহ করতে হয়। অতিরিক্ত সময় রাখা হলে ফুলকপির সবজি অংশ আলগা বা ঢিলা হয়ে যায়। |
| ২ | বাঁধাকপি | বাঁধাকপি মাথা সম্পূর্ণরূপে বড় হলে এবং শক্ত হলেই সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। ফসল কাটতে দেরি হলে বাঁধাকপির মাথা ফেটে যেতে পারে। তবে সংগ্রহ উপযুক্ত বাঁধাকপির মাঝখানে চাপ দিলে শক্ত অনুভূত হবে। |
| ৩ | লাউ | লাউ পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু বীজ হয়নি এমন পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে। বীজ শক্ত হলে লাউ খাওয়ার উপযোগী থাকে না। সংগ্রহ উপযুক্ত লাউয়ের গা লোমশ ও কোমল থাকে। |
| ৪ | টমেটো | টমেটো রং ধরলে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। দূরের বাজারে পাঠাতে হলে সম্পূর্ণ রঙিন হওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করতে হয়। |
| ৫ | ঢেঁড়স | ঢেঁড়সের ফল দ্রুত বাড়ে ও দেরিতে সংগ্রহ করলে আঁশময় হয়ে ওঠে। ফল আঙ্গুলের মতো দীর্ঘ হলেই সংগ্রহ করা যায়। ফুল থেকে বড় হওয়ার ৬-৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। ঢেঁড়স সংগ্রহে বিলম্ব করলে গাছে নতুন ফল আসার পরিমাণ কমে যায়। |

## ২.৩ ফল ও সবজি সংগ্রহের কাল ও সময় :

### ফল-সবজি সংগ্রহের সময়

ফল ও সবজির গুণগুত মান বিশেষ করে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ নির্ভর করে ফল ও সবজি সংগ্রহের সময়ের উপর। উদ্যান পণ্য সংগ্রহের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে ফল সংগ্রহ করার উপর ফল ও সবজির গুণাগুণ ও মান নির্ভর করে। অনেক সময় বেশি মুনাফার জন্য কাঁচা ফলই বজারে ওঠায়, এটা মোটেও ঠিক নয়। এছাড়া অনেকে কাঁচা ফলকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পাঁকিয়ে রং ধারণ করার পর বাজারে বিক্রয় করে ক্রেতাকে প্রতারিত করে; এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

ফল ও সবজি তরতাজা রাখার জন্য বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সংগ্রহের সময় যেকোনো কারণেই ফল ও সবজির কোনো ক্ষতি করা যাবে না। অনেক সময় সূর্যের আলো ফল ও সবজির উপর পড়লে এর উত্তাপ অনেক বেড়ে যায়। এ তাপ ফসলের যে ক্ষতি করে তা আর পূরণ করা যায় না এবং এর কারণে কতৃত ফসল প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য ফল ও সবজি সংগ্রহের সময় সূর্যতাপ এড়াতে হয়। প্রখর সূর্যালোকে কখনই ফল-সবজি পাড়া উচিত নয়। সাধারণত প্রভাত বেলায় অথবা পড়ন্ত বিকেল বেলা যখন প্রকৃতি বেশ ঠাণ্ডা থাকে তখন ফসল সংগ্রহ করা বা ফল পাড়া উচিত। তবে প্রকৃতি শিশিরভেজা থাকলে সূর্য ওঠার পর শিশির শুকিয়ে গেলে ফল ও সবজি সংগ্রহ করতে হয়।

## ২.৪ ফল ও সবজি সংগ্রহের পদ্ধতি

সাধারণ দুইভাবে ফল ও সবজি পাড়া হয়ে থাকে। যথা-

(ক) কায়িকভাবে বা ম্যানুয়েল পদ্ধতি
(খ) যান্ত্রিকভাবে বা মেকানিক্যাল পদ্ধতি

### ম্যানুয়েল বা হাত দিয়ে ফল পাড়া

উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই বেশির ভাগ ফল ও সবজি কায়িকভাবে হাত দিয়ে পাড়া বা সংগ্রহ করা হয়। হাত দিয়ে সংগ্রহ করা পণ্যের মান যান্ত্রিকভাবে সংগ্রহ করা পণ্যের মান অপেক্ষা অনেক ভালো হয়ে থাকে। ম্যানুয়েল বা কায়িকভাবে ফল ও সবজির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে দেয়া হলো-

সুবিধা:

১. অনেক বেশি যত্ন সহকারে ফল পাড়া যায়।
২. একসাথে অনেক লোককে কাজে লাগানো যেতে পারে।
৩. হাত দিয়ে ফল পাড়তে এক সাথে বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না।
৪. অপরিপুষ্ট বা যে ফল আরও কিছু সময় গাছে রাখা যাবে সেগুলো বাদ দিয়ে সংগ্রহ করা যায়।
৫. ফল পাড়ার সময় সহজেই চারদিকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে আরও নিখুঁতভাবে ফল পাড়া যায়।

অসুবিধা :

১. ফল পাড়তে বেশি সময় লাগে।
২. জরুরি ভিত্তিতে বেশি লোক দরকার হলে অনেক সময় চাহিদামতো লোক পাওয়া যায় না।
৩. কোন ফল কোন বয়সে সংগ্রহ করতে হবে সে বিষয়ে সব শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

### মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে ফল পাড়া

হাত দিয়ে ফল পাড়া বেশি পছন্দনীয় হলেও অনেক সময় মেশিনের সাহায্য ফল সংগ্রহ করতে হয়। মেশিনের সাহায্যে ফল সংগ্রহের কতকগুলো সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যেমন–

সুবিধা

১. তাড়াতাড়ি ফল সংগ্রহ করা যায় বা পাড়া যায়।
২. কাজের পরিবেশ আধুনিক ও উন্নত মানের হয়।
৩. কাজে নিয়োজিত লোকদের কাজ তদারকি করা সুবিধাজনক হয়।
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকলে তাড়াতাড়ি ফল পাড়া যায়।

অসুবিধা

১. ফল পাড়ার সময় গাছের ক্ষতি হতে পারে
২. যন্ত্র বা মেশিনের দাম অনেক বেশি যা সকলের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয় না।
৩. ছোট বাগান বা অল্প সংখ্যক গাছের জন্য মেশিন দিয়ে ফল সংগ্রহ করা লাভজনক হয় না।
৪. যেখানে শ্রমিক সহজলভ্য সে এলাকায় মেশিন ব্যবহারে লোকের কাজ করার সুযোগ কমে যাবে, ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
৫. মেশিন ব্যবহারের জন্য বড় বড় বাগান তৈরি করতে হয়।

৬. মেশিনে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, ছোট/বড়, উত্তম/খারাপ সব ফলই একসাথে সংগ্রহ হয়ে যায়।

ফল পাড়ার সময় বা ছিঁড়ার সময় যে সব ফল আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে পাড়া উচিত। যেসব ফল হাতের নাগালের মধ্যে থাকে না সেগুলো গাছে উঠে অথবা জালি বাঁধা বাঁশের লাঠির সাহায্যে পাড়া উচিত। তাতে লাঠির মাথায় ব্যাগের মতো তৈরি করা থাকে যা দিয়ে আস্তে ফল পাড়া যায়। আবার লাঠির মাথায় ছুরি বা কাঁচি বেঁধে বোঁটা কেটে ফল পাড়া যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল যে পাড়বে তাকে গাছে উঠে তার কাঁধে থলে বা ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখলে সুবিধাজনক হয়।

ফল পাড়ার আগে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে ফল কী উদ্দেশ্যে পাড়া হচ্ছে। কেননা আচার বা টক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ফল সংরক্ষণ করতে হলে অপরিপক্ব অবস্থায় অনেক সময় ফল পাড়তে হয়। অন্যদিকে জুস জাতীয় খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতে হলে বেশি পাকানোর প্রয়োজন হয়।

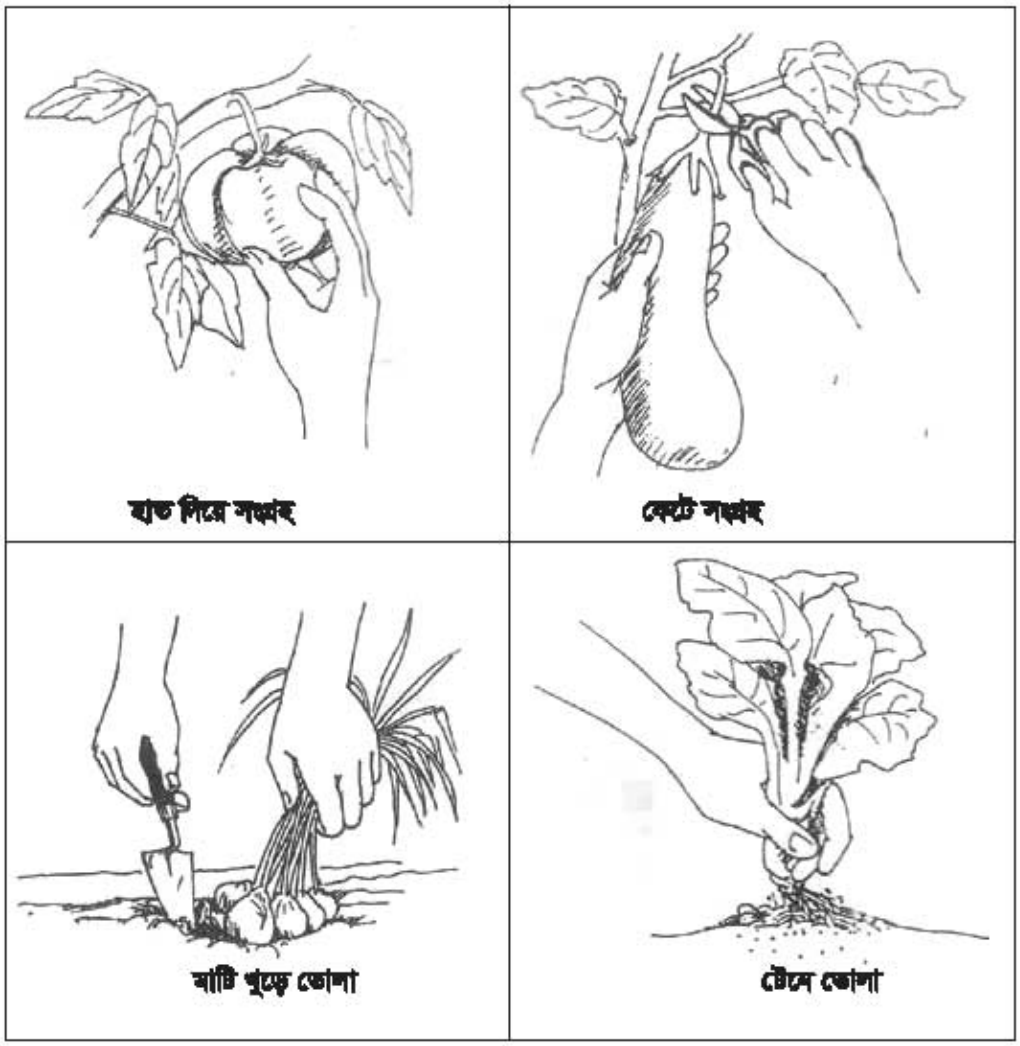


চিত্র : হাত দিয়ে সবজি সংগ্রহ করা

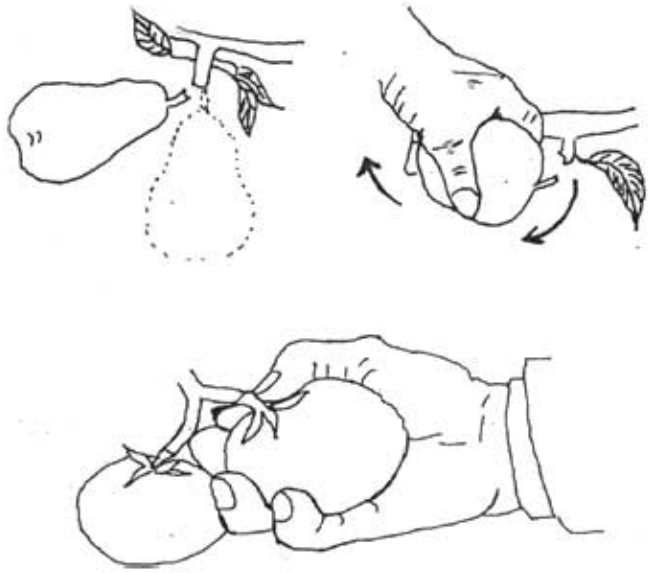

চিত্র: হাত দিয়ে ফল পাড়া

## ম্যানুয়ালি সবজি সংগ্রহ পদ্ধতি

ফল ও সবজি বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করা উচিত যাতে করে পণ্যের গায়ে কোন আঘাত না লাগে। ফসল সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত ধীরে সুস্থে এবং যত্নের সাথে করা উচিত। তাড়াহুড়া করলেই ফলের গায়ে আঘাত লাগতে পারে। যেমন- ডালিমের গায়ে আঘাত লাগলে বাহির হতে বোঝা যায় না কিন্তু ভিতরের দানাগুলা পচে যায়। সবজি সংগ্রহের কাজ হাত দিয়ে বা যান্ত্রিক উপায়ে করা যায়। তবে এ কাজটি অত্যন্ত সাবধানে করা উচিত। অন্যথায় মাতৃগাছের অংশমজাতীয় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ঢেঁড়স, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি সবজি কোনোমতেই ছিঁড়ে বা মুচড়িয়ে সংগ্রহ করা উচিত হবে না।

সারণি: বিভিন্ন সবজির সংগ্রহ পদ্ধতি

| সবজির নাম | সংগ্রহ পদ্ধতি |
|---|---|
| বেগুন, শসা, কুমড়া ইত্যাদি। | ধারালো ছুরি দিয়ে গাছের বোঁটা থেকে কেটে সংগ্রহ করতে হবে। |
| পিমাকলমি, ডাঁটা, লালশাক ইত্যাদি। | পুরো গাছটি শিকড়সহ উপড়ে ফেলে সংগ্রহ করতে হবে। |
| পুঁইশাক, লাউয়ের ডগা ইত্যাদি। | গাছের অংশ কেটে সংগ্রহ করতে হবে। |
| টমেটো, মরিচ, শিম ইত্যাদি। | হাত দিয়ে তুলে সংগ্রহ করতে হবে। |

## ম্যানুয়ালি ফল ও সবজি সংগ্রহের পদ্ধতি নিম্নরূপ

(ক) ফলের বোঁটা থেকে ভাঙ্গা

(খ) উঁচু গাছের ফল পাড়া

২০২০

### ফল বোঁটা থেকে ভাঙা

যে সমস্ত ফল পাড়ার সময় হলে বোঁটায় স্বাভাবিক ভঙ্গুর স্থানের সৃষ্টি হয়, সে সমস্ত ফল বা সবজি চিত্র অনুযায়ী ধরে উপরের দিকে তুলে ধরতে হয়। এতে ফলটি বোঁটার ভঙ্গুর স্থান থেকে খুব সহজেই খুলে হাতের মধ্যে চলে আসে। যেমন- টমেটো বেগুন ইত্যাদি।

### উঁচু গাছের ফল পাড়া

উঁচু গাছ থেকে ফল পাড়ার সময় ফল মাটিতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একজনকে গাছের ওপর থেকে ফল কেটে দিতে হয় এবং অন্য একজন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চটের বস্তা ধরতে হয়। এতে পড়ন্ত ফল প্রথমে বস্তার উপর পড়ে তারপর আস্তে আস্তে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে। এতে ফলের ক্ষতি কম হয়। দীর্ঘ ও খাটো মই (Ladder) -এর সাহায্যে গাছের পাশ থেকে ফল সংগ্রহ করা একটি উত্তম পদ্ধতি। ইদানীং ন্যামু মিনিয়ামের বিভিন্ন প্রকার মই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে সংগ্রহকারীর কাঁধে ঝুড়ি ঝুলিয়ে নিলে সুবিধা হয়।

### মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সংগ্রহ

কায়িকভাবে বা হাত দিয়ে পণ্য তোলার প্রবণতা বাড়ছে। শ্রমিকের ঘাটতি নানাবিধ সমস্যার কারণেই এ প্রবণতা বাড়ছে। এক সময় কৃষি কাজের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শক্তির উৎস ছিল পেশিশক্তি। ধীরে ধীরে অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় খামার যান্ত্রিকীরণের উন্মেষ ঘটে।

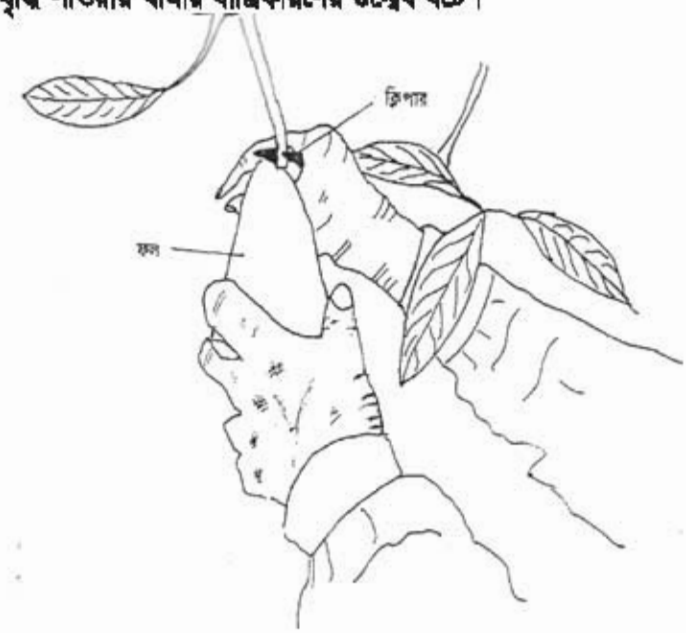


চিত্র : ক্লিপারের সাহায্যে পাড়া

ফলে বড় বড় খামার বা উদ্যানের জন্য যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিল্পায়িত দেশগুলোতে বিগত দশ বছরে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ব্যাপক উদ্ভাবন ও উন্নয়ন হয়েছে। শিল্পায়িত দেশসমূহে প্রধানত প্রক্রিয়াজতকরণ প্লান্টে ফল ও সবজি যান্ত্রিকভাবে সংগ্রহ করা হয়।

চিত্র : মেকানিক্যালি বড় বড় গাছ থেকে ফল সংগ্রহ

## কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ফসল সংগ্রহ

আজকাল সম্পূর্ণ যন্ত্রায়িত কৃষি ব্যবস্থায় দেশগুলোতে ফসল কর্তন, উত্তোলন, মাড়াই, ঝাড়াই একই সাথে ফসলের ক্ষেত্রেই একটি যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। একে কম্বাইন হারভেস্টার (Combine harvester) বলে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার গম ফসলের কম্বাইন হারভেস্টার মোটামুটি একই রকমের। জাপানের ধান ফসলের কম্বাইন হারভেস্টার একটু অন্য মডেলের হয়ে থাকে। এছাড়া তুলা হারভেস্টার, গোল আলু হারভেস্টার, ভুট্টা হারভেস্টার ও ফ্রুট হারভেস্টার ইত্যাদি শিল্পায়িত দেশে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ সকল বড় বড় মেশিনারি ব্যবহারের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন–

১. একটি প্লটের ফসলের আকার ও আকৃতি একই ধরনের হতে হবে।
২. ফল ও সবজি একই সময় পরিপক্ব হতে হবে।
৩. ফসল সারিবদ্ধভাবে বপন বা রোপণ করতে হবে।
৪. যন্ত্র চালনার জন্য দুই সারির মাঝখানে যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে।
৫. প্লটের আকার যথেষ্ট বড় হতে হবে।
৬. কোন ধরনের আইল থাকা চলবে না।

চিত্রঃ আলু হারভেস্টার

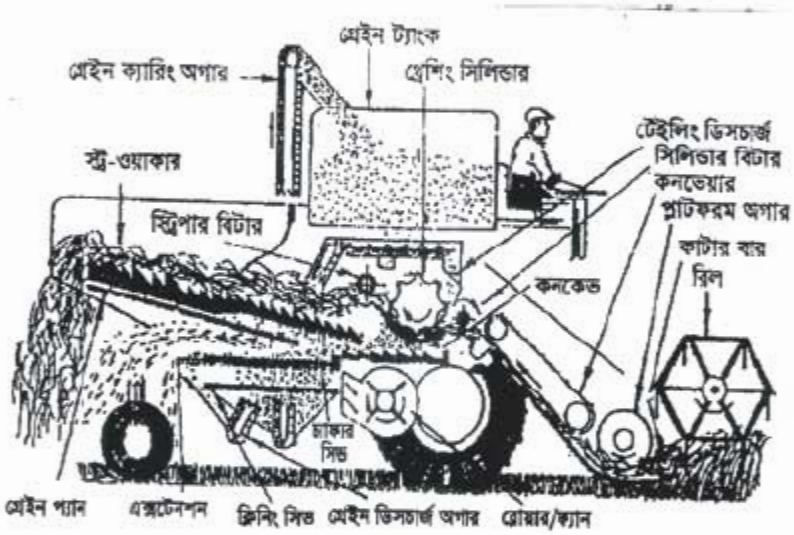


চিত্র : কম্বাইন হারভেস্টার

## ২.৫ ক্ষেত থেকে প্যাকেজিং শেডে ফসল পরিবহন

ক্ষেত বা খামার হতে ফল ও সবজি পেড়ে দ্রুত প্যাকেজিং শেডে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কাঁধে ঝাকা নিয়ে বা মাথায় করে অথবা বিভিন্ন ধরনের পরিবহন যানে নিয়ে থাকে। এ সময়ে পণ্যের যাতে কোন ক্ষতি না হতে পারে সেজন্য নিম্নের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

### (ক) যত্ন সহকারে পণ্য তোলা

ঝুড়ি বা প্লাস্টিক পাত্র করে ফল ও সবজি খুব সাবধানে একটির পর একটি করে সাজিয়ে পাত্রে রাখতে হয়। বড় বড় ফল হলে প্রয়োজনবোধে খবরের কাগজ, খড় বা নরম জাতীয় কিছু বস্তু দেয়া যেতে পারে। এতে করে ঝাঁকি খেলে পণ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। প্যাকিং হাউজে এনে পাত্র খুলে আছড়ে ফেলা যাবে না। পণ্য পরিবহন যান থেকে প্যাকিং শেডে নামানোর সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২০২০

### (খ) মেঠো রাস্তা সমান রাখা

সাধারণত মাটির রাস্তা এবড়ো-থেবড়ো এবং উঁচু-নিচু হয়ে থাকে। এসব রাস্তা দিয়ে পণ্য পরিবহনের সময় ঝাঁকুনিতে ফল ও সবজি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ জন্য খামারের মালিককে নিজ উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার করে নিতে হবে। রাস্তার খানা-খন্দ ভরাট করতে হবে। অন্যথায় খারাপ রাস্তা পরিহার করে অন্য রাস্তা ব্যবহার করতে হবে।

মেঠো পথ

পাকা রাস্তা

চিত্র : সুন্দর মেঠো পথ, সুন্দর পাকা রাস্তায় পরিবহনের গাড়ি

### (গ) নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালানো

কাঁচা রাস্তায় খামারবাড়িতে ফল ও সবজিবাহী পরিবহন দ্রুততার সাথে চালালে পণ্যের গায়ে ঘর্ষণের কারণে ক্ষত তৈরি হতে পারে। এ কারণে গাড়ি আস্তে আস্তে চালাতে হবে যাতে ঝাঁকুনির কারণে ক্ষতি না হয়।

### (ঘ) ছায়ায় রেখে ঠাণ্ডা করা

ফল ও সবজি সংগ্রহের পর ক্ষেতেই স্তূপীকৃত করে রাখা হয়। যেমন- আম, লেবু, কলা, আলু, কুমড়া, শিম ইত্যাদি। অনেক সময় প্রখর রৌদ্রতাপে ফল ও সবজির উত্তাপ বেড়ে যায় যা পরবর্তীতে সংরক্ষণে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও পণ্যের আকার, আকৃতি ও রঙের মান কমে যায়। এতে করে বাজারমূল্য কমে যায়। এজন্য পণ্য সংগ্রহের সাথে সাথে ছায়াযুক্ত স্থানে গাঁদা করতে হয় ও চট বা তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

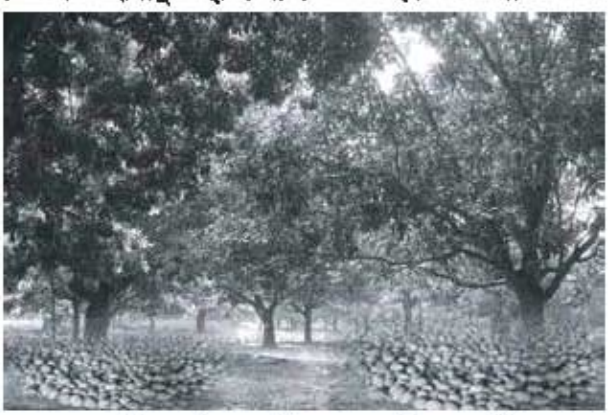

চিত্র : গাছের ছায়ায় ফল স্তূপীকৃত রাখা

# অনুশীলনী-২

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি কখন সংগ্রহ করা উচিত?
২. ফল অপরিপক্ব ও বেশি পরিপক্ব অবস্থায় সংগ্রহ করলে কী হয়?
৩. ফল ভোক্তার নিকট গ্রহনযোগ্য হয় কেন?
৪. ফল ও সবজি দিনের বেলা কখন সংগ্রহ করা উচিত?
৫. ফল ও সবজি কীভাবে গাছ থেকে পাড়া উচিত?
৬. কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে কী করা হয়?
৭. ফল ও সবজির পরিপক্বতা কত প্রকার ও কী কী?
৮. বাণিজ্যিক পরিপক্বতা বলতে কী বোঝায়?
৯. ফল ও সবজির পরিপক্বতা যাচাই করতে কোন দুটি জিনিষের বেশি প্রয়োজন?
১০. ক্লাইমেকটরিক ফল বলতে কী বোঝায়?
১১. নন-ক্লাইমকটরিক ফল কী? উদাহরণ দাও।
১২. আমের বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক কী?
১৩. তরমুজের বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক কী?
১৪. ঢেঁড়সের বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক কী?
১৫. কয়ভাবে ফল ও সবজি সংগ্রহ করা যায়?
১৬. ম্যানুয়ালি ফল পাড়ার প্রধান সুবিধা কী?
১৭. আচার বা টকজাতীয় ফল কী পরিপক্বতায় পাড়া হয়?
১৮. ডালিমের গায়ে আঘাত লাগলে পরবর্তীতে কী হয়?
১৯. কোন ফল বা সবজি পরিপক্ব হলে বোঁটায় ভঙ্গুর দাগ সৃষ্টি হয়?
২০. যে সকল ফলের বোঁটা শক্ত তা কী দিয়ে কাটতে হয়?
২১. উঁচু গাছের ফল কীভাবে পাড়লে ভল হয়?
২২. প্যাকিং শেডে পণ্য পরিবহনের রাস্তা কীরূপ হলে ভালো হয়?
২৩. মাঠে পণ্য একত্রীকরণের পর কীভাবে সাময়িক সংরক্ষণ করা হয়?

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিপক্ব ফল ও সবজি কীভাবে সংগ্রহ করা উচিত?
২. ফল ও সবজি সংগ্রহের সুষ্ঠু কার্য ব্যবস্থাপনাগুলো কী কী?
৩. ফল ও সবজির সঠিক পরিপক্বতা নির্ধারণের জন্য কী করা উচিত?
৪. উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক পরিপক্বতা বলতে কী বোঝায়?
৫. ফল ও সবজির পরিপক্বতার ক্ষেত্রে শ্বসনের প্রভাব লেখ।
৬. ফল ও সবজি পাকানোর ক্ষেত্রে ইথিলিন গ্যাসের ভূমিকা কী?

৭. আনারস ও পেঁপের বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক লেখ?
৮. ফুলকপি ও বাঁধাকপির বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক বর্ণনা কর।
৯. ফল ও সবজির সংগ্রহের সঠিক কাল ও সময় নির্ণয় কর।
১০. ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ফল পাড়ার সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
১১. মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে ফল ও সবজির পাড়ার সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
১২. ম্যানুয়ালি সবজি সংগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১৩. ম্যানুয়ালি ফল ও সবজি সংগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১৪. মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে ফল ও সবজি পাড়া বর্ণনা কর।
১৫. ক্ষেত থেকে প্যাকেজিং শেডে ফল ও সবজি ক্ষেতে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় তা উল্লেখ কর?

রচানামূলক প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বর্ণনা কর।
২. উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক পরিপক্বতা কী? শ্বসন ও ইথিলিন ক্রিয়া কীভাবে পরিপক্বতার প্রভাব বিস্তার করে?
৩. তিনটি ফল ও দুইটি সবজির বাণিজ্যিক পরিপক্বতার সূচক বর্ণনা কর।
৪. ম্যানুয়েল ও মেক্যানিক্যাল পদ্ধতিতে ফল ও সবজি সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধা কী কী?
৫. কম্বাইন হারভেস্টার কী? ক্ষেত থেকে শেড পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

অধ্যায়-৩

# ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে বিবেচ্য বিষয়

## ভূমিকা

ফল ও সবজি সংগ্রহ করার পর এগুলো সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, বাজারজাতকরণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের কথা আসে। প্রত্যেক চাষি বা উৎপাদনকারী এ ব্যাপারে একটি নিজস্ব পরিকল্পনা থাকতে হয়। উৎপাদিত এ সকল পণ্যের চাহিদা এবং তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ঐ চাষির পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়ক হয়। এ পর্যায়ে চাষি বা কৃষক বুঝতে সক্ষম হয় মৌসুমের কোন সময়ে বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে । তিনি এ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরি করেন যাতে পরবর্তী মৌসুমে সর্বোচ্চ চাহিদার সময়ে তার ফসল পরিপক্বতা লাভ করে এবং সে লাভবান হতে পারে।

## ৩.১ ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

ভৌত গুণাগুণ ও পুষ্টিমান বজায় রেখে তাজা অবস্থায় ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। দুনিয়া জুড়ে এ বিষয়ে জোরদার গবেষণা চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত পুরোপুরি সফলতা পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন উদ্যান ফসলের গঠন প্রকৃতি, রাসায়নিক গঠন ও জৈব-রাসায়নিক কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি যে, প্রতিটি ফসলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শীতপ্রধান দেশসমূহে বছরের অন্তত ৪/৫ মাস বরফে ঢাকা থাকে বলে ঐ সময় কোন চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না, তাই দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ প্রযুক্তি সেখানে অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে এই দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ ততটা প্রয়োজনীয় নয়। লক্ষণীয় যে, ফল ও সবজির সংরক্ষণ প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং এর ফলে ফসলের দাম সংরক্ষণের মেয়াদানুসারে বৃদ্ধি পায়। তদুপরি, যতই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হোক না কেন, সংরক্ষিত ফসলাদির মান ও পুষ্টিমূল্য কিছু না কিছু কমবেই। তাই সংরক্ষিত ফসল যখন বাজারে বিক্রয়ের জন্য নেয়া হয় তখন তা সদ্য সংগৃহীত তাজা ফল ও সবজির সাথে অসম প্রতিযোগিতায় হেরে যায় এবং অবিক্রীত থেকে যায় বা কম মূল্যে বিক্রয় হয়। তাই দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় ও বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে উৎপাদিত উদ্যান ফসলের জন্য স্বল্পকালীন সংরক্ষণ প্রযুক্তি নির্ণয় করাই যথেষ্ট। তবে কিছু কিছু মৌসুমি ফসল, যেমন- আলু টমেটো পেঁয়াজ, রসুন এগুলোর চাহিদা সারা বছরই সমান থাকে বলে এগুলোর দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ দরকার। তাজা ফল ও সবজির দীর্ঘ সংরক্ষণের যে প্রযুক্তিটি এখন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সেটি হচ্ছে হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজ। পৃথক একটি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানব। ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, ফল ও সবজি সংরক্ষণের মূল্যবিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, ঠাণ্ডা অবস্থায় এগুলো বেশি দিন ভালো থাকে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যত শুকনো হবে, তত তাড়াতাড়ি ফল ও সবজি থেকে পানি মোচন ঘটবে এবং ফসল ভেদে সঠিক পরিপক্বতায় যদি গাছ থেকে পাড়া হয়, তাহলে সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি হবে। মূলত এই তিনটি তথ্যের দিকে নজর রেখেই সংরক্ষণ প্রযুক্তি নির্ণয় করা হয়।

### সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মূলত তিনটি কারণের জন্য উদ্যান ফসল সংরক্ষণের প্রয়োজন আমাদের দেশে দেখা যায়। কারণগুলো হচ্ছে–

১. সাথে সাথে খরিদ্দার না পাওয়া গেলে এ সংরক্ষণোপযোগী নয় বলে এসব ফসল তোলার পর পরই বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু যদি ক্রেতা না পাওয়া যায়, তাহলে উৎপন্ন ফসল সংরক্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

২. অনেক সময় যানবাহনের সমস্যার কারণে দূরবর্তী বিক্রয় স্থানে ফসল নেয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ করে রাখতে হয় যাতে পরে কোনো এক সময় সেটা বিক্রয় করা যায়।

৩. উৎপাদন মৌসুমে ফসলের দাম এতই কমে যেতে পারে যে, চাষিদের জন্য বিক্রয় করা অনেক সময় অলাভজনক হয়। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণের মাধ্যমে বাড়তি ফসল ঘরে রেখে পরে বা দূরবর্তী স্থানে বিক্রয় করে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব।

### ৩.২ ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর কার্যাবলি

মাঠ থেকে ফল ও সবজি সংগ্রহ করার পরই পণ্যগুলো মাঠেই প্যাকিং শেডে একত্রীকরণ করা হয়। তারপর ২-১ দিন তা ঠাণ্ডা করা হয়। অতঃপর পরিষ্কার করতে হয়।

**একত্রীকরণ এবং পরিষ্কারকরণ :**

মাঠ থেকে সদ্য তোলা ফল বা সবজি প্যাকিং শেডে বা হাউজে এনে একত্র করা হয়। এখানে এগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।এজন্য এগুলোকে পানির ট্যাংকে নামানো হয় এবং ভালোভাবে ধুঁয়ে পরিষ্কার করা হয়। তারপর পানি থেকে তুলে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হয়। এ কাজগুলো হাতে বা যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়। অনেক সময় স্প্রে বা ঝরনার আকারে পানি দিয়ে ফল পরিষ্কার করা হয়।

চিত্র : যান্ত্রিক উপায়ে ফল পরিষ্কারকরণ

## সংরক্ষণের আগে করণীয় কাজ

### পরিষ্কারকরণ

গাছের অপ্রয়োজনীয় অংশ ফেলে দিয়ে ধুলোবালি দুর করার জন ফল ও সবজির গ্রহণোপযোগী অংশ পরিষ্কার পানিতে ধুঁয়ে নিতে হবে। মূল ও রূপান্তরিত কাণ্ড জাতীয় সবজি মাটির নিচে হয় বলে সংগ্রহের সময় এগুলোতে যথেষ্ট কাদামাটি লেগে থাকে, এগুলো সংরক্ষণের আগে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

### বাছাইকরণ

অপুষ্ট, আঘাতপ্রাপ্ত, পোকাক্রান্ত বা বেশি পরিপক্ব ফল সংরক্ষণ করা ঠিক নয়। কারণ এসবের মধ্যে জীবাণুর আক্রমণ বেশি হয় এবং পচন রোধে তাদের ক্ষমতাও থাকে অনেক কম। তাই রং, পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী ফল ও সবজি আলাদা ভাবে বাছাই করে নিলে এদের সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত বাছাইকৃত ফল ও সবজি নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখা অথবা নিকটস্থ বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে। কখনও কখনও নানারূপ ফলজাত দ্রব্য তৈরির কাজেও ঐ পরিত্যক্ত ফল বা Cull ব্যবহার করা যায়।

### ঠাণ্ডাকরণ

সংগ্রহের পর পরই এই কাজটা করা উচিত। এজন্য ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত স্থান যেখানে বাতাস চলাচল করে সেখানে কিছুক্ষণ রেখে দিলে ফসলের ফিল্ডহিট বা মাঠে থাকা কালে সঞ্চিত তাপ কমে যায় এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। এই ঠাণ্ডা করার আরো কয়েকটি উন্নত পদ্ধতি আছে, যেমন- ঠাণ্ডা ভেজা বাতাসের সাহায্যে, বরফ পানিতে ডুবিয়ে রেখে বা ছিটিয়ে অথবা আংশিক বায়ুশূন্য ঘরে রেখে। শেষ পদ্ধতিটি পাতাবহুল সবজির জন্য খুবই উপযোগী। এ পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়েই ছিটানো পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায়, ফলে সবজির তাপমাত্রা দ্রুত নেমে আসে।

ঠাণ্ডাকরণ কাজটিও ফসল কাটার সাথে সাথেই করতে হয়। গোল আলু, মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি মূল ও কাণ্ড জাতীয় সবজিতে এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিছুটা তাপমাত্রায় (২০° সেঃ. বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫%) বাতাস চলাচল করতে পারে, এমন জায়গায় দু/তিন দিন রেখে দিলে সংগ্রহের কালে আলুর আঘাত পাওয়া জায়গাগুলো সেরে ওঠে এবং সংরক্ষণকালে সেখানে জীবাণুর আক্রমণ বা পানি ক্ষয় হতে পারে না। মিষ্টি আলুর বেলায় তাপমাত্রা আরেকটু বেশি লাগে ২৮°-৩০° সেঃ। পেঁয়াজের বেলায় এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ সংগ্রহের সময় পেঁয়াজ কাণ্ড থেকে কেটে আলাদা করে ফেলা হয়। সাধারণত মাঠে রোদে ফেলে রাখলে ২/৩ দিনের মধ্যে পেঁয়াজের ক্ষত স্থান শুকিয়ে যায় এবং পচনের ভয় থাকে না। মাঠে এ কাজটি না করতে পারলে ৪০° সেঃ তাপমাত্রা সম্পন্ন ঘরে দুই দিন রাখলে 'কিউরিং' সম্পন্ন করা যায়।

চিত্র : আলুর স্তূপ বা কিউরিং

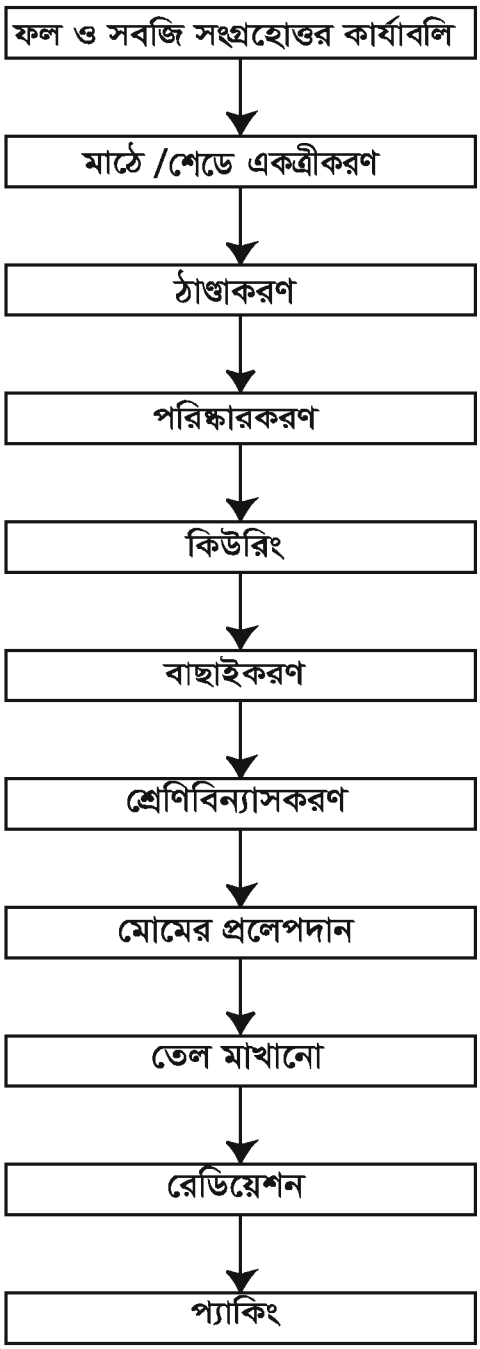


চিত্র : ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর কার্যাবলির ফ্লো চার্ট

## ৩.৩ বাছাইকরণ (সর্টিং) ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ (গ্রেডিং)

### বাছাইকরণ (Sorting)

এ কাজ হাতের সাহায্যে করতে হয়। পণ্যবহনকারী বেল্ট এবং স্থায়ীভাবে বসানো টেবিলের সাহায্য নিয়েও এ কাজটি করা যায়। এজন্য পণ্যসামগ্রীকে ভালোভাবে দেখে আকারে ছোট-বড়, অতিপাকা, অতিকাঁচা, অপুষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্তগুলোকে বাছাই করতে হয়। রোগক্রান্ত ফল বা সবজি অবশ্যই বাদ দিতে হয়। তা না হলে ভালো পণ্য রোগাক্রান্তগুলোর কারণে সমস্ত পণ্যের মূল্য কমে যায়। এসময় পণ্যের আকার ও রঙ চিহ্নিত করা হয়।

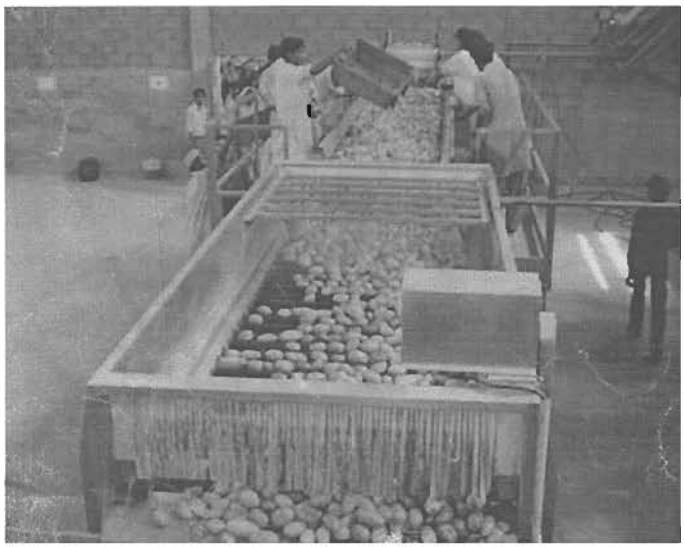

চিত্র : যান্ত্রিকভাবে বাছাইকরণ

### শ্রেণিবিন্যাস (Grading)

অপ্রয়োজনীয় বা অগ্রহণযোগ্য পণ্য বাদ দিয়ে শুধু বাজারজাত করার উপযোগী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণি বা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। যেমন : A, B, C গ্রেড ফল।

সঠিক আকার বা আকৃতি নির্ধারণ

পণ্যের আকার বা আকৃতি চোখে দেখে, আকার নির্ধারণী রিং বা চালুনির সাহায্যে সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যেও এ কাজ করা হয়ে থাকে। এটিও অনেকটা গ্রেডিং-এর কাজ।

### মোমের প্রলেপ দেয়া (Parafin Coating)

ফল ও সবজির গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি না করে যন্ত্রের সাহায্যে গায়ে খুব হালকা করে (ফুড গ্রেডের আওতায় পড়ে ততটা) মোমের প্রলেপ দেয়া হয়। মোমের পরিবর্তে কখনও কখনও প্যারাফিন লাগানো হয় (চিত্র) । এই মোম বা প্যারাফিন লাগানো খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার আগে ধুয়ে নিতে হয় তাহলে এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।

চিত্র : যন্ত্রের সাহায্যে ফলের গায়ে মোম বা প্যারাফিনের প্রলেপ দেওয়া

## তেল মাখানো (Oiling)

বেগুন, শসা, টমেটো প্রভৃতি সবজিতে তেল মাখালে সংরক্ষণের সময়ে পানি ক্ষয় অনেকটা কমানো যায়। আবার সবজির গায়ের ঔজ্জ্বল্যও বাড়ে, ফলে বাজারে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। সরিষার তেল, নারিকেল তেল বা সয়াবিন তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

## 'রেডিয়েশন ' (Radiation)

'রেডিয়েশন' পদ্ধতিতে আলু ও পেঁয়াজে গামা-রশ্মি প্রয়োগ করলে একটি দিকে যেমন রোগজীবাণুর আক্রমণ হয় না অন্যদিকে তেমনি সংরক্ষিত সবজির চারা গজানো বন্ধ করা যায়। তবে এ কাজটি করতে হয় অত্যন্ত সাবধানে, যাতে গামা-রশ্মি পরিমাণ কম বা বেশি না হয়। এ পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল।

## প্যাকেজিং (Packaging)

পলিথিন ফিল্মে ফল ও সবজি রাখা হলে স্বল্পকালীন সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। আম, কলা, টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন প্রভৃতির বেলায় এটা পরীক্ষিত হয়েছে। তবে কোন ফসলের বেলায় কী ধরনের পুরু শিট লাগবে , সেটা ঠিক করে নেয়া দরকার। এসব প্যাকেটের গায়ে যদি সামান্য পরিমাণ ছিদ্র রাখা হয়, তাহলে শ্বসনজনিত পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যেতে পারবে ও ভিতরে কোনো পানি জমবে না।

### ৩.৪ ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর জীবনকাল বৃদ্ধি

ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর পর্যয়ে শারীরতাত্ত্বিক বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এ পরিবর্তনগুলো যদি বন্ধ বা গভীরভাবে কমিয়ে দেয়া যায় তবে ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর জীবনকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১. গ্যাসজনিত ক্ষতি
২. ইথলিনজনিত ক্ষতি
৩. তাপজনিত ক্ষতি
৪. ঠাণ্ডাজনিত ক্ষতি

#### গ্যাসজনিত ক্ষতি

গুদামজাত অবস্থায় ফল ও সবজিতে অভ্যন্তরীণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। তাছাড়া যানবাহনে পরিবহনকালে পণ্যের মধ্যে আলো-বাতাস চলাচলের অভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। আবদ্ধ গুদাম বা প্যাকিং-এ ফল ও সবজির শ্বসনের ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) শতকরা ২% এর উপরে চলে গেলে পণ্যে ($CO_2$) জনিত ক্ষতি হয়। আবার একই কারণে অক্সিজেনের ($O_2$) মাত্রা কমে শতকরা ১% ভাগের নিচে নেমে গেলে প্রায় সব ফল ও সবজিতে কোনো না কোনো অভ্যন্তরীণ ক্ষতি হয়ে থাকে। ঠাণ্ডা বায়ুচলাজনিত হিমাগারে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা হলে জীবনকাল বৃদ্ধি ঘটে।

#### ইথাইলিনজনিত ক্ষতি

সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ফল ও সবজিতে ইথিলিন গ্যাস ($C_2H_4$) তৈরি মাত্রা বেড়ে যায়। এক পিপিএম. (দশ লক্ষ ভাগের একভাগ অথবা ১ মি. গ্রা./কেজি) বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার ইথিলিন ফল ছাড়া সব উদ্যানজাত পণ্যের জন্য ক্ষতিকর। ইথিলিন দ্বার ক্ষতিগ্রস্ত হলে পণ্যের সবুজ কণা কমে গিয়ে পণ্যের চাহিদা কমায়।

#### তাপজনিত ক্ষতি (Hot Injury)

সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ফল ও সবজির ক্ষতি করতে তাপ সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। প্রতি ১০°c তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে শ্বসনের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে এসব পণ্য বিনষ্ট হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পণ্যের ভেতরে ক্ষতিকর জীবাণু বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং পণ্যগুলো দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য (Cold Storge) ফল ও সবজি রাখা হলে এ সমস্যা মেটে।

#### ঠাণ্ডাজনিত ক্ষতি (Cold Injury)

হিমায়িতকরণ, ঠাণ্ডাকরণ অথবা অতিরিক্ত তাপ ফল ও সবজির পুষ্টিমানের ক্ষতি ঘটায়। গুদামের পরিবেশে ও অন্যান্য প্রতিকূল পরিবেশেও পণ্যের অভ্যন্তরীণ রাসায়ানিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন আনে। ফল ও সবজি হিমায়িতকরণে নিচের তাপমাত্রায় রাখলে এগুলোর কোষ বা কলা ধ্বংস হতে পারে এবং এসব পণ্যের বিভিন্ন মাত্রার ক্ষতি হতে পারে। আম, কলা, পেঁপে, টমেটো প্রভৃতি নিরক্ষীয় ফল ও সবজি হিমায়িতকরণের অথবা ৭-১৫°c ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে রাখা হলে এসব ফল ও সবজি ঠাণ্ডাজনিত ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ কম তাপমাত্রায় এসব ফল ও সবজিতে দ্রুত ক্ষতের বা Chiling injury সৃষ্টি হয়। ফল ও সবজির গায়ে বিভিন্নভাবে ক্ষতি প্রকাশ পেতে পারে। যেমন-

১. ফলের গায়ে ছোট ছোট গর্ত হয়ে যাওয়া।

২. বাহিরে এবং ভিতরে স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যাওয়া।
৩. মাঝে মাঝে ভেজা ভেজা অথবা ঝলসানো দাগের সৃষ্টি হওয়া।
৪. ফল ও সবজির সুবাস ও গন্ধ নষ্ট হওয়া।
৫. ফল ও সবজি পরবর্তীতে না পাকা।
৬. অবশেষে ফল ও সবজি নষ্ট হওয়া।

আমাদের দেশে এখনও ফল ও সবজি হিমাগারে রাখা এবং হিমায়িত যানবাহনে রেফ্রিজারেটড ট্রাকে আনা নেওয়া করা হয় না বললেই চলে। তাই ঠাণ্ডাজনিত ক্ষত এখনও এদেশের জন্য বড় সমস্য হিসেবে দেখা দেয়নি।

## সাধারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ

ঠান্ডা বাতাসের সাহায্যে শীতলীকরণ সাধারণত ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা হয়। ঠাণ্ডা বাতাস দুভাবে পাওয়া যেতে পারে- প্রাকৃতিক উপায়ে ও ভৌত উপায়ে ঠাণ্ডা করণের মাধ্যমে ।

ঠান্ডা বাতাসের উৎস অনুযায়ী সাধারণ সংরক্ষণ পদ্ধতি দুই প্রকারের হতে পারে।

### (ক) বাতাস চলাচল যুক্ত পদ্ধতি

রাত্রিকালীন ঠাণ্ডা বাতাস চলাচল ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ছায়াযুক্ত ঘর স্বল্পকালীন সংরক্ষণের জন্য বেছে নিতে হয়। দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ সরাসরি এ ঘরের উপরে যেন না পড়ে। এমন ভাবে ঘরের জানালা-দরজা লাগাতে হবে, যেন প্রবাহিত বাতাস সরাসরি ঘরে প্রবেশ করতে পারে। ঘরের দেয়াল এমন জিনিস দিয়ে তৈরি করতে হবে, যেন রোদের তাপ ঘরে না আসে। এজন্য খড়, বাঁশের বেড়া, কাদামাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে ধাতু সহজেই তাপ চলাচলে সাহায্য করে, সেজন্য টিনের বেড়া দেয়া ঠিক হবে না। আম, পেঁপে, কলা, পেয়ারা, আলু, পেঁয়াজ, মিষ্টি আলু, গাজর, বাঁধাকপি, কুমড়া প্রভৃতি এ ধরনের ঘরে সংরক্ষণ করে ভালো ফল আশা করা যায়। তবে এমন ভাবে ফসল রাখতে হবে যেন বাতাস চলাচলে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। সে জন্য এলোপাতাড়ি না রেখে যদি কোন পাত্রে রেখে র‍্যাকে সাজানো হয়, তাহলে এগুলো ভালো অবস্থায় থাকে। পাশে বাতাস চলাচলযুক্ত সংরক্ষণাগারের একটি চিত্র দেওয়া হলো। চিত্রে তীর চিহ্নের সাহায্যে বাতাসের চলাচল পথ দেখানো হয়েছে।

### (খ) হিমায়িত পদ্ধতি

অপেক্ষাকৃত বেশি সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে ফল ও সবজি ঠাণ্ডা ঘরে রাখতে হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে হিমায়িত সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

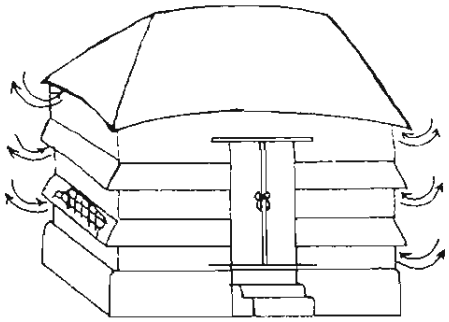

চিত্র : বাতাস চলাচলযুক্ত কক্ষ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কেন একজন চাষির উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি?
২. সারা বছর চাহিদা সমান থাকে এমন ফসলগুলো কী কী?
৩. কোন তিনটি তথ্যের উপর নির্ভর করে সংরক্ষণ প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে?
৪. কোন তিনটি কারণে উদ্যান ফসল সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়?
৫. কোন সবজিগুলো বেশি ধুয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন?
৬. কোন ফল ও সবজিগুলো বাছাই করা বেশি প্রয়োজন?
৭. কী কী ভাবে ফল ও সবজি ঠাণ্ডা করা হয়?
৮. পাতাবহুল সবজিকে কীভাবে ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করা হয়?
৯. কত তাপে ও কত আর্দ্রতায় পেঁয়াজ , আলু ও রসুন কিউরিং করতে হয়?
১০. পেঁয়াজের কিউরিং মাঠে করা না গেলে কোথায় করা উচিত?
১১. কী কী পদ্ধতিতে পণ্য শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিং করা হয়?
১২. ফল ও সবজিতে কীভাবে মোম লাগনো হয়?
১৩. কোন কোন সবজিতে কী কী তেল মাখানো যায়?
১৪. আলু ও পেঁয়াজে রেডিয়েশন করলে কি উপকার হয়?
১৫. কী কী ফল ও সবজি পলিব্যাগে রাখলে সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে?
১৬. $CO_2$ ও $O_2$ কীভাবে পণ্যকে ক্ষতি করে?
১৭. $C_2H_4$ (ইথিলিন) গ্যাস দ্বারা পণ্য কীভাবে ক্ষতি হয়?
১৮. ফল ও সবজির শ্বসনের মাত্রা কখন দ্বিগুণ হয়?
১৯. ফল ও সবজি কত তাপমাত্রায় রাখলে Chilling injury হয়?
২০. কোন কোন ফল ও সবজি বাতাস চলাচল যুক্ত কাঠ বা খড়ের ঘরে ভালো থাকে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব লেখ।
২. উদ্যান ফসলের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৩. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর একত্রীকরণ, পরিষ্কারকরণ ও বাছাইকরণ বর্ণনা কর।
৪. পণ্যের শীতলীকরণ বা ঠাণ্ডাকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৫. শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও মোমলাগানো কাজ বর্ণনা কর।
৬. রেডিয়েশন ও তেল মাখানো পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৭. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তরকালে গ্যাস ও ইথিলিন দ্বারা ক্ষতিজনিত কাজ বর্ণনা কর।
৮. তাপজনিত ও ঠাণ্ডাজনিত ক্ষতি বর্ণনা কর?
৯. ফল ও সবজি সংরক্ষণে বাতাস চলাচল ঘরের বর্ণনা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর পরিকল্পনা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর?
২. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর ধাপগুলো বর্ণনা কর।
৩. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর বিভিন্ন ক্ষতিগুলোর বর্ণনা কর।
৪. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর কার্যাবলির Flow Chart লেখ এবং সাধারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বর্ণনা কর।

## অধ্যায়-৪

# ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর অপচয়

### ভূমিকা

খাদ্য ও পুষ্টির জন্য আমরা যে খাবারগুলো খেয়ে থাকি তার মধ্যে ৬টি উপাদান থাকে। যথা- আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, ভিটামিন খনিজ পদার্থ ও পানি। ফল ও সবজি হতে খাদ্যের ৬টি উপাদানই পাওয়া যায় তবে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এজন্য ফল ও সবজি কে মানুষের রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য বলে। তবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, উৎপাদিত ফল ও সবজির যথোপযুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ না হওয়ার কারণে এক বিরাট অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ফল ও সবজি কর্তনের পর মাঠে একত্রীকরণ, ঠাণ্ডাকরন, পরিষ্কারকরণ, বাছাইকরণ, কিউরিং, গ্রেডিং, মোমলাগানো, রেডিয়েশন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরন এবং প্রক্রিয়াজতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পণ্য অপচয় হতে থাকে। নিম্নে এর কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো :

১. যথাসময়ে ফল ও সবজি সংগ্রহ না করা।
২. ফল কম বা বেশি পরিপক্ব হওয়া।
৩. সংগ্রহ সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
৪. মেঘলা আকাশ।
৫. পরিবহন ব্যবস্থার ত্রুটি।
৬. পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ।
৭. উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব।
৮. উপযুক্ত আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করা।
৯. পরিবেশগত প্রতিকূল অবস্থা।
১০. যথাযথ নিয়মে সংরক্ষণ না করা।

### ৪.১ সংগ্রহোত্তর অপচয়ের গুরুত্ব

সংজ্ঞা

ফল ও সবজির একটি বড় অংশ সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হওয়া পরিমাণ ২০%-৩০%। গাছ হতে ফল ও সবজি সংগ্রহের পর পরিমাণগত, রং এবং পুষ্টিমানের দিক থেকে ফল ও সবজিতে যে অপচয় বা ক্ষতি হয় তাকে ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর অপচয় বলে।

### অপচয়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও পরিমিতকরণ

ফল ও সবজি গঠনের দিক দিয়ে অত্যন্ত নরম ও সংবেদনশীল হওয়ায় সংগ্রহোত্তর কাজকর্ম এবং বাজারজাতকরণের বিভিন্ন স্তরে প্রায়ই আঘাতপ্রাপ্ত হয় এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে জীবাণুর আক্রমণে পচনক্রিয়া শুরু হয়। এ ছাড়া পরিপক্বতার তারতম্যের কারণে সংগৃহীত ফল ও সবজির কিছু অংশ বাজারজাত-কালীন সময়েই পেকে নরম হয়ে যায়। ওঠানো, নামানো বা অনুরূপ কাজের সময় এসব পণ্য থেঁতলে বা ফেটে গিয়ে বিক্রয়ের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া পণ্যের গুণগত মানের দিক থেকেও বিপুল অবনতি ঘটে।

আমাদের দেশে তাজা অবস্থায় ফল ও সবজি সংরক্ষণের উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে প্রায় ৪৩৫টি হিমাগার আছে যেখানে মৌসুমের আলু ও অন্যান্য কিছু সবজি সংরক্ষণ করা যায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উৎপাদিত ফল ও সবজি পর্যায়ক্রমিকভাবে বেশ কিছু মধ্যমর্তী স্তরের ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পৌছে। এসব স্তরে প্রত্যেকটি পণ্য ওঠানো, নামানো, প্যাকেট খোলা, নমুনা প্রদর্শন, আবার নতুন করে প্যাকিং করা ও ওজন করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজকর্ম করা হয়। এসব কাজ অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে করা না হলে বিতরণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ফল ও সবজির একটি বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পচে নষ্ট হয়।

সংগ্রহোত্তর অপচয়ের ৩০ শতাংশ জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বর্তমান অবকাঠামোগত অবস্থায় যদি কিছু কিছু পরিবর্তন আনা যায় এবং উন্নত প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করা যায় তাহলে এ অপচয় অনেকটাই কমানো সম্ভব।

## ৪.২ সংগ্রহোত্তর অপচয়ের কারণ

ফল ও সবজি পাকার পর হতে গাছ থেকে পাড়ার পরম তা ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌছে রান্না হয়ে আমাদের খাবারের টেবিলে পৌছার আগ পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সঙ্গত কারণেই প্রতিটি ধাপেই অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে এবং পশু, পাখি ও জীবাণুর কারণে ফল ও সবজির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ফল ও সবজি দুটোই কিন্তু জীবন্ত বস্তু, তাই এদের জৈব বিপাক ক্রিয়া ফল ও সবজির অভ্যন্তরে চলতে থাকে এবং পেকে পেকে রসালো হতে থাকে।

তাই ফল ও সবজি বিভিন্ন ধাপে বা পর্যায়ে নষ্ট হতে থাকে তার কারণ সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক) প্রত্যক্ষ কারণ ও

খ) পরোক্ষ কারণ

প্রত্যক্ষ কারণ : ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তরকালে যে সকল প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতি হয় তা হলো–

(১) ক্ষতিকর প্রাণী ও পাখি

(২) ক্ষতিকর জীবাণু

(৩) আঘাত ও ক্ষত

(৪) জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া

### ক্ষতিকর প্রাণী

ক্ষতিকর পোকামাকড় বা অন্য কোনো প্রাণী যেমন– বাদুড়, কাঠবিড়ালি, পাখি, ইঁদুর, গরু, ছাগল ইত্যাদি ফল ও সবজি খেয়ে বা দংশন করে সরাসরি ক্ষতি করে থাকে। এতে ফল ও সবজি পরিমাণের দিক থেকে কমে যায় কারণ প্রাণীর খাওয়া ফল ঠিকমতো বৃদ্ধি পায় না। ফলে বাজারমূল্য কমে আর্থিক ক্ষতি হয়। এসব প্রাণীর পরিত্যক্ত মলমূত্র ও লোম দ্বারা পণ্যের গুণগত মানের অবনতি ঘটে থাকে। পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত ফল বা সবজি যে শুধু ওজনের দিক থেকে কমে যায় তা নয়, বিষাক্তও হতে পারে।

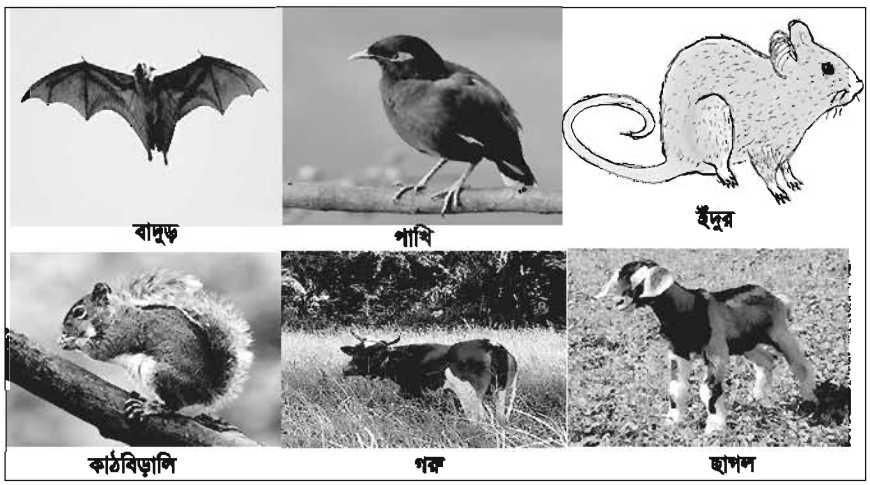


চিত্র : বাদুড়, পাখি, ইঁদুর, গরু, ছাগল, কাঠবিড়ালি ফল ও সবজির ক্ষতি করছে

## ক্ষতিকর জীবাণু

ফল সংগ্রহ, পরিবহন ও বিতরণের যে কোনো পর্যায়ে যদি ফলে আঘাত লাগে তাহলে উক্ত স্থানের কোষ ও কোষকলার ক্ষতি হয়। অত:পর উক্ত ক্ষতস্থান দিয়ে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা ঈস্ট ও ভাইরাস জীবাণুর আক্রমণ ঘটে, ফলে ফল ও সবজির পচনক্রিয়া শুরু হয়। বেশি পরিপক্ব অবস্থায় সংগ্রহ করা হলে অল্প দিনের মধ্যে ফল ও সবজি পেকে যায় এবং জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে এসব পণ্য প্রতি সহজেই ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়।

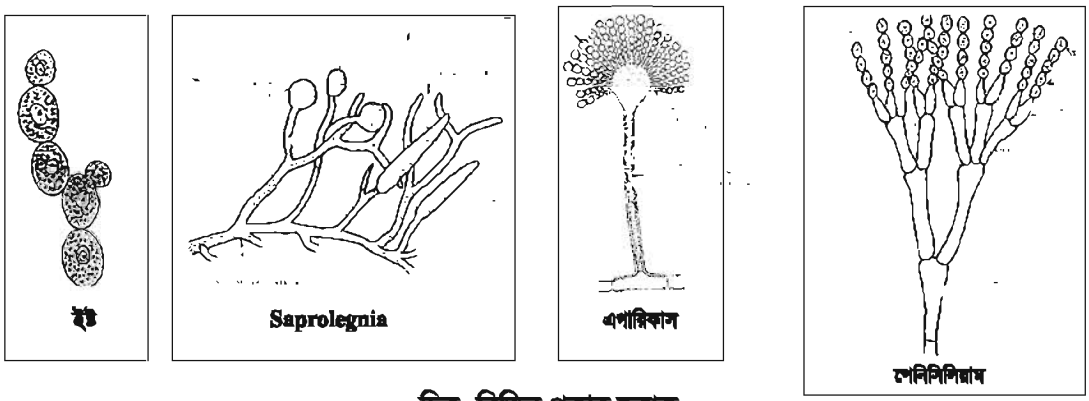


চিত্র: বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক

অ্যাসপারজিলাস ও পেনিসিলিয়াম নামক ছত্রাক দুইটি কাল মোল্ড ও সবুজ মোল্ড নামে পরিচিত। এরা ফল ও সবজির ক্ষতি করে। ঈস্ট (yeast) ফলের পচন (fermentation) ধরায়। ব্যাক্টেরিয়া সবজি নষ্ট করে। বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে ল্যাকটিক এসিড ব্যাক্টেরিয়া ও ব্যাসিলাস বোটুলিনম (bacillus botulinum) প্রধান। শেষোক্ত ব্যাকটেরিয়া বিষ সৃষ্টি করে।

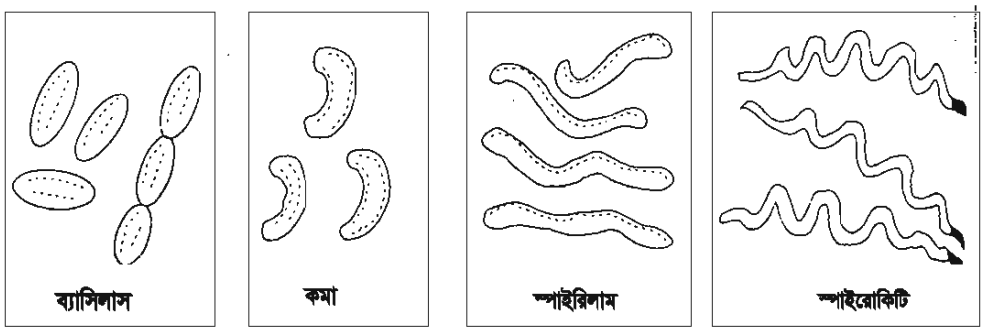


চিত্রঃ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া

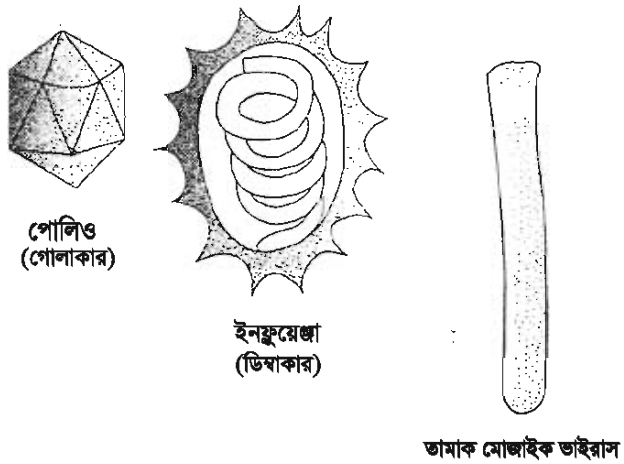


চিত্র : বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস

## আঘাত ও ক্ষত

ফসল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত হলে ফল ও সবজি সহজেই ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া আঘাতের ফলে ফসলের ত্বকের কোষ ও কোষকলার গঠন কাঠামো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরিত গতিতে হতে থাকে। যেমন- আলু বা বেগুনে আঘাতপ্রাপ্ত হলে একদিকে যেমন- শ্বসন ও প্রস্বেদনের গতি বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি ইথিলিন গ্যাস তৈরি প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়। এতে পরিবহন ও বিতরণ পর্যায়েই পণ্যের ক্ষতি হয়ে পণ্য নষ্ট হয়।

## জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া

ফল ও সবজি গাছ থেকে কাটার পরও জীবিত থাকে এবং ঐ সব পণ্যে শ্বসন, প্রস্বেদন ও ইথিলিন উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ সকল প্রক্রিয়া বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা ঘটে থাকে। ফলে পণ্যের ওজন হ্রাস পায় এবং জীবাণু প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সর্বোপরি বিক্রিয়াজনিত তাপ উৎপাদনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ আরও ত্বরান্বিত করে এবং গুণ ও মানের দ্রুত অবনতি ঘটায়।

### পরোক্ষ কারণ

ফল ও সবজি নষ্ট হওয়ার জন্য যে সমস্ত কারণ প্রত্যক্ষ কারণগুলোকে প্রভাবিত করে সেগুলোকে পরোক্ষ কারণ বলে। পরোক্ষ কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. ফল ও সবজির সংগ্রহ, বাছাই, শ্রেণিবিন্যাস, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব।

২. পরিবহন, সংরক্ষণ ও ধারণের জন্য প্রযুক্তিগত দিক থেকে যথাযথ কনটেইনার বা আঁধারের অভাব।

৩. সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

৪. দ্রুত পরিবহনের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন– সড়ক পরিবহন, রেল পরিবহণ, নদী পরিবহনের অপ্রতুলতা।

৫. হিমায়িত যানবাহনের অভাব।

৬. বাছাই, গ্রেডিং বা শ্রেণিবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা।

৭. ফল ও সবজির প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব।

৮. নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবোধের অভাব।

## ৪.৩ সংগ্রহোত্তর অপচয়ের প্রকারভেদ

সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ফল ও সবজির যেসব অপচয় ঘটে সেগুলোকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

### পরিমাণগত অপচয়

গাছ থেকে ফল ও সবজি বিচ্ছিন্ন হবার পর তার বিপাক ক্রিয়া চলতে থাকে। এসময়ে তার সঞ্চিত খাদ্য উপাদান জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ার ভেঙ্গে ($CO_2$) ও পানি উৎপন্ন হয়। এ উপাদান দুটি ফল ও সবজির ত্বক ভেদ করে বাহিরে বাতাসের সাথে মিশে যায়। আবার বিচ্ছিন্ন ফল ও সবজিতে প্রস্বেদন প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফল ও সবজির সঞ্চিত পানির অংশটি বায়বীয় আকারে বাতাসে চলে যায়। ফল ও সবজি গাছ থেকে পাড়ার পর তাদের অপচয়িত খাদ্য উপাদান শিকড়ের দ্বারা আর পূরণ করা সম্ভব হয় না। ফলে ফল ও সবজি ওজন হারায় ও মোট পরিমাণ প্রতিদিন আনুপাতিক হারে কমতে থাকে।

### গুণগত অপচয়

ফল ও সবজি শুধু যে পরিমাণের দিক থেকেই কমে যায় তা নয়, গুণ ও মানের দিক থেকে ও বিপুল অপচয় ঘটে। মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর হতেই ফল ও সবজির তাজাভাব (Freshness) তার স্বাদ, গন্ধ, বর্ণের অবনতি ঘটে। যেগুলো ক্লাইমেকটরিল ফল যেমন– আম, কলা, পেঁপে, কাঁঠাল, পেঁয়ারা, জাম, আনারস, আতা, শরিফা, সফেদা ইত্যাদি। সেগুলোর গুণগত মান দ্রুত কমতে থাকে

কিন্তু যেগুলো নন-ক্লাইমেকটরিক ফল যেমন– নারিকেল, বেল, লেবু, জাম্বুরা, ডালিম, আদা, জামির, বাদাম, আমলকী, কাজুবাদাম, আমড়া, তরমুজ ইত্যাদি কিছুদিন রাখা যায়। এছাড়াও ফল ও সবজির পুষ্টি উপাদান কমে এবং পচনক্রিয়ার ফলে বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া তাজা ফল ও সবজির কমনীয়তা নষ্ট হয় এবং ক্রেতার কাছে আকর্ষণ হারায় এবং বাজারমূল্য অনেক কমে যায়।

## ৪.৪ অপচয় প্রতিকার বা সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ প্রযুক্তি

ফল ও সবজির একটি বড় অংশ সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে বর্তমানে যে সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি প্রচলিত আছে তাতে কিছু পরিবর্তন আনা সম্ভব। আর যদি পরিবর্তন করে উন্নত প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করা যায় তাহলে ফল ও সবজির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি মূল বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ–

(১) সংগ্রহের জন্য ফল ও সবজির সঠিক পরিপক্বতা নির্ধারিত।
(২) সঠিক পদ্ধতিতে ফল ও সবজি তোলা, বাছাই ও শীতলকরণ
(৩) সঠিক পদ্ধতিতে প্যাকেটজাতকরণ
(৪) সঠিক পদ্ধতিতে পরিবহন
(৫) বিক্রয়ের জন্য যত্ন সহকারে নমুনা প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণ।

### সংগ্রহের জন্য ফল ও সবজির সঠিক পরিপক্বতা নির্ধারণ

সংগ্রহের পর ফল ও সবজির স্থায়িত্ব অনেকটা নির্ভর করে এর পরিপক্বতার ওপর। সাধারণত পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও পরিপক্বতার প্রাথমিক অবস্থায় ফসল ঘরে তোলা হয়। তবে ঠিক কোন অবস্থায় পাড়তে হবে সেটি নির্ভর করে ফলের প্রকৃতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। পুরোপুরি পাকা ফল দীর্ঘ পরিবহনের জন্য উপযোগী নয়। তাই দূরবর্তী বাজারে পৌঁছানোর জন্য যতটুকু সময় লাগতে পারে সেটি বিবেচনায় রেখে ফল পাড়ার পরিপক্বতা নির্ধারণ করা উচিত। দূরবর্তী বাজারে জন্য পরিপক্ব কিন্তু শক্ত অবস্থায় এবং নিকটবর্তী বাজারের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পরিপক্ব অবস্থায় ফল ও সবজি পাড়তে হয়।

### সঠিক পদ্ধতিতে ফল ও সবজি তোলা, বাছাই ও শীতলীকরণ

ফলের প্রকৃতি ও বাজারে দূরত্ব অনুসারে সঠিক পরিপক্বতা নির্ধারণের পর অত্যন্ত যত্নের সাথে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হয় সংগৃহীত ফল ও মাতৃগাছ যেন কোনো রকম আঘাত না পায়। ফল ও সবজি সংগ্রহের কাজটি সকালে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় করতে হয়। তবে ভোরের শিশির ভেজা থাকলে সূর্য ওঠার পর শিশির শুকিয়ে গেলে সংগ্রহের কাজ শুরু করতে হয়।

সংগৃহীত সব ফল একই লটে বা বস্তায় বাজারজাত না করে আকার, আকৃতি, রং ও পরিপক্বতা ইত্যাদি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করে বাজারজাত করতে হয়।

এতে চাষি যেমন উপযুক্ত মূল্য পায়, তেমনি সংগ্রহোত্তর অপচয় ও কম হয়। যেমন- একই বস্তায় বা প্যাকেটে বেশি পাকা ফল ও কম পাকা ফল এক সাথে রাখা হলে বেশি পাকা ফল হতে নির্গত ইথিলিন অতি অল্প সময়ে দ্রুততার সাথে কম পাকা ফলগুলোকে পাকিয়ে ফেলে। এর ফলে পুরো লটের ফলই স্বল্প সময়ে পেকে নরম হয়ে যায়। শ্রেণিবিন্যাসকরণ বা গ্রেডিং করার সাথে সাথে সংগ্রহকৃত ফল হতে অপুষ্ট, রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, বিকৃত আকার সম্পন্ন ফলগুলোকে বাছাই বা সর্টিং করে আলাদা করতে হয়।

সংগ্রহীত ফল ও সবজি সাথে সাথে প্যাকেটজাত না করে ঠাণ্ডা করে নিয়ে তারপর প্যাকেজিং করা হলে সংগ্রহোত্তর অপচয় অনেকটা কমে যায়। ঠাণ্ডা বাতাসের সাহায্যে পানিতে ডুবিয়ে, বায়ুশূন্য ঘরে রেখে পানি ছিটিয়ে পণ্যসামগ্রীকে শীতল করা যায়। একে শীতলীকরণ প্রক্রিয়া বলে।

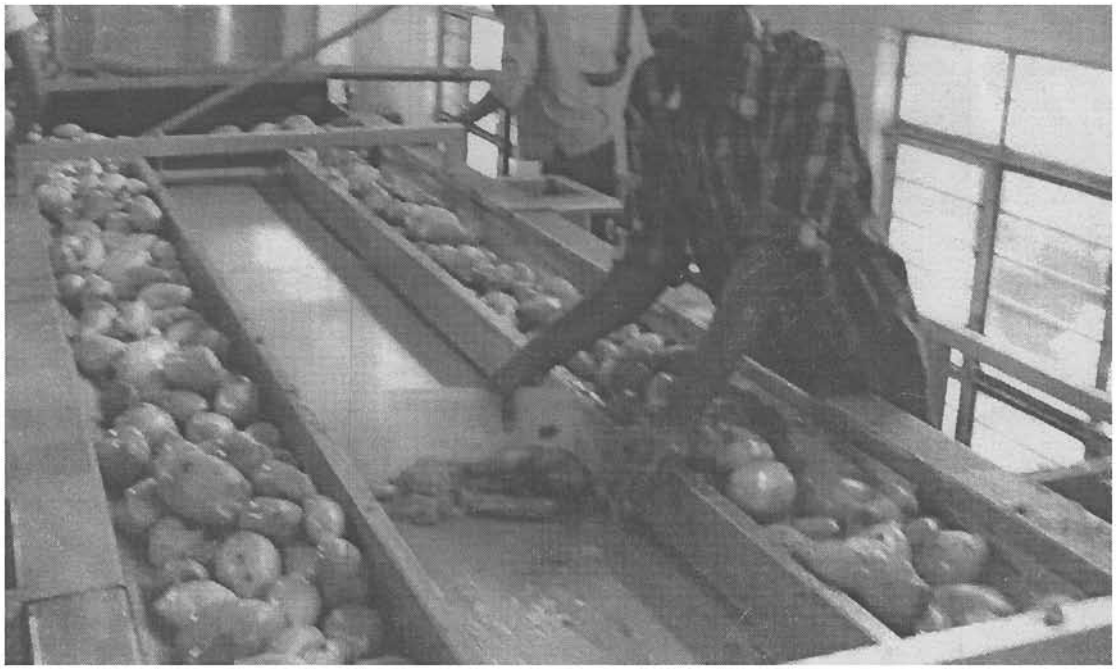

চিত্র : যান্ত্রিকভাবে বাছাইকরণ

## সঠিক পদ্ধতিতে প্যাকেটজাতকরণ

ফল ও সবজি শীতল বা ঠাণ্ডা করে তারপর প্যাকেজিং এর মাধ্যমে প্যাকেটজাত করতে হয়। প্যাকেজিং দ্রব্যাদি ও প্যাকেটের আকার আকৃতি এমন হওয়া উচিত যাতে পরিবহনকালে পণ্যসামগ্রী সব রকম আঘাত ও ঝাঁকি হতে রক্ষা পায়। এ ছাড়া শ্রমিকের পক্ষে প্যাকেট ওঠানো ও নামানো সহজতর হয়। প্যাকেটের আকৃতি যানবাহনে সঠিকভাবে তাকে তাকে সাজিয়ে রাখার উপযোগী হওয়া দরকার। প্যাকেটবদ্ধ ফল বা সবজিতে যেন ঠিকমতো বাতাস চলাচল করতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। তা না হলে গাদাগাদি করে রাখা পণ্যের শ্বসনজনিত তাপ ও ($CO_2$) গ্যাসের গরম বাহিরে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে পণ্যগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। প্যকেটের ওজন ২০-২৫ কেজির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ভালো। এতে একজন শ্রমিকের পক্ষে প্যাকেট ওঠানো নামানো সহজতর হয়।

প্যাকেটে পণ্য খুব চেপে সাজাতে হয় না। আবার ফাঁকা ফাঁকা করেও সাজাতে হয় না। কেননা বেশি চেপে সাজালে ফলের ত্বক থেঁতলে যেতে পারে এবং ফাঁকা ফাঁকা করেও সাজালেও পরিবহনের সময় নাড়াচড়ার ফলে পণ্য আঘাত লাগতে পারে।

## সঠিক পদ্ধতিতে পরিবহন

পরিবহনে জন্য সবচেয়ে কম দূরত্বের কিন্তু ভালো রাস্তা বেছে নিতে হয়। যে যানে পরিবহন করা হয় তাতে যেন প্রশস্ত জায়গা থাকে, তা খেয়াল রাখতে হয়। দিনের প্রখর সূর্যলোকের তাপে পরিবহন না করে রাতে পরিবহন করা ভালো। একনাগাড়ে গন্তব্য পৌঁছানো সম্ভব না হলে ছায়াযুক্ত স্থানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে উপরের ত্রিপল খুলে দিতে হয়। এতে প্যাকেটের মধ্যে সৃষ্ট তাপ বের হয়ে যায়।

গাড়িতে পণ্যের প্যাকেট সাজানোর পর বাতাস চলাচল করার উপযোগী একটি সাদা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তবে ত্রিপলটি যেন সরাসরি প্যাকেটের গায়ে না লাগে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্যাকেট সাজানোর পর সেগুলো যানবাহনের সাথে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয় যাতে চলার সময় নড়াচড়া করতে না পারে। প্যাকেটের বা বস্তার উচ্চতা এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে নিচের বস্তার পণ্য উপরের বস্তার চাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। নৌপরিবহনের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ব্যবহার করা ভালো, তবে ইঞ্জিনের নিকট থেকে পণ্য দূরে স্তূপাকারে। বস্তা বিছিয়ে দিতে হয়। স্তূপীকৃত ফসলের উপর অন্য কোন কিছু রাখা ঠিক নয়। আমাদের দেশের গাড়ী চালকের দূর যাত্রায় ফসলের স্তুপের উপর অনেক সময় যাত্রী পারাপর করেন যা পণ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিবহনকৃত ফল ও সবজি বাজারে পৌছানো মাত্র প্যাকেট খুলে খোলা বাতাসে রাখতে হয়। তারপর বাছাইয়ের কাজ সেরে যতটা সম্ভব কম উচ্চতার স্তরে রেখে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়।

## যত্নসহকারে নমুনা প্রদর্শন এবং বাজারজাতকরণ

ক্রয়-বিক্রয়কালে বিভিন্ন ক্রেতাকে যত্নসহকারে প্যাকেট বা বস্তা খুলে পণ্য দেখিয়ে আবার যথাযথভাবে রাখতে হবে। বিক্রয় শেষে ক্রেতাকে তার পণ্য ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে আন্তরিকতা ও সততা থাকতে হবে।

## অনুশীলনী - ৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর অপচয়ের প্রধান দুটি কারন কী কী?
২. সংগ্রহোত্তর অপচয় মোট অংশের কত ভাগ?
৩. বাংলাদেশের মোট কতটি হিমাগার রয়েছে?
৪. বাংলাদেশে ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর অপচয় কত শতাংশ?
৫. ফল ও সবজির অপচয়ের প্রত্যক্ষ কারণ কয়টি ও কী কী?
৬. কোন কোন পাখি পাকা ফল ও সবজির ক্ষতি করে থাকে?
৭. কোন কোন প্রাণী পাকা ফল ও সবজির ক্ষতি করে থাকে?
৮. কোন কোন ছত্রাক ফল ও সবজির পচনক্রিয়া ঘটায়?
৯. আলু ও বেগুনে আঘাতপ্রাপ্ত হলে কী হয়?
১০. শীতলীকরণ প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
১১. ফল ও সবজির প্যাকেট কত কেজির হলে ভালো হয়?
১২. পরিবহনে পণ্যের প্যাকেট কীভাবে সাজাতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি কর্তনের পর শেডে আনতে যে অপচয় হয় তার কারণগুলো কী?
২. ফল ও সবজির সংগ্রহোত্তর অপচয় কাকে বলে? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. সংগ্রহোত্তর অপচয়য়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলো কী কী?
৪. ক্ষতিকর প্রাণী ও পাখি কীভাবে অপচয় ঘটিয়ে থাকে?
৫. ক্ষতিকর জীবাণু কীভাবে সংগ্রহোত্তর অপচয় করে?
৬. আঘাতে ও ক্ষতে সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া কীভাবে ফসলের ক্ষতি করে?
৭. সংগ্রহোত্তর অপচয়ের গুণগত ও পরিমাণ বলতে কী বোঝায়?
৮. সংগ্রহোত্তর অপচয়রোধ প্রযুক্তি গুলো কী কী?
৯. সঠিক পদ্ধতিতে ফল ও সবজি তোলা, বাছাই ও শীতলীকরণ বর্ণনা কর।
১০. সঠিক পদ্ধতিতে প্যাকেটজাতকরণ বর্ণনা কর।
১১. সঠিক পদ্ধতিতে পরিবহন বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি ও সংগ্রহোত্তর অপচয়ের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও পরিমিতিকরণ বর্ণনা কর।
২. ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর অপচয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ বর্ণনা কর।
৩. সংগ্রহোত্তর অপচয়ের প্রকারভেদ ও অপচয়রোধ প্রযুক্তি বর্ণনা কর।

# অধ্যায়-৫
# ফল ও সবজি প্যাকেজিং

## ভূমিকা

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যে কোনো প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যই হোক না কেন তাকে মোড়কে না ভরে বাজারজাত করার প্রশ্নই আসে না। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে মোড়কীকরণ ধাপটি আসে সবার শেষে। খাদ্য সঠিকভাবে মোড়কীকরণের পরই বিক্রয়ের জন্য তৈরি হয়। ত্রুটিপূর্ণ মোড়কীকরণে অনেক ভালো মানের খাদ্যসামগ্রীও নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই খাদ্য উপযুক্তভাবে মোড়কীকরণের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ফল ও সবজি দ্রুত পচনশীল। তাই এই সকল পণ্যের মান বজায় রেখে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ ও বাজারজাতকরণে প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। ফল ও সবজি দুইভাবে মোড়কীকরণ করা হয়। তা হলো সংগ্রহের পর বস্তা বা ঝুড়িতে ভরে বড় বাজারে প্রেরণ করা হয়। অথবা ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি খাদ্য প্যাকেট করে বাজারজাত করা হয়। পণ্য সঠিকভাবে মোড়কীকরণের পরই বিক্রয়ের জন্য তৈরি হয়। ত্রুটিপূর্ণ মোড়কীকরণের কারণে অনেক ভালো মানের পণ্যও নষ্ট হয়ে যায়। সঠিকভাবে মোড়কীকৃত বিশেষ করে টিনজাতকৃত খাদ্যের জীবনকাল কয়েক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে। মোড়কীকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এত বেশি যে কোন কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর জন্য পৃথক বিভাগ তৈরি করা হয়।

## ৫.১ প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. মোড়কীকরণের ফলে খাদ্যের গুণগত মান রক্ষা হয়, খাদ্যের আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়।
২. বাহিরের ক্ষতিকর উপাদান যেমন– পরিবেশ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি হতে পণ্যকে রক্ষা করে।
৩. মোড়কীকরণের ফলে পণ্যের অনুজৈবিক ক্রিয়া বন্ধ বা হ্রাস হয়।
৪. বাহিরের আঘাত থেকে পণ্যকে রক্ষা করে।
৫. মোড়কের উপর লেখা থাকে কোন প্রতিষ্ঠানের কী বস্তু ভিতরে প্যাক করা আছে।
৬. পণ্য চুরি বন্ধ করতে ভূমিকা রাখে।
৭. পণ্যকে ভোক্তার কাছে আকৃষ্ট করে।
৮. পণ্য এক স্থান হতে অন্যস্থানে পাঠাতে ঝামেলামুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে।
৯. আলো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন খাদ্যকে আলো থেকে রক্ষা করে যেমন– অস্বচ্ছ বোতল।
১০. প্যাকেজিং -এর অভাবে প্রায় ৪০% খাবার নষ্ট হয়। প্যাকেজিং -এর ফলে এ ক্ষতি অনেকটা হ্রাস করে।

চিত্র : প্লাস্টিক প্যাকেট করা ফল

চিত্র : সবজি প্যাকেট করা

মোড়কের বৈশিষ্ট্য : মোড়কের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা হলো–

১. মোড়ক পণ্যের জন্য কোনোরূপ বিষাক্ত হবে না।

২. অণুজীবের দ্বারা পণ্য আক্রান্ত হওয়া রোধ করে।

৩. মোড়কের ভিতর অক্সিজেন প্রবেশে বাধা এবং আর্দ্রতার প্রবেশ ও নির্গমণে প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

৪. পরিবেশের বিষাক্ত পদার্থ বা দুর্গন্ধ থেকে পণ্যকে রক্ষা করে।

৫. ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি থেকে পণ্যকে রক্ষা করে।

৬. মোড়কের উপাদান পণ্যের সাথে বিক্রিয়া করে না।

৭. মোড়ক সহজেই খোলা যায়।

২০২০

৮. ব্যবহারের পর মোড়ক সহজেই ফেলে দেওয়া যায়।
৯. মোড়কের গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা থাকবে।
১০. সস্তা খাবারের জন্য সস্তা মোড়ক ও দামি খাদ্যের জন্য দামি মোড়ক থাকতে হবে।

## ৫.২ প্যাকেটের আকার ও আকৃতি

### মোড়কের আকার ও আকৃতি

মোড়কের আকার, আকৃতি ও উচ্চতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্পোন্নত দেশে টাটকা ফল ও শাকসবজি বিভিন্ন অঞ্চল অথবা বিদেশ হতে সরাসরি রপ্তানি করা বাক্সে মাধ্যমেই খুচরা বিক্রেতার হাতে এসে পৌঁছে। এর ফলে এ সকল মোড়কেই ঐ অঞ্চলের বা ঐ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা প্রচার করে। মোড়কের বাহিরের চেহারা পণ্য বেচাকেনার সাহায্য করে। এজন্য মোড়কের আকার ও আকৃতি নিম্নরূপ হওয়া উচিত।

১. ক্রেতা বা ভোক্তার ব্যবহার করা সহজ হয়।
২. প্রয়োজনমতো শক্ত হয়।
৩. সুলভ মূল্যের হয়।
৪. স্থানান্তর সহজ ও নিরাপদ হয়।
৫. একজন মানুষ তা সহজে তুলতে পারে অর্থাৎ পণ্যসহ মোড়কের ওজন ২০-২৫ কেজির বেশি না হয়।

আবার মোড়কের আকৃতিও এমন হওয়া উচিত যাতে পণ্য পরিবহন যানবাহনে বোঝাইকালে তার বহনক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। পণ্য সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয়। একই পরিমাণ জায়গা দখল করলেও গোলাকৃতি ঝুঁড়িতে আয়তাকার বাক্সের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম পণ্য ধরে। এমনকি গোল ঝুড়ি পরিবহনকালে কম সংখ্যক সাজানো যায়। সেজন্য গোলঝুড়ির চেয়ে আয়তাকার বাক্সে পণ্য প্যাকেট করা বেশি ভালো।

চিত্র : গোলঝুড়ির চেয়ে আয়তাকার প্যাকেট প্যাকেজিং -এর ক্ষেত্রে উত্তম

প্যাকেজিং সামগ্রী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য :

১। প্যাকেজিং-সামগ্রী আর্দ্রতা ও অক্সিজেন নিরোধক হতে হবে এবং পণ্যের গায়ে আলো-বাতাস লাগার সুবিধা থাকতে হবে।

২। প্যাকেজিং দ্রব্য তাপে জোড়া লাগার ক্ষমতা থাকতে হবে বা সেলাই করার সুবিধা থাকতে হবে।

৩। প্যাকেট দৃঢ় ও শক্তিশালী হতে হবে, যাতে নাড়াচড়ায় ফেটে না যায় বা কীটপতঙ্গ প্রবেশ করতে না পারে।

৪। বাতাস বা অক্সিজেনের কারণে খাদ্যদ্রব্যে রাসায়নিক পরিবর্তন হতে পারে, তাই প্যাকেটটি বায়ুশূন্য অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন গ্যাস পূর্ণ করে রাখা উচিত।

৫। প্যাকেটটি এমন হতে হবে যাতে স্থানান্তর, যানবাহনে বোঝাই ও স্তূপ গাদা করা সহজ হয়। প্যাকেটের ওজন ২০-২৫ কেজি হওয়া উচিত, যাতে একজন মানুষ সহজেই তুলতে বা নামাতে পারে।

৬। প্যাকেজিং সামগ্রী হিসেবে চটের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ, টিন, কৌটা, প্লাস্টিক, ড্রাম, সেলোফিন কাগজ, উন্নত মটকা, লাউয়ের খোল ইত্যাদি হতে পারে।

৭। আলোর প্রভাবে তৈলাক্ত খাদ্যের কটুত্ব সৃষ্টি হতে পারে, তাই রঙিন বা অস্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা প্যাকেট তৈরি করতে হবে।

৮। ভেজাল প্রতিরোধের জন্য প্যাকেট এমন দ্রব্য দ্বারা তৈরি হতে হবে যাতে পুনরায় ব্যবহার করা না যায়।

৯। প্যাকেটে লেবেল ছাপানোর উপযোগী এবং তাতে ব্যবহৃত ছবি খাদ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

১০। সর্বোপরি প্যাকেটটির আকার ও আয়তন অবশ্যই সুন্দর, আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক হতে হবে।

## ৫.৩ বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজিং-এর গুণাগুণ

### প্যাকেজিং সামগ্রীর সুবিধা ও অসুবিধা

প্যাকেজিং সামগ্রী প্যাকেজিং প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে প্যাকেজিং সামগ্রীর নাম, সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করা হলো–

১। পলিথিন লাইনার যুক্ত চটের ব্যাগ।

২। কাপড়ের ব্যাগ।

৩। পলিথিন ব্যাগ।

৪। উন্নত মটকা।

৫। প্লাস্টিকের ড্রাম।

৬। সেলোফিন পেপার।

৭। টিন/ কৌটা ইত্যাদি।

### ১। চটের ব্যাগ

এ ব্যাগে প্যাকিং খরচ কম। চটের ব্যাগের ভিতরে পলিথিনের লাইনার বা পলিব্যাগ সেট করা যায়। ধান, গম, ভুট্টবীজ এ ধরনের ব্যাগে সহজে প্যাকিং করা যায়।

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) ব্যাগের মূল্য কম।<br>(খ) পরিবেশসম্মত।<br>(গ) একত্রে অনেক ব্যাগ সাজানো যায়।<br>(ঘ) সহজে মুখ সেলাই করা যায়। | (ক) ভিজে গেলে ব্যাগ শুকাতে দেরি হয়।<br>(খ) ব্যাগ ইঁদুরে সহজে কাটতে পারে।<br>(গ) হুক লাগলে ব্যাগ ছিঁড়ে পণ্য পড়ে যায়।<br>(ঘ) সহজে নষ্ট হয়ে যায়। |

২। কাপড়ের ব্যাগ

এ ব্যাগের খরচ চটের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। কাপড়ের ব্যাগ বেশি বড় করা যায় না। মোটা কাপড়ের ব্যাগে স্বল্পমেয়াদের জন্য শস্য দানা প্যাকিং করা যেতে পারে।

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) ব্যাগের মুখ সহজেই সেলাই করা যায়।<br>(খ) নাড়াচাড়া করা সহজ হয়।<br>(গ) চাহিদাকৃত সাইজে ব্যাগ সহজে বানানো যায়। | (ক) ব্যাগ বেশি বড় করা যায় না।<br>(খ) ইঁদুর সহজে কাটতে পারে।<br>(গ) আর্দ্রতা প্রতিরোধক হয় না। |

৩। উন্নত মটকা

মাটি দিয়ে তৈরি এবং এতে খরচ কম। মটকায় শস্যদানা বায়ুরোধী করে রাখা যায়। এক্ষেত্রে বিএআর আই উদ্ভাবিত উন্নত মটকা ব্যবহার করলে ভালো হয়। সারাদেশে গ্রামাঞ্চলে মাটির তৈরি মটকা ব্যবহার করা হয়।

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) মটকা তৈরির কাঁচামাল সহজলভ্য।<br>(খ) মটকার খরচ কম।<br>(গ) শস্যদানা বায়ুরোধী করে প্যাকিং করা যায়।<br>(ঘ) ইঁদুরপোকামাকড় সহজে আক্রমণ করতে পারে না। | (ক) আঘাত লাগলে সহজে ভেঙ্গে যায়।<br>(খ) একসাথে বেশি গাদা করে সাজানো যায় না।<br>(গ) সাজানোর জন্য বিড়া বা বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।<br>(ঘ) ওজনে ভারী হয়। |

৪। প্লাস্টিক ড্রাম

বায়ুরোধী করে দীর্ঘদিন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা যায়। প্লাস্টিক ড্রাম বিভিন্ন পুরুত্বে তৈরি করা যায়। তবে খাদ্য পণ্য সংরক্ষণের জন্য PVC (Poly Vinyl Chloride) ড্রাম ব্যবহার করা উচিত নয়। PVC ব্যাতিরেকে অন্য ধরনের প্লাস্টিক যেমন- HDPE, LDPE ইত্যাদি Foodgrade প্লাষ্টিক ব্যবহার করা উচিত।

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) ওজনে হালকা।<br>(খ) বারবার ব্যবহার করা যায়।<br>(গ) দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য পুরুত্ব বাড়ানো যায়।<br>(ঘ) শস্যদানা বায়ুরোধী করে রাখা যায়।<br>(ঙ) আর্দ্রতা প্রতিরোধক। | (ক) আগুনের সংস্পর্শে গলে যেতে পারে।<br>(খ) বিশেষ ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়।<br>(গ) সম্পূর্ণভাবে গ্যাস প্রতিরোধক নয়।<br>(ঘ) খাবারে অনেক সময় দুর্গন্ধ যোগ হয়।<br>(ঙ) প্লাস্টিক বিক্রিয় করে খাবার বিষাক্ত করতে পারে। |

৫। পলিথিন ব্যগ

বিভিন্ন পুরুত্বের পলিথিন শিট দিয়ে বিভিন্ন আকারের ব্যাগ তৈরি করা যায়।

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) গ্যাস, আর্দ্রতা ও তেল নিরোধক। | (ক) তাপে গলে যায়। |
| (খ) তাপে সহজে জোড়া লাগানো যায়। | (খ) সহজে ছিদ্র হয়ে যায়। |
| (গ) বিভিন্ন আকারের ব্যাগ তৈরি করা যায়। | (গ) ব্যাগে বেশি করে পণ্য ভরলে ফেটে যেতে পারে। |
| (ঘ) ভাঁজ করে অল্পস্থানে অনেক ব্যাগ রাখা যায়। | (ঘ) পরিবেশবান্ধব নয়। |

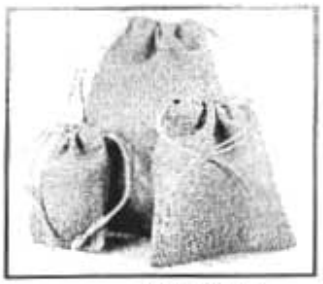

চটের ব্যাগ

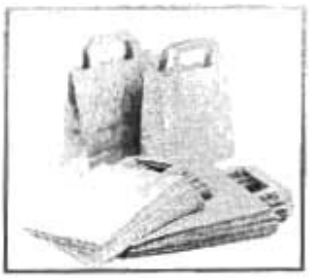

কাগজের ব্যাগ

মটকা

প্লাস্টিক ড্রাম

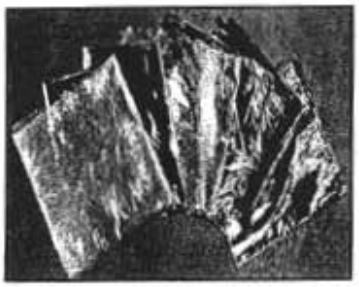

সেলোফেন

কাচের বোতল

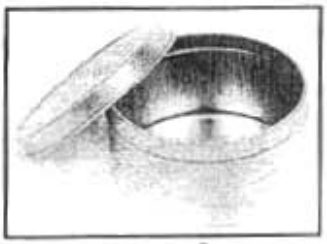

টিনের কৌটা

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজিং-সামগ্রী

এ ছাড়াও কিছু নমনীয় পলিথিন প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। যথা–

(ক) হাই-ডেনসিটি পলিইথিলিন ব্যাগ (HDPE)।

(খ) লো-ডেনসিটি পলিইথিলিন ব্যাগ (LDPE) |

(গ) পলি প্রপাইলিন ব্যাগ।

(ঘ) পলি স্টাইরিন ব্যাগ।

(ঙ) বিভিন্ন ধরনের লেমিনেটেড শিটের তৈরি ব্যাগ।

৬। সেলোফেন পেপার

একে রিজেনারেটেড ফিল্ম বা পুনঃউৎপাদিত সেলুলোজ ফিল্ম বলে। এর উপর নাইট্রো সেলুলোজ, দ্বারা প্রলেপ দেয়া যায়। এগুলো কাচের মতো স্বচ্ছ, মসৃণ ও হাত দিলে মচমচ শব্দ করে।

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) এটি হাতে ও মেশিন ব্যবহার উপযোগী।<br>(খ) কম খরচে উচ্চমানের সুরক্ষক হিসেবে কাজ করে। | (ক) পচনশীল নয়, তাই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।<br>(খ) তৈরির জন্য উচ্চমানের যন্ত্র ও কর্মীর প্রয়োজন হয়। |

৭। টিন/কৌটা

টিনের পাত্রের প্লেটকে গেজ বা পাউন্ড ওয়েট বেসিস প্রকাশ করা হয়। টিনের পাত্রের চাকার সংযোগস্থলে মোম গলিয়ে দিলে বায়রোধ করা সম্ভব হয়

| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| (ক) ওজনে হালকা।<br>(খ) খাদ্যশস্য বায়ুরোধক করা যায়।<br>(গ) সহজে পরিবহনযোগ্য।<br>(ঘ) দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়। | (ক) মরিচা পড়ে।<br>(খ) ক্ষয়কারী আঠায় টিন দ্রুত ক্ষয় করে।<br>(গ) বারবার ঢাকনা খোলা কস্টকর।<br>(ঘ) অধিক তাপমাত্রায় খাবার দ্রুত নষ্ট হয়। |

৫.৪ প্যাকেজিং-এর ধারণ ক্ষমতা ও লেবেল পদ্ধতি

আমাদের দেশের সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথের পণ্য পরিবহন ও ক্রয় বিক্রয়ে প্যাকেটের ধারণক্ষমতা ও লেবেলের পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্যাকেটের ধারণক্ষমতা এমন হওয়া উচিত যাতে একজন শ্রমিক অনায়াসেই উঠাতে এবং নামাতে পারে। উন্নত দেশসমূহে টাটকা ফল ও সবজি বিভিন্ন অঞ্চল হতে অথবা বিভিন্ন দেশ হয়ে সরাসরি রপ্তানি করা বাক্সের মাধ্যমেই খুচরা বিক্রেতাদের হাতে এসে পৌঁছে। এ সমস্ত প্যাকেজেই পণ্যের আকার, রং, নাম ইত্যাদি উল্লেখ থাকে বলে লেবেল দেখে পণ্য বেচাকেনা সহজ ও দ্রুততার সাথে হয়ে থাকে তাই লেবেল স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হয়। পণ্য রাখার পাত্র পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং তাতে আকর্ষণীয়ভাবে পণ্য সাজাতে হবে।

অনেক সময় খাদ্যশস্য/দানাশস্য বা পণ্য দূরবর্তী স্থানে অক্ষত অবস্থায় প্রেরণের জন্য প্যাকেজিং পাত্রের প্রয়োজন হয়। এ সকল পাত্র যথেষ্ট শক্ত ও দৃঢ় হতে হয়। অন্যথায় তা যানবাহনের ঝাঁকুনি ও বহনে নষ্ট বা ভেঙ্গে যেতে পারে। এতে করে প্রেরণকারী আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এর জন্য শস্যের ধরন অনুযায়ী প্যাকেজের একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো :

| পাত্রের নাম | ব্যবহার |
|---|---|
| ১। চটের ব্যাগ | ১। ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, ডাল সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। |
| ২। কাপড়ের ব্যাগ | ২। চিনা, কাউন, সয়াবিন, তিসি সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। |
| ৩। উন্নত মটকা (মাটির পাত্র) | ৩। গম, সরিষা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। |
| ৪। প্লাস্টিক ড্রাম | ৪। ধান, গম সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। |
| ৫। পলিথিন ব্যাগ | ৫। কুসুম ফুল বীজ, সূর্যমুখী বীজ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। |
| ৬। সেলোফেন পেপার | ৬। ভুট্টা, তিল, ধান, বাদাম ইত্যাদি থেকে তৈরি খাবার প্যাকিং এ ব্যবহৃত হয়। |
| ৭। টিনের কৌটা | ৭। গম, তিল, সরিষা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। |

## মার্কিং বা লেবেলিং

লেবেল অর্থ কোনো জিনিস বা মোড়কের গায়ে লেখা সংশ্লিষ্ট জিনিসের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক বিবরণ। অবশ্যই এ বিবরণ দেশীয় বা আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। আমাদের দেশে এ নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিটিউট (BSTI)। নীতিমালাগুলো নিচে দেয়া হলো–

১। লেবেলে খাদ্যদ্রব্যের নাম উল্লেখ করতে হবে।

২। প্যাকিং মাধ্যমে নাম উল্লেখ করতে হবে। যথা– রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

৩। প্রস্তুতকৃত খাদ্যে যোগকৃত সব ধরনের উপকরণের (Ingrediants)-এর নাম উল্লেখ করতে হবে।

৪। খাদ্যবস্তুর ওজন বা (Net Weight) উল্লেখ করতে হবে।

৫। খাদ্যবস্তুসহ প্যাকেটের ওজন বা (Gross Weight) উল্লেখ করতে হবে।

৬। প্রস্তুতকারক বা (Manufacturer)-এর নাম উল্লেখ করতে হবে।

৭। কোন দেশের তৈরি তার নাম থাকতে হবে।

৮। পণ্যের শ্রেণি, কোড নম্বর, লট নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

৯। প্রস্তুত করার তারিখ এবং ব্যবহার উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

১০। নির্দিষ্ট পরিমাণে উপস্থিত পুষ্টিমান উল্লেখ করতে হবে।

১১। খাদ্যশস্যে রং ব্যবহার করলে তা লিখতে হবে “Artificially Coloured”।

১২। ব্যবহার বিধি (যেখানে প্রযোজ্য) উল্লেখ করতে হবে।

উপরে বর্ণিত তথ্য গোপন করা যাবে না। সবকিছু স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। পানিতে ধুয়ে যাবে না এমন কালি দিয়ে লিখতে হবে। লেখা এমন হতে হবে যাতে ক্রেতাসাধারণের নিকট কোনো প্রকার সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

## ৫.৫ প্যাকেজিং -এর পরীক্ষাকরণ ও পুনঃব্যবহার

প্যাকেটিং বা মোড়ক ব্যবহারের পূর্বে আমাদের জানা দরকার যে পাত্র বা বাক্সটি পণ্যসমেত কত দূরবর্তী বাজারে পৌঁছাতে সক্ষম। এক্ষেত্রে পাত্রগুলোর কার্যকারিতা ও গুণাগুণ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে নতুন নতুন প্যাকেজ দ্রব্য যেমন– টেট্রাপ্যাক ইত্যাদি। আমাদের দেশে প্যাকেজিং পাত্রের পরীক্ষা করার তেমন সুব্যবস্থা নেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগারে এ সমস্ত পরীক্ষণ নিরীক্ষণের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাগুলি হলো–

(১) ঊর্ধ্বমুখী ইমপ্যাক্ট টেস্ট।

(২) সমান্তরাল ইমপ্যাক্ট টেস্ট।

(৩) পরিবহনকালে পথিমধ্যে সৃষ্ট ঝাঁকুনি টেস্ট।

(৪) পথে চলাকালীন অবস্থায় প্রকৃত অবস্থার টেস্ট।

উপরোক্ত টেস্টগুলোর মধ্যে পরিবহনকালে চলার সময়ে সৃষ্ট ঝাঁকুনি ও চাপের ফলে পণ্যের মোড়কের উপর প্রতিক্রিয়া হয় সে পরীক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ পরীক্ষার ফল থেকে এটা বোঝা যায় যে প্যাকেজগুলো কতটা শক্তিশালী ও কার্যকর এবং এগুলো সংরক্ষিত পণ্যের জন্য কতটা নিরাপদ।

## প্যাকেজিং পাত্রের পূর্ণ ব্যবহার

প্যাকেজিং প্রক্রিয়ার কারণে পণ্যের মূল্য অনেক সময় অত্যন্ত বেড়ে যায়। তাই প্যাকেজিং ব্যয় কমানোর সম্ভব হলে এমন সব প্যাকেজিং আধার বা পাত্র ব্যবহার করা উচিত যা বার বার ব্যবহার করা যায়। আর এ ধরনের মোড়কীকরণ পাত্র সব দেশেই শুধুমাত্র অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় বাজারের জন্য ব্যবহার করা হয়। রপ্তানির উদ্দেশ্যে সাধারণত প্যাকেজিং পাত্র বার বার ব্যবহার করা যায় না। ওগুলো শুধু একবার ব্যবহার হয়।

## অনুশীলনী-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে মোড়কীকরণ কখন করে?
২. টিনজাত খাদ্যের জীবনকাল কতদিন?
৩. প্যাকেজিং-এর অভাবে শতকরা কতভাগ খাবার নষ্ট হয়?
৪. একটি পণ্যসহ মোড়কের ওজন কত কেজি হওয়া উচিত?
৫. গোল ঝুড়ির চেয়ে কোন আকারের মোড়ক পণ্য পরিবহনে উত্তম?
৬. প্যাকেট বায়ুশূন্য অবস্থায় কোন গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করে রাখা উচিত?
৭. কী কী জিনিস দিয়ে প্যাকেজিং করা যায়?
৮. ভেজাল প্রতিরোধের জন্য কি ধরনের প্যাকেট তৈরি করা উচিত?
৯. চটের ব্যাগে কোন পণ্য সহজে প্যাকিং করা যায়?
১০. প্যাকেজিং হিসেবে কাপড়ের ব্যাগের প্রধান অসুবিধা কী?
১১. উন্নত মটকার প্রধান সুবিধা কী?
১২. PVC প্লাস্টিক ড্রাম বাদ দিয়ে কী ধরনের ড্রাম ব্যবহার করা যায়?
১৩. টিনের পাত্রের প্লেটকে কী বেসিসে প্রকাশ করা হয়?
১৪. সেলোফেন কাগজে কী প্যাকিং করা হয়?
১৫. BSTI মানে কী?
১৬. টেট্রাপ্যাক বলতে কী বুঝায়?
১৭. প্যাকেজিং পাত্রের পরীক্ষণের ব্যবস্থা কোথায় হয়?
১৮. প্যাকেজিং পাত্রের টেস্টগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
১৯. কোন ক্ষেত্রে প্যাকেজিং পাত্র বারবার ব্যবহার করা যায় না?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি প্যাকেজিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
২. প্যাকেজিং-এর গুরুত্ব উল্লেখ কর?
৩. প্যাকেজিং-এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৪. প্যাকেজিং-এর আকার ও আকৃতি কীরূপ হওয়া উচিত?
৫. 'গোল ঝুড়ির চেয়ে আয়তাকার প্যাকেজিং-এর জন্য ভালো' ব্যাখ্যা কর।
৬. প্যাকেজিং সামগ্রী নির্বাচনের প্রধান ৫টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
৭. কয়েকটি প্যাকেজিং সামগ্রীর নাম লেখ।
৮. পলি ব্যাগের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
৯. চটের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ ও উন্নত মটকায় কী কী খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা হয়?
১০. প্যাকেট পরীক্ষা করার টেস্ট কয়টি ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাকেজিং-এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
২. প্যাকেটের আকার, আকৃতি ও প্যাকেজিং সামগ্রী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
৩. বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজ সামগ্রীর নাম উল্লেখ করে এগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।
৪. প্যাকেজের লেবেলিং এবং প্যাকেজের টেস্টগুলো বর্ণনা কর।

## অধ্যায়-৬

# ফল ও সবজি প্যাকিং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

ফল ও সবজি সংগ্রহের পর পরিষ্কার করা, ঠাণ্ডা করা, বাছাই করা, শ্রেণিবিন্যাস করা ইত্যাদি করার পর মোড়কীকরণ বা প্যাকেজিং করে দূরবর্তী বাজারে বিক্রির জন্য প্রেরণ করার প্রয়োজন হয়। এ সকল কাজকর্ম করার জন্য মাঠে বা নিকটবর্তী কোনো সুবিধাজনক স্থানে প্যাকিং শেড বা প্যাকিং হাউজ তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্যাকিং শেড বা হাউজ স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। তবে স্থানটি অবশ্যই ছায়াযুক্ত এবং খোলামেলা হতে হবে। ঐ স্থানের আবহাওয়া যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা ও কোলাহলমুক্ত হওয়া উত্তম। প্যাকিং হাউস ঢেউটিন অথবা সাধারণ বাঁশের চাটাই অথবা খড় দিয়ে করা যেতে পারে। শেডগুলো কী দিয়ে তৈরি করা হবে সে বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সেখানে যাতে বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকে। প্যাকিং শেডের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো।

(১) প্যাকিং শেডের পণ্য নিরাপদ থাকবে। অর্থাৎ কোনো পণ্য নষ্ট বা খোয়া যাবে না।
(২) শেডের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার সব সুবিধা থাকবে।
(৩) এখানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস, ক্যান্টিন বা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।
(৪) পণ্য সাময়িক স্তূপ করার ব্যবস্থা থাকবে।

একটি প্যাকিং হাউজে সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। যথা –
(১) পণ্য সংগ্রহ এলাকা
(২) পণ্য প্রস্তুত ও প্যাক করার এলাকা
(৩) প্রেরণ এলাকা

প্যাকিং হাউস একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা। এখানে পার্শ্ববর্তী মাঠ থেকে তুলে আনা টাটকা ফল বা সবজি একত্র করা, প্যাক করা, এবং কখনও কখনও সাময়িকভাবে গুদামজাত করা হয়। এখান থেকেই এসব পণ্য দূরবর্তী শহরের বাজারে, বিদেশি বাজারে এবং অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ স্থানে উৎপাদনকারীর সাথে মধ্যস্বত্বভোগীদের যোগাযোগ হয় এবং বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর আদান-প্রদান হয়। কী ধরনের ফসল উৎপাদন লাভজনক হতে পারে এসব তথ্য জানার পর ভবিষ্যতে ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা এখানে থেকেই প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

## ৬.১ প্যাকিং স্থানের ভৌত কাঠামো

### প্যাকিং স্থানের ভৌত কাঠামো

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্যাকিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কাজ-কর্ম সম্পন্ন করা এবং শ্রমিক কর্মচারীদের থাকার জন্য একটি অস্থায়ী শেড নির্মাণ করার প্রয়োজন হয়। এই শেড তিন ধরনের হতে পারে।

যেমন–

(১) খড়ের তৈরি প্যাকিং শেড

(২) তারের জালের প্যাকিং শেড

(৩) পলিথিন শীটের প্যাকিং শেড

১. খড়ের তৈরি প্যাকিং শেড

এ রকম প্যাকিং ঘরের চাল ও দেয়াল খড়ের তৈরি হলেও বেশ মজবুত করে তৈরি করা হয়। জলীয় বাষ্পের সাহায্যে পণ্যসামগ্রী ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্যাকিং শেডের চাল ও দেয়াল পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয় (চিত্র)।

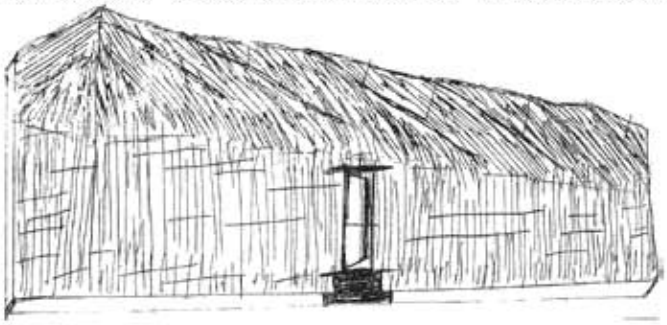

চিত্র : খড়ের তৈরি খাদ্য প্যাকিং ঘর/শেড

২. তারের জাল দিয়ে তৈরি প্যাকিং ঘর

এ রকম প্যাকিং ঘরের চালের ছাউনি খড়ের কিন্তু দেয়াল তৈরি করা হয় কাঠ-কয়লা ভর্তি তারের জাল দিয়ে। প্রতিদিন সকালে দেয়ালের ঐ কাঠকয়লা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলে সারাদিন ধরে ঐ জলীয় বাষ্পের প্রভাবে ঘর ঠাণ্ডা থাকে (চিত্র)।

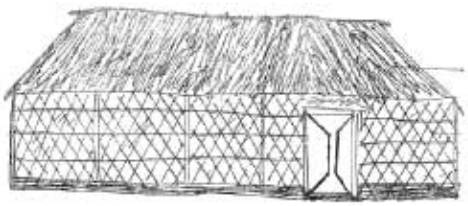


চিত্র : তারের জাল দিয়ে তৈরি প্যাকিং ঘর

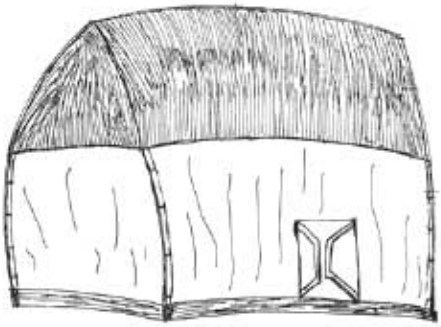

চিত্র : কাঠ বা বাঁশের পোল ও পলিথিন শীট দিয়ে তৈরি প্যাকিং ঘর

২০২০

আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে, ফল ও সবজি বড় বস্তায় ভরে বস্তাগুলো উপরাপর স্তূপ করে ট্রাকে বা রেলগাড়িতে করে দূরে চালান দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা মোটেই ভালো নয়। সে ক্ষেত্রে এ জাতীয় অস্থায়ী প্যাকিং ঘর মাঠে তৈরি করা যেতে পারে । ফল বা সবজি ভর্তি ভারী বস্তা কখনও একটির উপর কয়েকটি রাখা উচিত নয়।

## ৬.২ প্যাকিং কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ

### প্যাকিং কার্যক্রমের ধারাবাহিক কাজ

ফল ও সবজি প্যাকিং কাজ এলোপাতাড়ি ভাবে করা যায় না। এ কাজ করার কিছু ধারাবাহিক নিয়ম আছে। নিয়মমাফিকভাবে প্যাকিং কাজ করলে এর সফলতা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। প্যাকিং কাজগুলোর ধারাবাহিকতার ধাপগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-

(১) একত্রীকরণ ও পরিষ্কারকরণ
(২) বাছাইকরণ বা সর্টিংকরণ
(৩) শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিংকরণ
(৪) সঠিক আকার বা আকৃতি নির্ধারণ
(৫) মোমের প্রলেপ দান ও
(৬) প্যাকিং সম্পন্নকরণ।

### ১. একত্রীকরণ ও পরিষ্কারকরণ

মাঠ হতে সদ্য তোলা ফল ও সবজি সংগ্রহ করে প্যাকিং শেড বা হাউজে এনে একত্র করা হয়। এরপর পণ্যগুলোকে ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করা হয়। এজন্য পণ্যগুলোকে পানির ট্যাংকে ডুবানো হয় এবং ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তারপর পানি থেকে তুলে শুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ কাজগুলো হাতে বা যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়। অনেক সময় স্প্রে বা ঝরনার আকারে পানি দিয়ে ফল ও সবজি ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়।

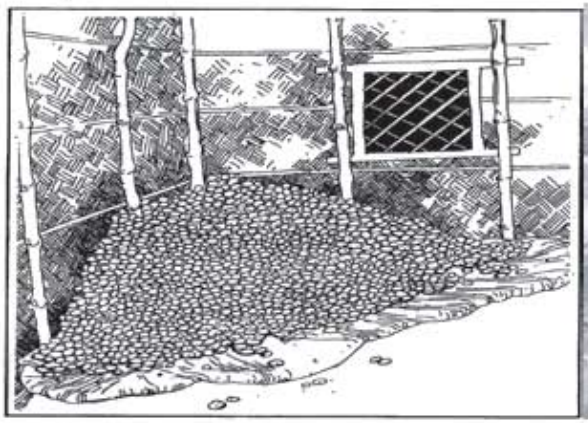

চিত্র : আলু একত্রীকরণ

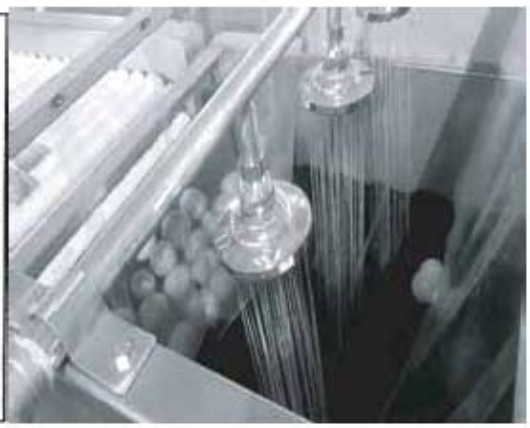

চিত্র : ফল পরিষ্কারকরণ

### বাছাইকরণ

পণ্য বাছাই হাত দিয়ে করাই সব চেয়ে ভালো। যান্ত্রিকভাবে পণ্য বহনকারী কনভেয়ার বা বেল্ট এবং স্থায়ীভাবে বসানো টেবিলের সাহায্য নিয়েও বড় বড় প্রতিষ্ঠানে পণ্য বাছাই করা হয়। বাছাইকরণের সময় পণ্যসামগ্রীকে ভালোভাবে দেখে অতি পাকা, অতি কাঁচা, অপুষ্ট, আঘাতপ্রাপ্ত ও থেঁতলে যাওয়াগুলোকে বাদ দিতে হয়। রোগাক্রান্ত ফল ও সবজি অবশ্যই বেছে বাদ দিতে হয়। তা না হলে ভালো পণ্য ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে সমস্ত পণ্যই নষ্ট হয়ে যায়। এ সময় পণ্যের আকার ও রং চিহ্নিত করা যায়।

### শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিংকরণ

প্রথমে অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহণযোগ্য পণ্য বাদ দিতে হয়। তারপর যে পণ্যগুলো উত্তম ও বাজারমূল্য ভালো পাওয়া যাবে সেগুলো বিভিন্ন মান বা ক্যাটাগরি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়।

### সঠিক আকার বা আকৃতি নির্ধারণ

পণ্যের আকার বা আকৃতি দেশে বিভিন্ন গ্রেডে পণ্য বাছাই করতে হয়। এ ব্যাপারে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আকার নির্ধারণী রিং বা দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে কম্পিউটারের মাধ্যমেও বিভিন্ন মান ও স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা হয় বলে একে Standardization বলে।

### মোমের প্রলেপ দেওয়া

ফল ও সবজিকে সতেজ ও আকর্ষণীয় করে রাখার জন্য হালকা মোমের প্রলেপ দেয়া হয়। এতে করে বাইরের তাপের ফলে পণ্যগুলোর প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বাধা পায়। তাই ফল ও সবজি শুকিয়ে যায় না। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আধুনিক পদ্ধতি ফুড গ্রেডের নিয়মানুযায়ী মোমের প্রলেপ দেয়া হয়। মোমের পরিবর্তে কখনও প্যারাফিন দেয়া যেতে পারে। এই মোম বা প্যারাফিন লাগানো পণ্য খাওয়ার পূর্বে ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়। তবে এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।

### প্যাকিং সম্পন্ন করা

সবশেষে পণ্যকে মোড়কীকরণ করা হয়। এজন্য বাক্স, ট্রে, কার্টন, ঝুড়ি বা অন্য কোনো মোড়ক ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি বাক্সে নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য ওজন ও সংখ্যা হিসেব করে সাজিয়ে ভরতে হয়। রপ্তানি করার জন্য যে প্যাকিং করা হয়, তাতে পণ্যের বা সংখ্যা যথাযথ সরকারি আইন বা আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। প্যাকিং বাক্সে হাত দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে সাজানো হয়। আঙ্গুর, আম, ব্রোকলি, শিম, শসা, ধনেপাতা ইত্যাদি হাত দিয়ে সাজানো হয়। হাত দিয়ে প্যাকিং করলে তা অনেক আকর্ষণীয় ও অনড় করে সাজানো যায়।

## ৬.৩ প্যাকিং হাউসের যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহ

প্যাকিং হাউজে যে ধারাবাহিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে হয় তা অনেক সময় হাত দিয়ে করা যায় না। তাছাড়া এ কাজে সব সময় দক্ষ শ্রমিকও পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে প্যাকিং হাউজে কিছু কাঠের আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়।

যেমন–

(১) প্যাকিং স্ট্যান্ড

(২) পণ্যের আকার নির্ধারণী রিং

(৩) গোলাকার ঘূর্ণায়মান টেবিল।

### প্যাকিং স্ট্যান্ড

এটি বিশেষভাবে তৈরি কাঠের বড় টেবিল। টেবিলটি ফল ও সবজি শ্রেণিবিন্যাস ও বাছাই করার জন্য বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা থাকে। যেমন- প্যাকেট শেলফ, সর্টিং বিন, প্যাকিং বিন ইত্যাদি। গ্রেডিং করার জন্য বিভিন্ন আকারের ছিদ্রযুক্ত চালুনি (Sieve) ব্যবহার করার নিয়ম আছে।

### পণ্যের আকার নির্ধারণী রিং

এগুলো কাঠের তৈরি, বিভিন্ন মাপের রিং। এদের মাপ ব্যাসের মাপ অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন ৬০ সে.মি. ৮৫ সে.মি. ইত্যাদি।

### গোলাকার ঘূর্ণায়মান টেবিল

এটি বিভিন্ন ধরনের পণ্যের প্যাকিং -এর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পণ্যগুলো কনভেয়ার বা চলন্ত বেল্টের মাধ্যমে অথবা সরাসরি গোলাকার টেবিলে স্থাপন করা হয়। দক্ষ পণ্য বাছাইকারী শ্রমিকেরা পণ্য বাছাই করে বড় কার্টন বা মোড়কজাত করে। এ টেবিলের সাপ্লাই বেল্টের নিচে বর্জ্য নিষ্কাশন বেল্ট লাগানো থাকে, যেখানে গ্রহণযোগ্য নয় এমন সব পণ্য ও বর্জ্য সহজেই বাদ দেয়া হয়। এটি উন্নত আধুনিক পদ্ধতি। এতে দ্রুততার সাথে অধিক পরিমাণ পণ্য প্যাকিং করা সম্ভব হয়।

চিত্র : গোলাকার ঘূর্ণায়মান টেবিল

২০২০

### ৬.৪ প্যাকিং কাজের সমন্বয়করণ

প্যাকিং কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য এর বিভিন্ন ধারাবাহিক ধাপগুলো সঠিক ও সুচারুরূপে শেষ করতে হয়। পণ্য সংগ্রহের পর হতে পরিষ্কার ও একত্রীকরণ, মোড়ক নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ, পরিবহন যান তৈরি ইত্যাদি কাজ প্রত্যোকটি একে অপরের পরিপূরক। একটি কাজ সঠিক সময়ে না হলে সম্পূর্ণ কাজের চেইন পিছিয়ে যাবে এবং বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এ কাজগুলোগে এককেন্দ্রিক কমান্ডে এনে সমন্বয় করতে হবে। এবং যে যে কাজের জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত তাকে সেই কাজ দিতে হবে। একজন দক্ষ ম্যানেজার বা সুপারভাইজার সম্পূর্ণ কাজের তত্ত্বাবধান করবেন। কোনো একটি কাজ যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে পরো কার্যক্রমটি ব্যাহত হবে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। তাই একটি ধাপ পিছিয়ে গেলে তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়। সম্পূর্ণ কাজকে একটি টিমওয়ার্ক হিসেব মনে করতে হবে। প্রয়োজনে জনবল বাড়িয়ে অথবা আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে কাজটি সমাধা করে প্যাকিং কার্যক্রমের চক্রটি চালু রাখতে হবে। নিম্নে প্যাকিং কার্যক্রমের চক্র দেখানো হলো।

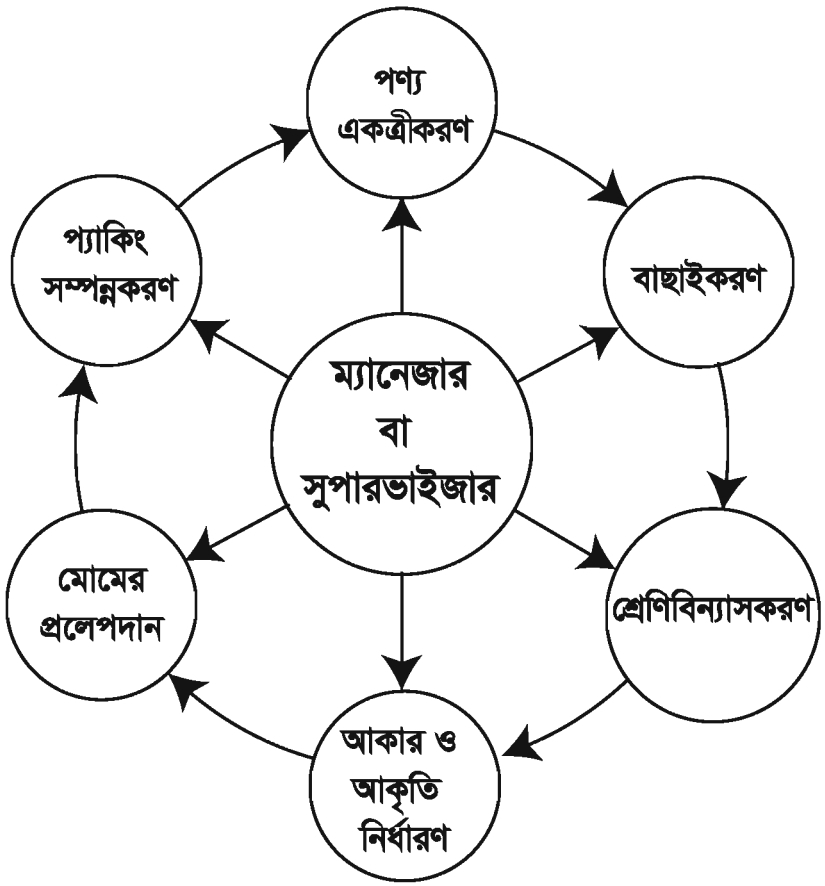


চিত্র : প্যাকিং কার্যক্রমের চক্র

# অনুশীলনী -৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি সংগ্রহ করে প্যাকিং করার পূর্বে কী কী কাজ করতে হয়?
২. এ কাজগুলো যে স্থানে করা হয় তাকে কী বলে?
৩. প্যাকিং শেডের জায়গাটি কী রকম হওয়া উচিত?
৪. প্যাকিং শেডের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
৫. প্যাকিং শেডে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?
৬. ভবিষ্যৎ ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা কোথা থেকে শুরু হয়?
৭. প্যকিং কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপগুলো কী কী?
৮. বড়  বড় প্রতিষ্ঠানে কীভাবে পণ্য বাছাই করে?
৯. কীসের সাহায্যে পণ্যের আকার আকৃতি নির্ধারন কর হয়?
১০. প্যাকিং হাউজের আসবাবগুলো কী কী?
১১.  প্যাকিং কাজের সমন্বয় সাধন করেন কে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্যাকিং শেডের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।
২. প্যাকিং শেড কতপ্রকার ও কী কী?
৩. প্যাকিং কার্যক্রমের ধারাবাহিক কাজগুলো কী কী? বাছাইকরণ না করলে কী হয়?
৪. প্যাকিং হাউজের যন্ত্রপাতিগুলো কী কী? বর্ণনা কর।
৫. গোলাকার ঘূর্ণায়মান টেবিল দিয়ে কী কাজ করা হয়?
৬. প্যাকিং কার্যক্রম চক্র বর্ণনা কর?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্যাকিং শেডের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ ও ভৌতকাঠামো বর্ণনা কর।
২. প্যাকিং হাউজের বিভিন্ন ধারাবাহিক কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৩. প্যাকিং হাউজের যন্ত্রপাতি, সুবিধা ও প্যাকিং কার্যক্রমের চক্র বর্ণনা কর।

# অধ্যায়-৭
# ফল ও সবজির মান অনুযায়ী শ্রেণিভুক্তকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

## ৭.১ তাজা ফল ও সবজির মান নির্ধারণ

টাটকা ফল ও সবজির মান নির্ধারণের সংজ্ঞা

সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস করে তা বাজারে বিক্রির জন্য উপযোগী করাই হল মান নির্ধারণ। এখানে পণ্যের গুনগত মান সতর্কতার সাথে নির্ধারিত হয় পণ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সময় ও দূরত্ব নির্বিশেষে অপরিবর্তিত থাকে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ইইসি) পৃষ্ঠপোষকতার ইউরোপে ১৯৪৯ সালে ফল ও সবজির আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ বিষয়ক নিয়মকানুনের সূচনা হয়। তখন থেকে ইউরোপের বাজারে অধিকাংশ ফল ও সবজির মান নির্ধারণের আইনকানুন চালু আছে। ঐ সব দেশের বাজারে এ আইন মানা বাধ্যতামূলক। ইউরোপীয় মানগুলো এখন সর্বজন স্বীকৃত এবং পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক বাজারে চালু আছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে ইইসি কর্তৃক প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড উপস্থাপন করা হলো :

ইইসি স্ট্যান্ডার্ড

চার শ্রেণির গুণসম্পন্ন পণ্যসামগ্রী ইইসি স্ট্যান্ডার্ডের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন-

১) এক্সট্রা ক্লাস

সর্বোৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন এবং বিশেষ ভাবে বাছাইকরা পণ্য।

২) ক্লাস এ-

ভালো গুণসম্পন্ন পণ্য, যাতে উল্লেখযোগ্য কোনো খুঁত নেই।

৩) ক্লাস বি-

যুক্তিসঙ্গতভাবে ভালো গুণসম্পন্ন, তবে দুই একটি ছোট-খাটো চাহিদার ঘাটতি আছে যেমন- আকার, রং, ছোট দাগ ইত্যাদি।

৪) ক্লাস সি-

বাজারজাত করার মতো, তবে, তা কোনো উন্নত শ্রেণিভুক্ত করার মতো গুণসম্পন্ন নয়।

বাংলাদেশের বাজারে টাটকা ফল ও সবজির কোনো স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড নেই। তবে এ দেশের বাজারে খুচরা বিক্রেতারা বিভিন্ন ফল ও সবজি সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে ক্রেতার কাছে উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ, ঘরোয়াভাবে এ দেশের চাষিরা বা ব্যবসায়ীরা ফল ও সবজির মান নির্ধারণের কাজটি করে থাকেন।

## ৭.২ উন্নত দেশের মান বা স্ট্যান্ডার্ডসমূহ উন্নয়নশীল দেশে প্রচলন

উন্নয়নশীল দেশসমূহে এখনও মান নির্ধারণ বিষয়ক নিয়ম-কানুন বাধ্যতামূলকভাবে চালু হয়নি। অনেক উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের নিয়ম-কানুন চালু করার চেষ্টা চলছে। অনেক দেশে চালু করেও আবার ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত কর হয়েছে :

১. রাস্তাঘাট এবং পরিবহন যানের অপ্রতুলতা।

২. বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সর্বস্তরের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ না থাকা।

৩. অনুন্নত আর্থিক অবস্থা; বিশেষ করে ভোক্তাদের কম ক্রয় ক্ষমতা।
৪. জনগনের সচেতনতার অভাব।
৫. সরকারি উদ্যোগের অভাব।

উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান বিশাল জনগোষ্ঠীর ফল ও শাকসবজির চাহিদা মেটানো জন্য উৎপাদিত পণের গুণগত মান রক্ষা করে বাজারজাত করার জন্য সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্যের মান রক্ষা করার নিয়ম-কানুনের প্রতিও মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশেও ফল ও সবজির আনুষ্ঠানিক মান নির্ধারণ বিষয়ক নিয়ম-কানুন মেনে চলার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে উন্নয়নশীল দেশেও মান নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধি বিধান সফলতার সাতে কার্যকর হতে পারে :

১. দেশে প্রথমে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উন্নত বিকল্প নিয়মকানুন চালু করা এবং ব্যবসায়ীদের এ কার্যক্রমে জড়িত করা।
২. মান নির্ধারণের উন্নত পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
৩. উন্নত মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো আইনের আওতায় নিয়ে আসা ও তা কার্যকর করা।
৪. উন্নত পদ্ধতিগুলো প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা। এ কাজে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করা। তাছাড়া হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টার পোস্টারের সাহয্যে দেখানো।
৫. উন্নত পদ্ধতিগুলো ধাপে ধাপে চালু করা। উন্নত রীতিনীতি চালু করার সময় দুটো ধাপের মাঝে যথেষ্ট সময় দেওয়া প্রয়োজন, যাতে ব্যবসায়ী ও ভোক্তা উভয়েই আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং পরিশেষে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে।

উন্নত দেশসমূহ

উন্নত দেশে ফল ও সবজির ঘরোয়া মান নির্ধারণ নিয়মকানুন বহু দিন থেকে চালু থাকলেও সরকার অনুমোদিত মান নির্ধারণ বিধি বিধান চালু হয়েছে অল্পদিন আগে। আমেরিকায় প্রথম আলুর শ্রেনিবিন্যাস সংক্রান্ত মান নির্ধারণ প্রথার উৎপত্তি হয় ১৯১৭ সালে। বর্তমানে টাটকা পণ্যের জন্য ১৫০টি আমেরিকান মান নির্ধারণী এবং কমপক্ষে ৬ বা ৭টি গুণগত মানের শ্রেণিবিন্যাস রীতিনীতি রয়েছে। এছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যেখানে প্রচুর পণ্য উৎপন্ন হয় সেখানে নিজস্ব মান নির্ধারণ আইন-কানুন রয়েছে। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যসামগ্রীর বেলায় ঐসব আইন-কানুন মেনে চলা ঐচ্ছিক, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়।

অনেক উন্নত দেশের স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউটগুলো পণ্যের মান নির্ধারণ রীতিনীতি প্রণয়ন করেছে যা অভ্যন্তরীণ বাজারে ব্যবসার জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মেনে চলা হচ্ছে। তবে ফল ও সবজির বেলায় জাতীয় মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (OECOD) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রবণতা বাড়ছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি নতুন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে –

ক) সর্বোচ্চ রেসিডিউ মাত্রা

২০০৮ সাল হতে ই.ইউ. (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) বাজারে একই (MRL) (ম্যাক্সিম রেসিডিউ লেভেল) নিয়ম চালু করা হয়েছে। কিন্তু সুপার মার্কেট ও চেইনশপগুলো তাদের জন্য নিজস্ব নিয়ম চালু করেছে তা হলো কোনো কৃষিপণ্যে সর্বোচ্চ রেসিডিউ-এর মাত্রা CODEX এর নিয়মানুযায়ী রেখে সেই পণ্য বিক্রির জন্য যোগ্য হবে।

খ) ট্রাকিং অ্যান্ড ট্রেসিং

পণ্যের উৎপত্তি স্থান হতে ভোক্তা পর্যন্ত পণ্যের পরিচিতি আবশ্যকীয় শর্ত। এই শর্ত অনুযায়ী পণ্যের উৎপত্তি স্থান হতে যাত্রাপথের যে কোনো স্থানকে শনাক্ত করা যাবে যদি কোন সমস্যা দেখা যায়।

গ) পণ্যের লেবেলিং

পণ্য লেবেলিং-এর আবশ্যকতা দিন দিন বাড়ছে। কী ধরনের পণ্য, কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে কি না, এমনকি কোন ভাষায় লেখা থাকতে পারে সেটাও নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে।

ঘ) ট্যারিফ এবং কোটা

তাজা ফল ও শাক-সবজি ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করলে সেগুলোর জন্য আমদানি শুল্ক দিতে হয়। দিন দিনই এই শুল্ক, ট্যারিফ ও কোটার বাধ্যবাধকতা বাড়ছে।

৭.৩ বাছাই ও গ্রেডিং

টাটকা ফল ও সবজি মাঠ থেকে সংগ্রহের পর বাছাই করতে হয়। এ সময়ে সংগৃহীত পণ্য থেকে অপুষ্ট, পোকাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, বিকৃত এবং অতিরিক্ত পাকা পণ্যগুলোকে বেছে আলাদা করতে হয়। বাছাইকৃত পণ্যগুলোকে সাধারণত বাহ্যিক চেহারা দেখে এবং সম্ভব হলে মাপের মাধ্যমে গ্রেডিং বা শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। বাঁছাইকরণ ও গ্রেডিং-এর কাজ একই সাথে করা যেতে পারে। আমাদের দেশের চাষিরা অজ্ঞতার কারণে এ কাজটি করতে অনীহা প্রকাশ করেন। এতে কিন্তু তাদের লাভ হয় না বরং লোকসানই হয়। কারণ ফড়িয়া বা ব্যাপারিরা এ ধরনের মিশ্রিত লটের সঠিক মূল্য দিতে চান না। তা ছাড়া মিশ্রিত ফল একই লটে রাখলে অতিরিক্ত পাকা ফল থেকে নির্গত ইথাইলিন গ্যাস অতিঅল্প সময়ের মধ্যে অর্ধপক্ব ফলগুলোকে পাকিয়ে ফেলে। এতে পুরো লটের ফলই পেকে নরম হয়ে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

উন্নত দেশে বাছাই ও গ্রেডিং-এর কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করা হয়। সেসব দেশে যেসব বিষয়ের ভিত্তিতে সাধারণত পণ্যগুলোকে গ্রেডিং করা হয় তা হলো :

(১) পণ্যের আকার, আকৃতি, পরিপক্বতার অবস্থা ও রঙ।
(২) পণ্যের মিষ্ট রসে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থসমূহের (TSS) পরিমাণ এবং
(৩) পণ্যের গায়ে দাগ, পচা ও অন্যান্য ত্রুটি গ্রহণযোগ্য পর্যায় পর্যন্ত।

কয়েকটি ফল ও সবজি পণ্যের বাছাইও গ্রেডিং বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো-

| ক্রমিক নং | ফল ও সবজির নাম | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| (১) | আম | ঝাল আচারের জন্য আম হবে এমন পরিপক্ব যা বঁটি দিয়ে আঁটিসহ কাটা যায়। ফাটা, আঘাতপ্রাপ্ত, অপরিপক্ব বা ঝরে পড়া আম আচারের জন্য ভালো নয়। আঁশযুক্ত আম আচারের জন্য উত্তম। মিষ্টি চাটনির জন্য আম সম্পূর্ণ পরিপক্ব হবে। চাটনির জন্য আমের ত্বক ফেলে দিতে হবে। আমের রস ও পাল্প হতে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরির জন্য রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত আম ভালো ফল দেয়। |
| (২) | জলপাই | আচারের জন্য জলপাই হবে গাঢ় সবুজ, পরিপক্ব, দাগ বা ক্ষতমুক্ত আস্ত বা কেটে সংরক্ষণ করতে হয়। |
| (৪) | পেয়ারা | বড় বা মাঝারি আকারের পেয়ারা নির্বাচন করতে হয়। অপরিপক্ব অথবা বেশি পাকা পেয়ারা বাদ দেওয়া হয়। দেখা গেছে স্বরূপকাঠি ও সিলেটে উৎপাদিত পেয়ারা হতে উন্নত ধরনের জেলী ও রস উৎপাদন করা সম্ভব। |
| (৫) | টমেটো | সস, কেচাপ, ককটেল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত টমেটো হবে গাছ পাকা। লাল টমেটো কোন অংশ সবুজ বা হলুদ থাকবে না। কোন অংশ ক্ষত বা জীবাণু আক্রান্ত হবে না। গাছ থেকে টমেটো তোলার সময় রসের এসিডিটি হবে প্রায় ০.৮% এবং টি.এস.এস. হবে ৫% বা তার অধিক। |
| (৬) | রসুন | বড় কোয়া বিশিষ্ট পরিপক্ব রসুন নির্বাচন করা দরকার। রসুন যতদূর সম্ভব বেশি করে শুকিয়ে পলিথিনের ব্যাগে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ভেজা রসুনের তুলনায় শুকনা রসুন আচার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে আচারের সংরক্ষণকাল ও অন্যান্য গুণগত মান অনেক উন্নত হবে। |
| (৭) | কাঁচামরিচ | বড় আকারের কাঁচা মরিচ ব্যবহার করা হয়। তবে মরিচ অবশ্যই পরিপক্ব হতে হবে। অপরিপক্ব মরিচ দিয়ে আচার বানালে আচারের স্বাদ ও ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। |
| (৮) | মশলা | যেসব মশলার ঘ্রাণ তীব্র অথবা সুমিষ্ট সেগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়। তবে সব মসলাই পরিপক্ব ও সুষ্ঠভাবে শুষ্ক হতে হয়। |

### ৭.৪ লেবেল যুক্তকরণ

উৎপাদনকারী বা যিনি পণ্য প্যাকিং করবেন তিনিই প্যাকেটে লেবেল যুক্ত করবেন। তবে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীরা খোলা পণ্য ক্রয় করে প্যাকিং করলে লেবেল যুক্ত করার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়। লেবেলে পণ্যের যাবতীয় তথ্য যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। এতে, পণ্য বিক্রি ও হস্তান্তর কাজ সহজ হয়। তাছাড়া কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা নিষ্পত্তি করা সহজ হয়। আমাদের দেশীয় আইনে BSTI এর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উৎপাদনকারী ফল ও সবজি হতে যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরি করেন তা BSTI হতে অনুমোদন করে নিয়ে তা লেবেলে উল্লেখ করে থাকেন। তা না হলে উক্ত পণ্য বাজারে আসতে পারে না। অনেক প্রতিষ্ঠান জাল BSTI -এর সিল দিয়ে পণ্য বাজারজাত করে থাকে এবং ধরা পড়লে প্রচলিত আইন অনুযায়ী জেল ও জরিমানা হয়ে থাকে।

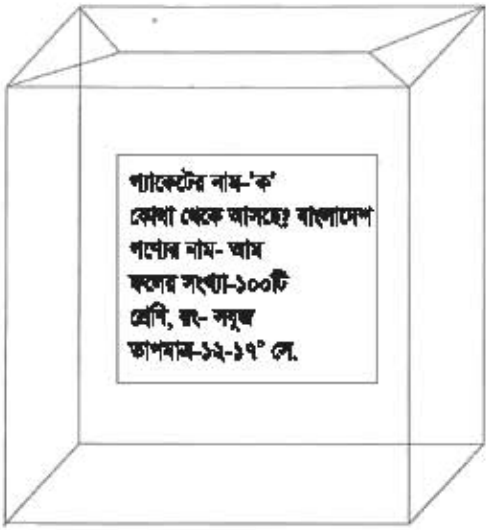


চিত্রঃ প্যাকিং বাক্সে লেবেলিং এর নমুনা

### ৭.৫ পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শকের ভূমিকা

ফল ও সবজি সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের যে কোনো পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তাতে মান কমে যায়। তাই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে সরকারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এজন্য প্যাকিং হাউজ, শিপিং-এর স্থান এবং পাইকারি বাজারগুলোতে সরকারি পরিদর্শক বা ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা প্রয়োজন। পরিদর্শকগণ নমুনা পরীক্ষা শেষে আমদানিকারক দেশের মানের ভিত্তিতে পরিদর্শন সার্টিফিকেট দেবেন।

পণ্যসামগ্রী আমদানিকারক দেশে স্থল বন্দর, নৌ-বন্দর ও বিমান বন্দরে পৌঁছানোর পর ঐ দেশের পরিদর্শকগণ পুনরায় এসব পণ্যসামগ্রী পরীক্ষা করবেন। এক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালা ও উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন কার্যকর করা হয়। আমদানিকৃত পণ্য যদি নির্ধারিত সরকারি মানসম্পন্ন না হয় বা কোনো মারাত্মক রোগের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পরিত্যক্ত হয়। এসব পরিত্যক্ত পণ্য রপ্তানি-কারক বা শিপারের খরচেই সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ধ্বংস করতে হয়।

## অনুশীলনী -৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মান নির্ধারণ বলতে কী বুঝায়?
২. কখন এবং কীভাবে পণের মান নির্ধারণ বিষয়ক নিয়ম-কানুনের সূচনা হয়?
৩. EEC স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কয় শ্রেণির পণ্য বাজারে পাওয়া যায়?
৪. বাংলাদেশের চাষিরা ফল ও সবজির মান নির্ধারণের কাজটি কীভাবে করেন?
৫. উন্নয়নশীল দেশ এই মান নির্ধারণে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ কী ?
৬. কোন ধরনের রসুন ব্যবহৃত হলে আচারের মান উন্নত হবে?
৭. আমেরিকায় প্রথম কত সালে আলুর শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত মান নির্ধারণের উৎপত্তি হয়?
৮. বর্তমানে টাটকা পণ্যের জন্য কতটি আমেরিকান নির্ধারণী মান রয়েছে?
৯. OECOD বলতে কী বুঝায়?
১০. MRL বলতে কী বুঝায়?
১১. ইউরোপীয় সুপার মার্কেট ও চেইন শপে কৃষি পণের MRL কত?
১২. বাছাই ও গ্রেডিং না করার ফলে আমাদের চাষিদের কেন লোকসান হয়?
১৩. উন্নত দেশে কীসের উপর ভিত্তি করে গ্রেডিং করা হয়?
১৪. আঁশযুক্ত আম দিয়ে কী তৈরি করা উত্তম?
১৫. উন্নত মানের জেলি ও রস কোন এলাকার পেয়ারা হতে পাওয়া যায়?
১৬. সস, কেচাপ ও ককটেল তৈরির জন্য কীরূপ টমেটো লাগে?
১৭. কোন কোন এলাকায় সরকারি ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা প্রয়োজন?
১৮. সরকারি পরিদর্শকের কাজ কী?
১৯. উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন বলতে কী বুঝায়?
২০. পরিত্যক্ত পণ্য কিভাবে ধ্বংস করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. EEC কর্তৃক পণ্যের স্ট্যান্ডার্ডের বর্ণনা দাও।
২. উন্নয়নশীল দেশে মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যার্থ হওয়ার কারণ কী?
৩. কী কী পদক্ষেপ নিলে মান নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সফল করা যায়?
৪. মান নির্ধারণের নতুন ৪টি প্রদক্ষেপ কী কী?
৫. সর্বোচ্চ রেসিডিউ মাত্রার নীতিটি কী?
৬. আম বাছাই ও গ্রেডিং-এর বৈশিষ্ট্য কী?
৭. টমেটো ও রসুন গ্রেডিং-এর বৈশিষ্ট্য কী ?
৮. পণ্যের মান নিয়েন্ত্রণে পরিদশকের ভূমিকা লেখ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মান নির্ধারণ কী? EEC এর স্ট্যান্ডার্ড বর্ণনা কর। উন্নয়নশীল দেশ ও উন্নত দেশের মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. বাছাই ও গ্রেডিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী? ৩টি ফল ও ২টি সবজির বাছাই ও গ্রেডিং-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

# অধ্যায় ৮
# ফল ও সবজি সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিতরণ

## ফল ও সবজি রক্ষণাবেক্ষণ

ফল ও সবজি মাঠ থেকে সংগ্রহ করার পর পরই বাজারজাত করা যায় না। এগুলোকে সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। পণ্যগুলোকে প্যাকিং করা হয়। তার পর পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হয়। অনেক সময় যানবাহন না পাওয়ার কারণে দূরবর্তী বিক্রয় স্থানে সাথে সাথে নেয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় যাতে পরে বিক্রি করা যায়। তাছাড়া, মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহের সাথে সাথে খরিদ্দার পাওনা না গেলেও পণ্য সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশের চট্টগ্রাম পাহাড়িয়া এলাকার গহিন অরণ্য এলাকায় অনেক ফল-ফলাদি জন্মে যেমন- কলা, লেবু, আনারস, কমলা, পেঁপে ইত্যাদি। এ সকল ফল ও সবজি শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কারণে বেশিরভাগ অংশই পচে নষ্ট হয় এবং চাষীরা ন্যায্যমূল্য পায় না।

## ৮.১ সংরক্ষণের আগে করণীয় :

ফল ও সবজি সংরক্ষণের পূর্বে যে সকল কাজগুলো করণীয় তা হলো–

ক) পরিষ্কার ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ
খ) শীতলীকরণ
গ) কিউরিং
ঘ) তেল মাখানো
ঙ) রেডিয়েশন
চ) প্যাকেজিং

## পরিষ্কার ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ :

ফল ও সবজির অপ্রয়োজনীর অংশ কেটে বাদ দিতে হয়। পণ্যের গায়ে লেগে থাকা ধুলাবালি, আঠা, কষ ইত্যাদি পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হয়। মাটির নিচের সবজি হলে তা বড় পাত্রে পানি নিয়ে তাতে ডুবিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করতে হয়। পণ্য পরিষ্কারের পর রোগাক্রান্ত, পোকা খাওয়া, অতিরিক্ত পাকা, অপরিপক্ব, আঘাতপ্রাপ্ত পণ্য বাদ দিতে হয়। অন্যথায় পচন ধরতে পারে। তারপর আকার, আকৃতি, পুষ্টতা ও রং অনুযায়ী পণ্যকে শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিং করা হয়।

## শীতলীকরণ :

ফল ও সবজির মান নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য শীতলীকরণ প্রয়োজন। পণ্য মাঠ হতে সংগ্রহের পরই এ কাজটি করা উচিত। এজন্য পণ্যসামগ্রী ঠাণ্ডা ছায়াযুক্ত স্থানে যেখানে বাতাস চলাচল করে সেখানে রেখে দিতে হয়। এতে ফসলের সঞ্চিত তাপ বা ফিল্ড হিট কমে যায় এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। ঠাণ্ডা করার কাজটি কয়েকভাবে করা যায়। যেমন- ঠাণ্ডা ভেজা বাতাসের সাহায্যে, ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে বা ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে অথবা আংশিক বায়ুশূন্য ঘরে রেখে। আংশিক বায়ুশূন্য ঘরে রক্ষিত সবজিতে ছিটানো পানি খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সবজি থেকে গ্রহণের ফলে সবজির তাপমাত্রা কমে যায়। পত্রবহুল সবজির জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।

## কিউরিং : (Curing)

ফসল সংগ্রহের পর পরই কিউরিং বা শুকানোর কাজ করতে হয়। আলু, মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি সবজিতে কিউরিং করা প্রয়োজন। আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে এমন জায়গায় ২০°C তাপমাত্রায় এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৮৫% হলে ২/৩ দিন রেখে দিলে এ সব পণ্যের কিউরিং সম্পন্ন হয়। ফলে সংরক্ষণকালে রোগজীবাণুর আক্রমণ হয় না। মিষ্টি আলু কিউরিং-এর জন্য ২৮-৩০°C সেলসিয়াস তাপমাত্রা সর্বোত্তম। পেঁয়াজ মাঠে ফেলে রেখে ২-৩ দিন কিউরিং করলে ক্ষতস্থানে শুকিয়ে যায়। মাঠে এ কাজটি করতে না পারলে ৪০°C তাপমাত্রা সম্পন্ন ঘরে ২ দিন রাখলে কিউরিং এর কাজ সম্পন্ন হয়। কিউরিং দুইভাবে করা যায়।

যথা :

(ক) মাঠে কিউরিং

(খ) ঘরে কিউরিং

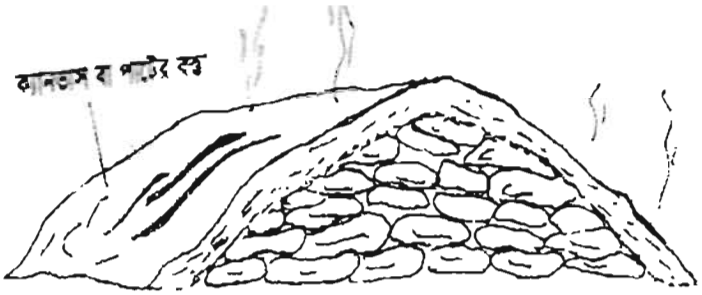


চিত্রঃ মেটে আলু কিউরিং

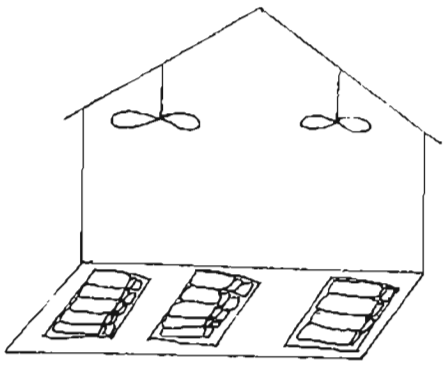

চিত্র : ঘরের মেঝের উপর ত্রিপল বিছিয়ে সিলিং ফ্যানের নিচে পণ্যের বস্তা কিউরিং

### মাঠে কিউরিং

আলু, মিষ্টি আলু, মেটে আলু ও অন্যান্য টিউবার বা কন্দ জাতীয় পণ্য ছায়াযুক্ত স্থানে গাদা করে রেখে কিউরিং করা যায়। এসব পণ্যের গাদায় খড় বা কাটা ঘাস তাপ অপরিবাহী দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিউরিং -এর জন্য উচ্চ তাপমাত্রা ও বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। খড় বা ঘাসের স্তর পন্যের গা থেকে উৎপাদিত তাপ ও জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে সমর্থ হয়। খড় বা ঘাসের স্তরের উপর ক্যানভাস/ত্রিপল/পাটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই প্লাস্টিকের কভার দেওয়া উচিত নয়। এভাবে পণ্যের গাদা চার দিনের মতো রেখে দিতে হয়। কন্দাল ফসল তোলার ৭/৮ দিন পূর্বে মাঠের গাছ কেটে দিলে মাটির নিচের আলুর কিউরিং হয় যাকে হাম কিলিং বা হাম পুলিং বলে। এতে আলু চামড়া/ছাল শক্ত ও আঘাত সহ্য করার কিছুটা ক্ষমতা লাভ করে এবং হিমাগারের সমস্যা কম হয়।

## ঘরে কিউরিং

প্রখর সূর্যতাপ ও বায়ুর আর্দ্রতা যখন বেশি এবং বায়ুপ্রবাহ কম থাকে তখন শেডের ভিতর বাতাস চলাচল সম্বলিত স্থানে পণ্য কিউরিং করা হয়। মেঝেতে ত্রিপল বিছিয়ে সিলিং ফ্যানের নিচে পণ্যভর্তি বস্তা গাদা করে কিউরিং করা হয়।

কিউরিং কক্ষে তাপ সরবরাহের জন্য কক্ষের মেঝের কাছ দিয়ে তাপ প্রবেশ করা হয়। মেঝের ওপর পণ্যভর্তি বস্তার কাছাকাছি জায়গায় হিটার বসানো হয়। বাহির থেকেও কক্ষের ভিতরে তাপ প্রবেশ করানো যেতে পারে। ঘরের মেঝে ভিজিয়ে দিয়ে কক্ষের বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ানো যেতে পারে।

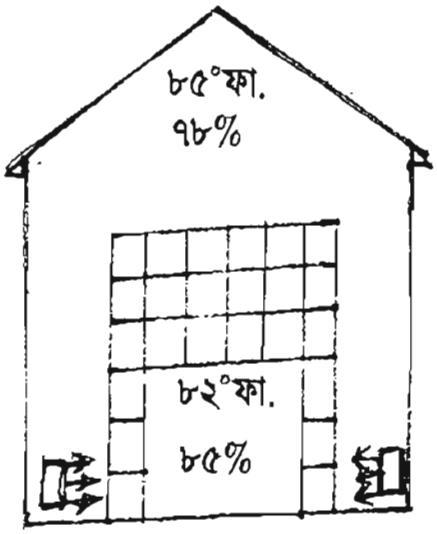


চিত্র : মেঝের নিকট হিটারবসিয়ে গরম বায়ুর সাহায্যে কিউরিং

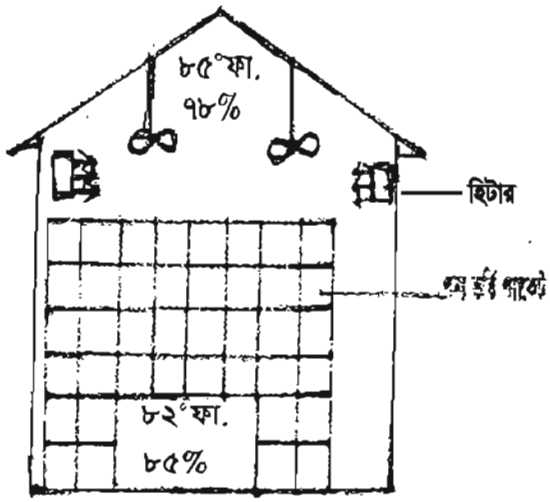


চিত্র: সিলিং-এর কাছাকাছি স্থানে হিটার বসিয়ে কিউরিং

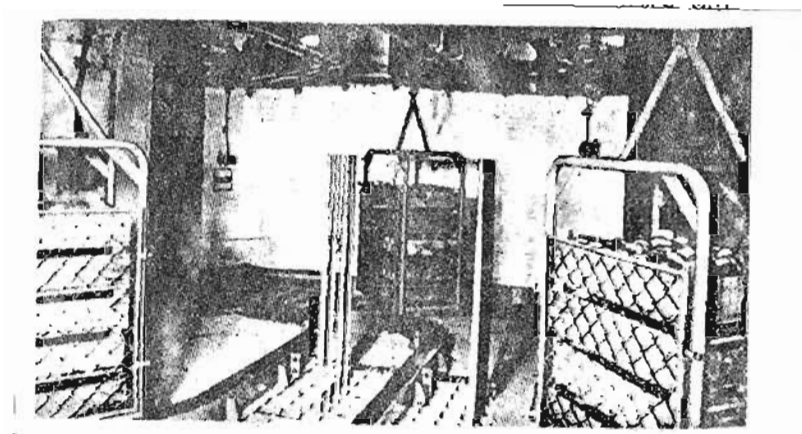

চিত্র : আলুর রেডিয়েশনকরণ

কক্ষের সিলিং-এর কাছাকাছি স্থানেও হিটার স্থাপন করা যেতে পারে। কক্ষের সব জায়গায় সমানভাবে তাপ পাওয়ার জন্য সিলিং ফ্যান লাগানো যেতে পারে।

২০২০

### তেল মাখানো

ফল ও সবজিতে তেল মাখালে সংরক্ষণকালীন সময়ে পণ্যের শরীর থেকে পানি বের হওয়ার হার কমে যায়। এতে সবজির সজীবতা ও উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং বাজারমূল্য ভালো পাওয়া যায়। এ কাজে সরিষার তেল, নারিকেল তেল বা সয়াবিন তেল ব্যবহার করা হয়। শসা, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি সবজিতে তেল মাখানো যায়।

### রেডিয়েশন

আলু ও পেঁয়াজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এতে সংরক্ষিত সবজি বীজের চারা গজানো বন্ধ হয়ে যায়, রোগ জীবণু মারা যায় ও রোগজীবাণুর আক্রমণ হয় না। গামা রশ্মির পরিমাণ বেশি বা কম হলে ক্ষতি হতে পারে।

### প্যাকেজিং

ফল ও সবজি পলিথিন ব্যাগে রাখা হলে সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। এসব প্যাকেটের গায়ে সামান্য ছিদ্র রাখা হলে শ্বসনজনিত পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাবে এবং ভিতরে কোনো পানি জমবে না। আম, কলা, টমেটো, বেগুন, বাঁধাকপি প্রভৃতি ফসল এভাবে প্যাকেজিং করে রাখা যায়।

## ৮.২ সংরক্ষণ পদ্ধতি

ফল ও সবজি সংগ্রহের পর একত্রীতকরণ, পরিষ্কারকরণ এবং প্যাকেজিং এরপর সাময়িক সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হতে পারে। ফল ও সবজি ঠাণ্ডা বাতাসের সাহায্যে শীতল করে সংরক্ষণ করা হয়। ঠাণ্ডা বাতাসের উৎস অনুযায়ী সংরক্ষণ পদ্ধতি দুই প্রকার।

যথা– (ক) বাতাস চলাচলযুক্ত পদ্ধতি
(খ) হিমায়িত পদ্ধতি

### বাতাস চলাচলযুক্ত পদ্ধতি

ফল ও সবজি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। রাত্রিকালীন ঠাণ্ডা বাতাস চলাচল করতে পারে এমন একটি ঘর বেছে নিতে হয়। ঘরটি ছায়াযুক্ত স্থানে হলে ভালো হয়। ঘরের দরজা-জানালা এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে প্রবাহিত বাতাস সরাসরি ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

বাঁশ, খড় ও কাদামাটি দিয়ে ঘরের দেয়াল তৈরি করতে হবে যাতে রোদের তাপ ঘরে না লাগে। যেহেতু ধাতু নির্মিত দ্রব্যাদি তাপ গ্রহণ ও চলাচলে সাহায্য করে, সেজন্য গুদামঘরে টিনের বেড়া দেয়া ঠিক নয়। ফল ও সবজি এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়, যাতে বাতাস চলাচলে কোনো বাধা না পায়। সেজন্য পণ্যগুলোকে এলোপাতাড়ি না রেখে কোনো পাত্রে ভরে ব্যাগে বা শেলফে সাজিয়ে রাখতে হয়। আম, পেঁপে, কলা, পেয়ারা, আলু, পেঁয়াজ, মিষ্টি আলু, গাজর, বাঁধাকপি, কুমড়া প্রভৃতি এ ধরনের ঘরে সংরক্ষণ করা যায়।

### হিমায়িত পদ্ধতি

ফল ও সবজি অপেক্ষাকৃত বেশি সময় সংরক্ষণ করতে হলে ঠাণ্ডা ঘরে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা হয়। আমাদের দেশে আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপায়ে ঘরের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখা হয়।

চিত্র : আলু সংরক্ষণ (হিমাগার)

### ৮.৩ পণ্য পরিবহনে উঠানো, নামানো ও বিতরণ

ফল ও সবজি সংগ্রহের পর পণ্য পরিষ্কার ও একত্রীকরণ, বাছাইকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, শীতলীকরণ, কিউরিং, মোম মাখানো. রেডিয়েশন. প্যাকেজিং ও অস্থায়ী সংরক্ষণের পর প্রয়োজন হয় পণ্য পরিবহন ও বিতরণ প্রক্রিয়ার। আমাদের দেশে সাধারণত সড়ক, রেল ও নৌ পথে ফল ও সবজি পরিবহন করা হয়। ফল ও সবজি পরিবহন যানে ওঠানো, নামানো ও সাজানো কাজটি খুব সাবধানতার সাথে করতে হয় যাতে গাড়ির ঝাঁকিতে আঘাত না পায়। পরিবহন যানে ওঠানো পর প্যাকেটগুলো স্তূপাকারে রাখা হয়। স্তূপের উচ্চতা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হয়, যাতে নিচের স্তরের প্যাকেটের পণ্যসামগ্রী উপরের গুলোর চাপে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্যাকেট স্তূপাকারে রাখার পর সেগুলো বাহনের হুকের সাথে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়। এতে গাড়ি চলার সময়ে নড়াচড়ায় পণ্য নষ্ট হয় না। নৌপথে পণ্য ইঞ্জিনের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে স্তূপ আকারে সাজাতে হয়। প্যাকেট বা বস্তা সাজিয়ে রাখার পর বাতাস চলাচল করার উপযোগী একটি সাদা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ত্রিপলটি যেন সরাসরি প্যাকেটের গায়ে না লাগে।

চিত্র : পিকআপে পণ্য পরিবহন

## সড়কপথে পরিবহন

আমাদের দেশে বেশির ভাগ কাঁচামাল বা পণ্য সড়কপথেই পরিবহন করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে ইদানীং সড়ক পথের উন্নয়ন হওয়ায় পণ্য দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব। পণ্য গাড়িতে একবার বোঝাই করেই খুচরা বাজারে পৌঁছানো সম্ভব। আবার বিদেশে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দরে পণ্য পৌঁছানোর জন্য সড়ক পথ ব্যবহৃত হয়। তবে খারাপ রাস্তার ঝাঁকুনিতে পণ্যের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

## পরিববহন পথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা

চলন্ত গাড়িতে ফল ও সবজিকে যতদূর সম্ভব ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করতে হয়। হিমায়িত ব্যবস্থার অভাবে রাতে পরিবহন করা ভালো। পরিবহনকালে পণ্যসামগ্রী ঢেকে রাখতে হয় এবং বাহিরের আবহাওয়ার প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হয়। পণসামগ্রী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হয় এবং পৌঁছানো মাত্র প্যাকেট খুলে বাতাসে সেগুলো রাখতে হয়। ট্রাক বা গাড়ি চলার সময় যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা হলো–

১. ট্রাকে প্রেরণের জন্য পণ্য সুন্দরভাবে সাজানো।
২. ট্রাকের সাসপেনশন বা ঝাঁকুনি পরীক্ষা করা।
৩. খারাপ রাস্তা পরিহার করা।
৪. পণ্যের ভার সহনশীল শক্ত প্যাকেট ব্যবহার।
৫. একসাথে বেশি উঁচু করে পণ্য না সাজানো।

## সড়কপথে পরিবহনকালে পণ্যের সম্ভাব্য ক্ষতি ও তার প্রতিকার

সড়কপথে পণ্য পরিবহনকালে পণ্যের গায়ে আঘাতজনিত ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এগুলোর মধ্যে অতিমাত্রায় তাপ সৃষ্টি হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব ক্ষতি এড়ানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে হয়।

১. পরিবহন যানে ফল ও সবজি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ওঠানো এবং নামানো।
২. একজনের পরিবর্তে দু'জন মিলে ২০-২৫ কেজি ওজনের প্যাকেটগুলো ওঠানো এবং নামানোর কাজ করা।
৩. পরিবহনযানে পণ্যসামগ্রী খুব আঁটসাঁট এবং শক্ত করে বাঁধা যাতে তা নাড়াচাড়া করতে না পারে।
৪. প্যাকেটগুলোর ওজন সব সময় সমান রাখার চেষ্টা করা ।
৫. প্যাকেটগুলো এমনভাবে সাজানো যাতে নিচেরগুলো কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে উপরেরগুলোকে ধরে রাখতে পারে।

৬. পণ্যসামগ্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

৭. গাড়ির চালককে অত্যন্ত পারদর্শী হতে হয়। খারাপ রাস্তায় গাড়ি চালাবার সময় তাকে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে ঝাঁকুনিতে পণ্য নষ্ট না হয়।

৮. ফল ও সবজি পরিবহনের জন্য বিশেষ ধরনের রেফ্রিজারেটেড ট্রাক বা হিমায়িত গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

৯. নতুন পরিবহন যানে অবশ্যই এয়ার সাসপেনশন থাকা উচিত। পুরাতন গাড়ির অ্যাকসেলগুলোতে এয়ার সাসপেনশন লাগিয়ে নিতে হবে। এ ব্যবস্থা নিলে পরিবহনকৃত ফলের আঘাতজনিত ক্ষতি ৫০% কমে যাবে।

১০. ফেরিপথে পারাপার করতে হলে ফল ও সবজির ট্রাক বা যানবাহনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১১. ফল ও সবজির ট্রাক বা যাণবাহনকে সকল প্রকার হরতাল বা রাস্তাপথের প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখতে হবে।

## সড়কপথে উন্মুক্ত পরিবহন

উন্মুক্ত পরিবহন যানে বা ট্রাকে পণ্য ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। এরূপ যানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। এজন্য পণ্য আলাদা পদ্ধতিতে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হয় এবং ট্রাকের সামনের দিকে ধাতুর তৈরি উইন্ড ক্যাচার (Wind Catcher) বা বায়ু ধারক লাগানো হয়। এর কাজ হলো গাড়ি চলার সময় সামনের বাতাসকে ধরে গাড়ির ভিতরে পণ্যের মধ্যে ঢুকানো এবং গাড়ির পিছন দিয়ে বাতাস বের করে দেয়া।

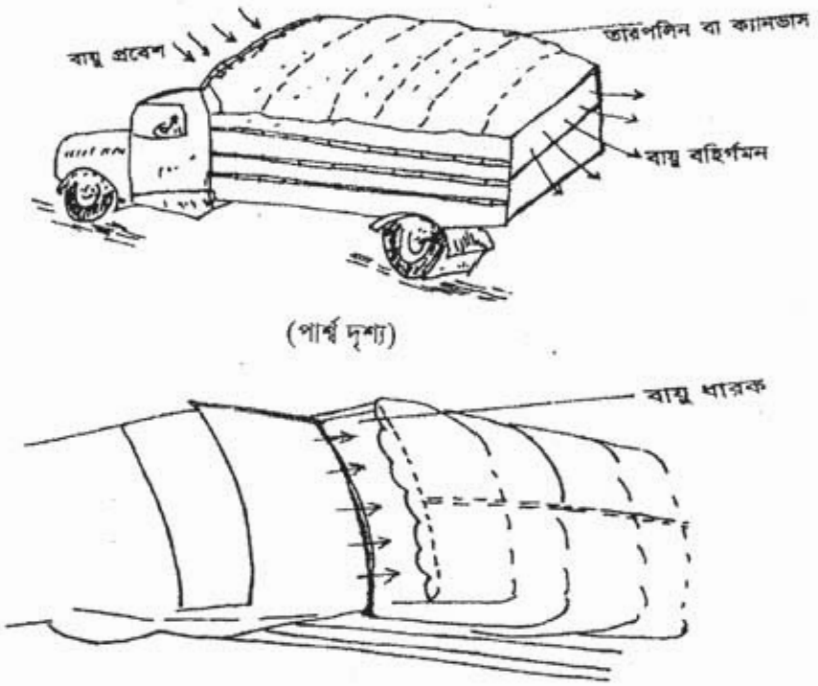


চিত্রঃ ট্রাকে পণ্য পরিবহন পার্শ্ব দৃশ্য ও সম্মুখ দৃশ্য

## পরিবহন যানে পণ্য সাজানো

পণ্যের কার্টনগুলোকে এমনভাবে সজ্জাতে হবে যাতে প্রচুর পরিমাণ বাতাস পণ্যের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে। পণ্যের কার্টনগুলো যাতে গাড়ির ফ্লোর বা পাটাতনের সংস্পর্শে না আসতে পারে সেজন্য ট্রাকের ফ্লোরে খড় গাদা করে বিছিয়ে দিতে হয়।

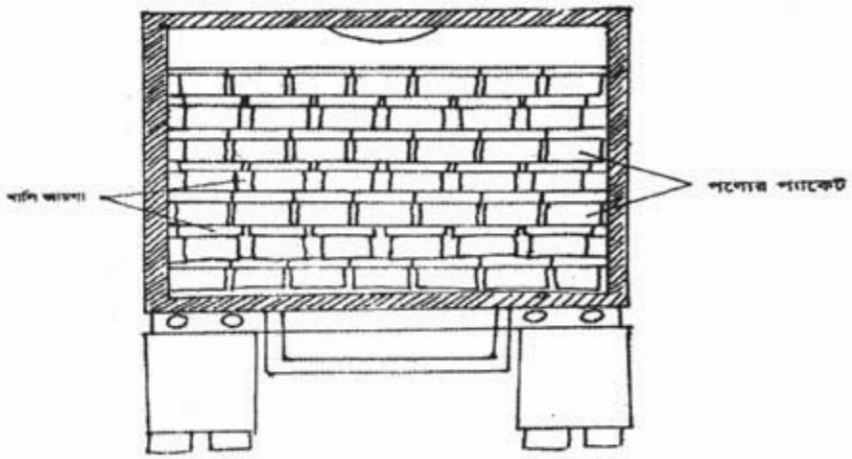


চিত্র : ট্রাকে সম আকারের কার্টন আড়াআড়িভাবে সাজানোর ব্যবস্থা

পণ্যের বাক্সগুলোকে কবুতরের খোপ পদ্ধতিতে এমনভাবে সাজনো হয় যেখানে পর্যায়ক্রমে পণ্যের বাক্স ও খালি জায়গা থাকে (চিত্র)। ফল বা সবজি জাতীয় পণ্য ট্রাক বা পিকআপে খোলা অবস্থায় বহন করলে পণ্যের নিচেও খড় দিয়ে সাজাতে হয়।

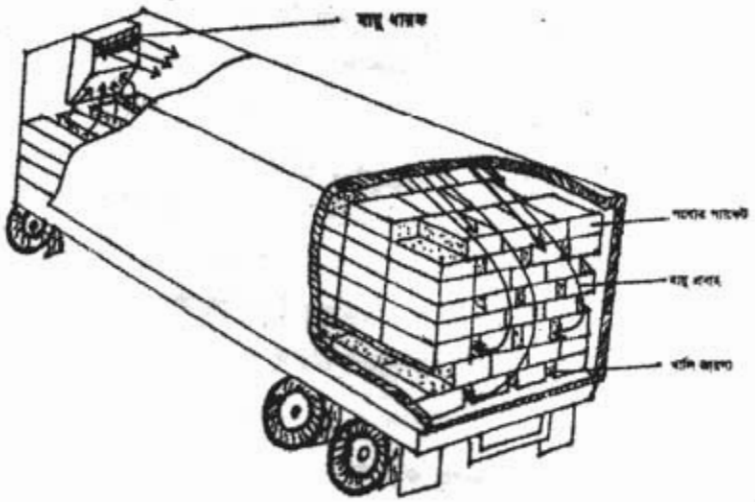


চিত্র : কবুতরের খোপ পদ্ধতিতেত সাজানো পণ্য

চিত্র : খোলা ট্রাকে ফল বা সবজি সাজানো

## ৮.৪ বিভিন্ন পথে পরিবহন

আমাদের দেশে সাধারণত কৃষিজাত পণ্য বিভিন্ন পরিবহনে করা হয়ে থাকে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো:

### রেলপথে পরিবহন

দেশের অভ্যন্তরে রেলপথে পচনশীল কাঁচা পণ্য তাড়াতাড়ি সরবরাহ করা সম্ভব। উৎপাদিত এলাকা থেকে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে ও কম খরচে এসব পণ্য রাজধানীর বড় বাজারগুলোতে পৌঁছানো যায়। রেলপথে পন্য পরিবহন অনেকটা ঝাঁকুনিবিহীন এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ। তবে পণ্য একাধিকবার উঠানো-নামানো প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া পণ্য পরিবহনকালে করণীয় অন্যান্য কার্যাবলি অনেকটা সড়ক অনুরূপ। বাংলাদেশের, কিছু গুরুত্বপূর্ণ জেলায় রেলপথ না থাকায় পণ্য পরিবহনে বেশ অসুবিধা হয়। যেমন- বরিশাল, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান।

### নদীপথে পরিবহন

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ফল ও সবজি পরিবহনে নদীপথে আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কম খরচে এবং নিরাপদে পণ্য পরিবহনের জন্য নদীপথ সড়ক উপযোগী। ঝাঁকুনিতে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে নদীপথে পরিবহনের অসুবিধা হল এটা তুলনামূলকভাবে ধীরগতিসম্পন্ন। অবশ্য ইদানিং সড়ক পথের উন্নয়ন ও বঙ্গবন্ধু সেতুসহ অন্যান্য সেতু হওয়ায় নদীপথের গুরুত্ব কমেছে।

চিত্র : নদীপথে পেয়ারা ফল বাজারজাতকরণ

৮.৪ বিভিন্ন পথে পরিবহন

আমাদের দেশে সাধারণত কৃষিজাত পণ্য বিভিন্ন পরিবহনে করা হয়ে থাকে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো।

রেলপথে পরিবহন

দেশের অভ্যন্তরে রেলপথে পচনশীল কাঁচা পণ্য তাড়াতাড়ি সরবরাহ করা সম্ভব। উৎপাদিত এলাকা থেকে তুলনামূলকভাবে কম সময়ে ও কম খরচে এসব পণ্য রাজধানীর বড় বাজারগুলোতে পৌঁছানো যায়। রেলপথে পণ্য পরিবহন অনেকটা ঝুঁকিবিহীন এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ। তবে পণ্য একাধিকবার উঠানো-নামানো প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া পণ্য পরিবহনকালে করণীয় অন্যান্য কার্যাবলি অনেকটা সড়ক অনুরূপ। বাংলাদেশের, কিছু গুরুত্বপূর্ণ জেলায় রেলপথ না থাকায় পণ্য পরিবহনে বেশ অসুবিধা হয়। যেমন- বরিশাল, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও বান্দরবান।

নদীপথে পরিবহন

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ফল ও সবজি পরিবহনে নদীপথে আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কম খরচে এবং নিরাপদে পণ্য পরিবহনের জন্য নদীপথ সড়ক উপযোগী। ঝুঁকুমিতে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে নদীপথে পরিবহনের অসুবিধা হলো এটা তুলনামূলকভাবে ধীরগতিসম্পন্ন। অবশ্য ইদানীং সড়ক পথের উন্নয়ন ও বঙ্গবন্ধু সেতুসহ অন্যান্য সেতু হওয়ায় নদীপথের গুরুত্ব কমেছে।

সমুদ্রপথে পরিবহন

চট্টগ্রাম ও মংলা, সমুদ্রবন্দর দুটি পণ্য রপ্তানি ও আমদানি প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত দুটি বন্দর দিয়ে আমাদের দেশ থেকে পণ্য প্রেরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রপথে খরচ তুলনামূলকভাবে কম। আলু, লেবুজাতীয় ফল ইত্যাদি ধীর পচনশীল বলে পণ্য সমুদ্রপথে প্রেরণ করা যায় গন্তব্যস্থানে পণ্য পৌঁছাতে বেশি সময় প্রয়োজন হয় বলে দ্রুত পচনশীল পণ্য সমুদ্রপথে প্রেরণ করা যায় না। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলি, পুঁইশাক, পালংশাক, টমেটো, শিম, বেগুন, পটোল ইত্যাদি।

চিত্র : চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর

## বিমানপথে পরিবহন

ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের দেশ হতে বিশেষ কিছু সবজি ও চিংড়ি রপ্তানি হয়ে থাকে। সবজির মধ্যে ফ্রেঞ্চ বিন, বেবি কর্ন, পলা, খেরকিন, কচুরমুখী, সাকরুড়া, মিষ্টি লাউ, বরবটি, বাল মরিচ, কচুরলতি, বেঙ্গন, করলা, কাঁকরোল ইত্যাদি বিমানপথে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। Hortex ঢাকা -এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ৬২,০০০ (বাষট্টি হাজার) মেট্রিক টন সবজি এদেশ থেকে রপ্তানি হয়ে থাকে। বিমানে প্রেরণ ভাড়া অত্যন্ত বেশি। সাধারণত এটা মোট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ খরচের প্রায় অর্ধেকের মতো। এর প্যাকেজিং খরচও অত্যন্ত বেশি। তাই এ কার্যক্রমকে লাভজনক করার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সুনিয়ন্ত্রিত এবং উন্নত মানের হতে হয়। বিমানযোগে প্রেরিত পণ্য অবশ্যই উচ্চমানের হতে হয়। আমদানিকারক দেশে যেসব পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে, শুধু সেসব পণ্যই প্রেরণ করতে হয়। তবে আমাদের দেশ থেকে প্রেরিত সবজি ইউরোপ ও আমেরিকার সুপার শপে (চেইন) পাওয়া যায় না। এগুলো অ্যাথনিক মার্কেটে বাজারজাত করা হয়।

চিত্র : কার্গো বিমানে পণ্য পরিবহন

### বিমানবন্দরের কার্যক্রম

আমদানিকারক দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং করা সামগ্রী বিমানবন্দরের নির্ধারিত হিমায়িত স্থানে এনে জড়ো করা হয়। এর পূর্বে প্যাকেটগুলো বিশেষভাবে দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা সর্টিং, গ্রেডিং ইত্যাদি করে প্যাকিং করতে হয়। এ কাজ বিমান ছাড়ার ১০-১৫ ঘন্টা আগে করতে হয়। এর মধ্যে পণ্যের কোয়ারেন্টাইন সনদপত্রসহ অন্যান্য কাগজপত্র তৈরির করা পর্যন্ত পণ্যগুলো বিমানবন্দরের হিমাঘরে সংরক্ষণ করা হয়। এখানে অত্যন্ত যত্নসহকারে মালপত্র নাড়াচড়া ও ওঠানো-নামানো করা হয়। প্রেরিত মালের বিবরণ আগেই আমদানিকারকের নিকট ফ্যাক্স বা ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। কৃষিজাত পণ্য ছাড়াও আসবাবপত্র ও বড় বড় মালামাল পরিবহনের প্লেনকে কার্গো প্লেন এবং মালামাল পরিবহনের পানির জাহাজকে কার্গো শিপ বলে।

### বিমানের কনটেইনার

বিমানে একই ধরনের মাল বহনের জন্য নির্ধারিত কনটেইনার থাকে। আবার পণ্যবোঝাই প্যাকেটগুলো গাদা করে নেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। এ কাজে জাল দিয়ে মোড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পাত্র বা প্যালেটস প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। এগুলো রপ্তানিকারকরা অনেক সময় বিমান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নেন এবং প্যাকিং হাউজে নিয়ে পণ্যসামগ্রী বোঝাই করে বিমান বন্দরে ফেরত নিয়ে আসেন। যাত্রীবাহী বিমানে যাত্রীদের কেবিনে যে তাপ ও চাপমাত্রা রক্ষা করা হয় ঠিক একই তাপ ও চাপমাত্রা পণ্যের কেবিনেও রাখা হয়।

### ৮.৫ হিমায়িত পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থা

আমাদের দেশে এখনও হিমায়িতযানে ফল ও সবজি পরিবহন ও বিতরণের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তবে খাদ্যসামগ্রী যেমন প্যাকেটজাত দুধ হিমায়িত যানে পরিবহন করা হয়। সম্প্রতি হর্টেক্স নামক সংস্থা হিমায়িত যান ব্যবহার করে ফল ও সবজি পরিবহন ও বিতরণ শুরু করেছে। এতে ফল ও সবজি সংগ্রহের পরপরই পরিমিত শীতল তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হয়। এরপর বাজারজাত করা পর্যন্ত একই তাপমাত্রায় রাখা হয়। এটি একটি ব্যয়বহুল উন্নত প্রযুক্তি। তবে দীর্ঘসময় টাটকা পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকে বলে ভালো বাজারদর পাওয়া নিশ্চিত হয়। এর ফলে ব্যয় পুষিয়ে যায়। সকল উন্নত দেশে ও কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। এই হিমায়িত যানে দূরপাল্লার সড়ক পথ, নৌপথ, রেলপথে দ্রুত পচনশীল পণ্যসামগ্রী ঠাণ্ডা অবস্থায় প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশে মিল্কভিটা, আড়ং দুধ কোম্পানি হিমায়িত যানে প্রতিদিন বিক্রয়কেন্দ্র সমূহে দুধ পৌঁছে দেয়। কুরিয়ার সার্ভিস সংস্থার এ ধরনের যানবাহন রয়েছে।

চিত্র : হর্টেক্সে হিমায়িত দূরপাল্লার ট্রাক

## ৮.৬ পাইকারি বাজারে পণ্য ওঠানো, বাছাই ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

পাইকারি বাজার উৎপাদন এলাকায় জড়োকরণ কেন্দ্র হিসেবে এবং ভোগ্য এলাকায় বণ্টন কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন এলাকার ফড়িয়ারা চাষিদের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে ফসল সংগ্রহ করে জড়োকরণ কেন্দ্রে (পাইকারি বাজারে) ব্যাপারিদের কাছে বিক্রি করেন। ব্যাপারিরা এখানে পণ্য বাছাই করে রোগ ও পোকায় আক্রান্ত, অপরিপক্ব বা অতিরিক্ত পরিপক্ব পণ্য বাদ দেন। শুধুমাত্র গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য চাহিদা অনুযায়ী গ্রেড করে ভোগ্য এলাকায় প্রেরণ করেন।

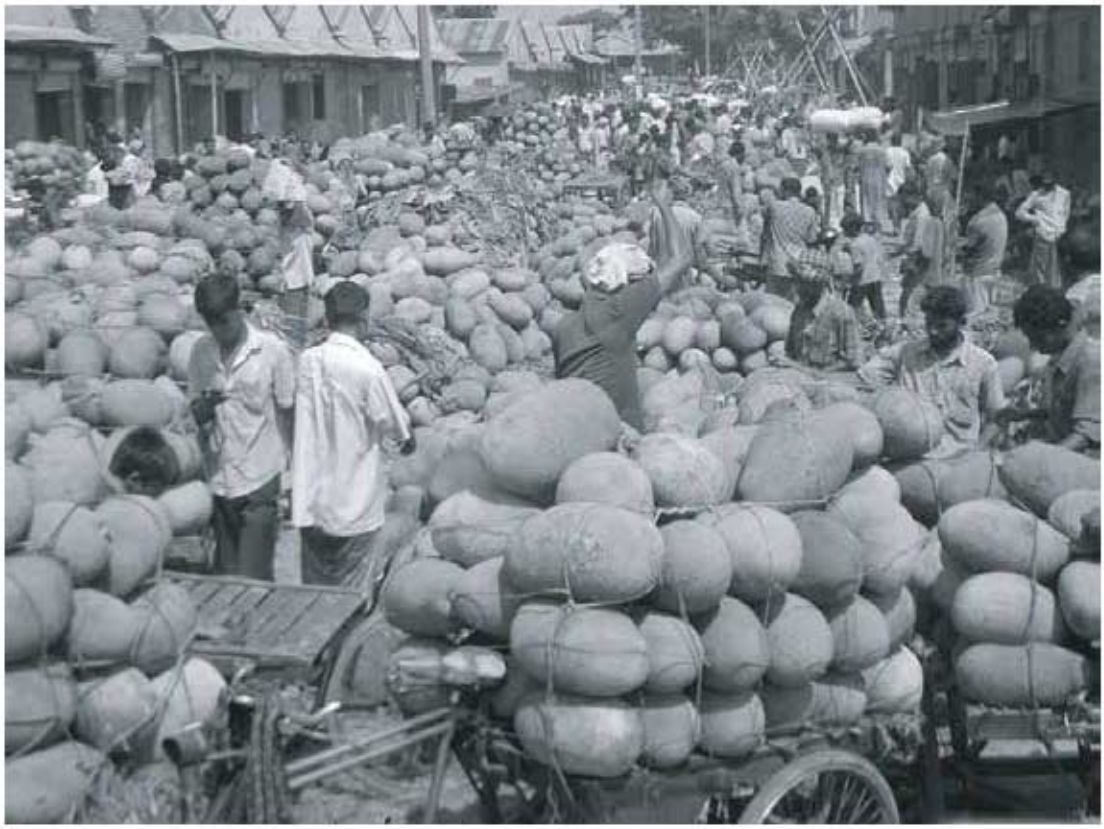

চিত্র : পাইকারি বাজার

ভোগ্য এলাকার বণ্টনকেন্দ্রে (পাইকারি বাজার) পণ্য পৌঁছানোর সাথে সাথে যত্নের সাথে নামাতে হয়। এসব পণ্য ছায়াযুক্ত স্থানে এবং তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা জায়গায় প্যাকেট খুলে খোলা বাতাসে রাখতে হয়। অতঃপর পণ্যগুলোকে বাছাই করে যতটা সম্ভব কম উচ্চতার স্তরে সাজিয়ে খুচরা বিক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বিক্রেতা পণ্য ক্রয় করে খুচরা বাজারে নিয়ে যায়।

## খুচরা বাজারের কার্যাবলি ও নিয়ন্ত্রণ

আমাদের দেশে ফল ও সবজির খুচরা বাজার অনিয়ন্ত্রিত। এখানে খুচরা ব্যবসায়ী বা বিক্রেতারা যেমন পণ্য সাজিয়ে বসেন, তেমনি উৎপাদনকারী বা চাষিরাও তাদের পণ্যের পসরা সাজান। এসব বাজারে পণ্যের মূল্যের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রন নাই। ফলে, বিক্রেতারা যেমন তাদের ইচ্ছেমতো দাম হাঁকান তেমনি ক্রেতারাও দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ করেন।

এদেশের বাজারে ফল ও সবজিকে কোনো স্ট্যান্ডার্ড গ্রেড অনুযায়ী আলাদা করে বাজারে আনা হয় না। তাছাড়া পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে অনেক সময় ক্রেতারা নিকৃষ্ট মানের পণ্য উচ্চমূল্যে কিনতে বাধ্য হন। আবার অনেক সময় বিক্রেতারা বিশেষ করে উৎপাদনকারী চাষিরা তাদের পণ্যের সঠিক মূল্য পান না। অসাধু পাইকাররা বড় এবং ভালো জিনিস উপরে রেখে মন্দটা নিচে রেখে ক্রেতাকে প্রতারণা করে থাকে। বাজারে পণ্যের আমদানির ওপর দাম নির্ভর করে। আমদানি বেশি হলে মূল্য কমে যায়, আবার আমদানি কম হলে মূল্য বেড়ে যায়। খুব বেশি আমদানি হলে অনেক সময় অতিরিক্ত পণ্য বিক্রি করা সম্ভব হয় না, ফলে পচে নষ্ট হয়। অর্থনীতির ভাষায় একে Demand and Supply Rule of Market Price বলা হয়।

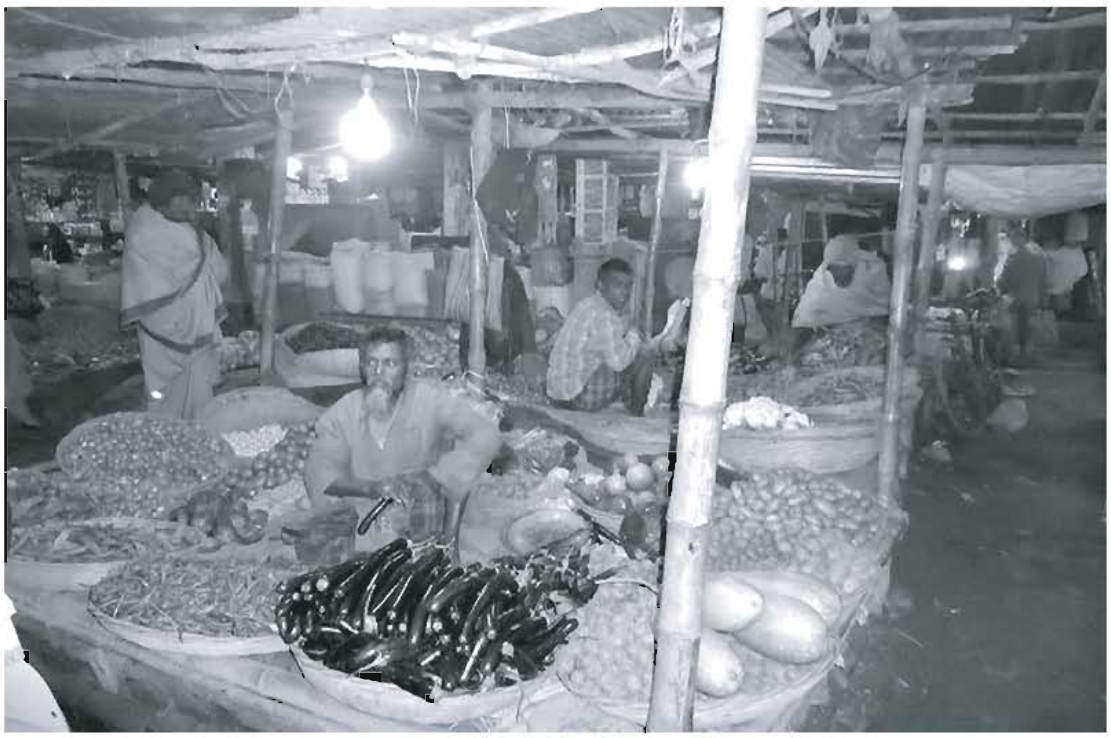

চিত্র : খুচরা বাজার

## অনুশীলনী-৮

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন ফল ও ফলাদি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কারণে পচে নষ্ট হয়ে যায়?
২. ফল ও সবজি সংরক্ষণের পূর্বের করণীয় কাজগুলো কী কী?
৩. পণ্যকে কীসের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিং করা হয়?
৪. মাঠে ফল ও সবজি ঠাণ্ডা বা শীতলীকরণ কাজটি কীভাবে করা হয়.
৫. আংশিক বায়ুশূন্য ঘরে পত্রবহুল সবজি সংরক্ষণের জন্য কেন উপযোগী?
৬. ফসল সংগ্রহের পর কোন কোন সবজি কিউরিং করা প্রয়োজন?
৭. মিষ্টি আলু কীভাবে কিউরিং করতে হয়?
৮. কিউরিং কত প্রকার ও কী কী?
৯. কোন জাতীয় সবজি বা কন্দকে মাপে কিউরিং করা হয়?
১০. মাঠে কিউরিং এর সময় পণ্যকে কীভাবে কতদিন ঢেকে রাখতে হয়?
১১. ফল ও সবজি সংরক্ষণ ব্যাগে কেন ছিদ্র রাখতে হয়?
১২. বাতাসের উৎস হিসেবে সংরক্ষণ কত প্রকার ও কী কী?
১৩. বাতাস চলাচল যুক্ত সংরক্ষণ ঘরে কী কী ফল ও সবজি রাখা যায়?
১৪. পুরনো গাড়ীতে এয়ার সাসপেনশন লাগালে শতকরা কত ভাগ ফল ও সবজির পরিবহনকালীন ক্ষতি কমে যায়?
১৫. Wind Catcher এর কাজ কী?
১৬. "কবুতরের খোপ" পদ্ধতিতে সাজানো মানে কী?
১৭. বাংলাদেশের কোন এলাকায় রেলপথ নেই?
১৮. নিরাপদে পণ্য পরিবহনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পথ কোনটি?
১৯. বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দর কয়টি ও কী কী?
২০. কোন কোন পণ্যগুলো এবং কেন সমুদ্রপথে প্রেরণ করা যায় না?
২১. কী কী সবজি বিমানপথে রপ্তানি হয়ে থাকে?
২২. প্রতি বছর কত টন সবজি বিদেশে রপ্তানি হয়?
২৩. আমাদের দেশ হতে প্রেরিত সবজি ইউরোপের কোথায় বিক্রি হয়?
২৪. হাস পুলিং কী?
২৫. কার্গো শিপ ও কার্গো প্লেন বলতে কী বোঝায়?

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল সবজি কীভাবে পরিষ্কার ও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়?
২. ফল ও সবজির মাঠে কীভাবে কিউরিং করা হয়?
৩. রেডিয়েশন ও তেল মাখানোর ফলে ফল ও সবজির কী উপকার হয়?
৪. বাতাস চালাচল পদ্ধতির মাধ্যমে কীভাবে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা হয়?
৫. কীভাবে পণ্য পরিবহনে ওঠানো ও নামানো হয় বর্ণনা কর।
৬. ট্রাকে বা গাড়ীতে পণ্য পরিবহনের সময় কী কী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়?
৭. ট্রাকে বা উন্মুক্ত পরিবহনে কীভাবে পণ্য প্রেরণ করা হয়?
৮. রেলপথে পণ্য পরিবহন বর্ণনা কর?
৯. বিমান পথে পণ্য পরিবহন লাভজনক হবে কেন?.
১০. পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমানবন্দরের কার্যক্রম বর্ণনা কর।
১১. বিমানের কনটেইনারে কীভাবে পণ্য বোঝাই করা হয়
১২. হিমায়িত যান ও বিতরণ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।
১৩. পাইকারি বাজার ও খুচরা বাজার সম্পর্কে টীকা লেখ।

### রচনামূলক প্রশ্ন

১. অস্থায়ী সংরক্ষণের পূর্বের করণীয় কাজগুলো বর্ণনা কর।
২. পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা এবং সড়কপথে পরিবহন কালে পণ্যের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি ও প্রতিকার লেখ।
৩. সড়কপথে উন্মুক্ত পরিবহন, পণ্য সাজানো এবং রেল, নদী ও সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন বর্ণনা কর।
৪. বিমানপথে পরিবহন, বিমানবন্দরের কার্যক্রম , বিমানের কন্টেইনার ও হিমায়িত পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

## অধ্যায়-৯

# ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ

### ভূমিকা

অতীতে পণ্য ও সেবা প্রদানকারীরা তাদের নিজেদের পণ্য উৎপাদন করে তা বাজারে বিক্রি করতেন। এক্ষেত্রে তারা ভোক্তা বা ব্যবহারকারীদের পছন্দ ও প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ কোনো গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তারা মূলত বিক্রয়ের উপরই জোর দিতেন। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য বর্তমান উৎপাদনকারীরা পণ্য বা সেবা উৎপাদনের পূর্বে ভোক্তা ও ব্যবহারকারীদের চাহিদা, প্রয়োজন, পছন্দ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে থাকে। অর্থাৎ পণ্য বা সেবা উৎপাদনের পুরো বিষয়টার শুরু হয় শিল্পকারখানার বাইরে অর্থাৎ মাঠ থেকে। এখান থেকেই বাজারজাতকরণের কাজ শুরু হয়। সাধারণত বাজার বলতে সে স্থানকে বুঝায় যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলিত হয়। ক্রেতার তরফ থেকে আসে চাহিদা বা পাওয়ার ইচ্ছা এবং বিক্রেতার তরফ থেকে আসে সরবরাহ। এই চাহিদা ও সরবরাহ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দামের ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। এভাবেই পণ্যের হাতবদল বা বাজারজাতকরণ হয়।

সংজ্ঞা : বাজারজাতকরণ বা বিপণন বলতে যা বুঝায় তা হলো ভোক্তার পছন্দ ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া বা কাজ। তবে আধুনিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার কাজ ভোক্তাদের নিকট পণ্য বা সে শুধু পৌঁছানো নয়, তাদের সাথে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করাও বাজারজাতকরণের আওতাভুক্ত।

### ০.১ ফল ও সবজি বাজারজাতকরণের গুরুত্ব

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাজারজাতকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। উৎপাদন করলেই যে তা বিক্রি করা যাবে এমন ধারণা সঠিক নয়। পণ্য বা সেবা উৎপাদন করার আগে উৎপাদনকারীকে ভোক্তার চাহিদা, রুচি, ক্রয়ক্ষমতা প্রভৃতির দিকে খেয়াল রাখতে হয়। এ ছাড়াও ভোক্তার পছন্দের পণ্য বা সেবা সম্পর্কে যদি ভোক্তাকে সঠিকভাবে না জানানো হয়, তবে সে পণ্য বিক্রি না-ও হতে পারে এক্ষেত্রে প্রচার ও বিজ্ঞাপন হলো বাজারজাতকরণ কাজের মধ্যে অন্যতম ভোক্তাকে পণ্য সম্পর্কে অবহিত করার পর কীভাবে তা ভোক্তা বা ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানো হবে অর্থাৎ বিতরণ পদ্ধতি কেমন হবে, তাও বাজারজাত কাজের অন্তভুক্ত। এক কথায় বলা যায় যে বাজারজাতকরণ হচ্ছে পণ্য, মূল্য, প্রচার, প্রসার এবং বিতরণ কার্যাবলিসমূহের সমন্বিত ফল, বিধায় পণ্য উৎপাদনকারীর জন্য এর সঠিক ব্যবহার আবশ্যক।

তবে তাজা ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ বলতে কৃষক বা উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, নারিকেল, বেগুন, কলা, শাক, কুমড়া, টমেটো, কাঁচা আম ইত্যাদি মাঠ বা গাছ হতে সংগ্রহ করে দ্রুত গ্রহণকারী বা ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোকে বুঝায়। বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা পদ্ধতি এখনো গড়ে ওঠেনি। তাজা ফল সবজির বেলায় এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বাজারজাতকরণের কার্যাবলি: ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ সাধারণত তিন প্রকার হয়। যথা-
(ক) সেবামূলক কাজ
(খ) কাঠামোগত কাজ
(গ) বিনিময় কাজ

সেবামূলক কাজ : সেবামূলক কাজ বলতে ফল ও সবজির শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিং এবং মান উন্নয়ন। এ কাজ গুলো নিম্নরূপ–

ক) ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী ফল ও সবজির গ্রেডিং-এর চাহিদা থাকলেও এদেশের চাষিরা বা বিক্রেতারা তা একদমই করেন না।
খ) যেসব ফল বা সবজি অতিরিক্ত পেকে গেছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বা পোকাক্রান্ত তা বেছে প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াজাতকরণ এ কাজে লাগানো বা সর্টিং বা বাছাইকরণ করে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করতে চায় না।
গ) সবজিতে প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করা হয় যেমন– লালশাক, শিম, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি শাকসবজির মান যাচাই করে বিক্রি করলে ভালো মূল্য পাওয়া যাবে। জৈব কৃষি (Organic Agriculture) নীতি অনুসরণ করে সবজি উৎপাদন প্রদর্শনীর সংখ্যা বাড়ানো উচিত।
ঘ) ফল পাকানোর ক্ষেত্রেও হরমোন ও অন্যান্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করে ফল ও সবজি বিক্রি করা হলে লাভ ও সেবা দুটোই পাওয়া যাবে।
ঙ) ঝুড়ি বা বস্তার নিচে ছোট ফল এবং উপরে প্রদর্শনের জন্য বড় আকারে ফল রাখার প্রতারণামূলক প্রথাটি বর্জনীয়।

কাঠামোগত কাজ

কাঠামোগত কাজ করতে গুদামজাতকরণ, প্যাকিং, পরিবহন, বাজার সংবাদ, আর্থিক সংস্থান ইত্যাদি। বিভিন্ন ফার্ম ও খামার থেকে পণ্য গুদামজাত করা হয়। এতে ক্রেতারা আকৃষ্ট হয়, পরিবহনের খরচ কমে ও বাছাই করতে সুবিধা হয়। গুদামজাতকরণের ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্থিতিশীল থাকে। গুদামজাতকরণে অনেক সময় ভালোভাবে প্যাকিং করতে হয়। এছাড়া পণ্য পরিবহনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদেশে পরিবহন ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। নৌকা, স্টিমার, ভ্যান, রেল, ট্রাক, কাঁধে ভারা নিয়ে, মাথায় ঝাঁকা করে পণ্য পরিবহন করা হয় আর কোনোটাই পচনশীল পণ্যের জন্য নিরাপদ নয়।

বিনিময় কাজ

পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বা সমবায় পদ্ধতি ইত্যাদি অর্থাৎ পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে যে কাজ করা হয় তা-ই বিনিময় কাজ।

চিত্র : কাঁধে বা মাথায় পণ্য পরিবহন

## ৯.২ বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

প্রচলিত অর্থে বাজার বলতে বুঝায়– "একটি জায়গা যেখানে দ্রব্যসামগ্রী বিনিময়ের জন্য ক্রেতা ও ভোক্তা একত্রিত হয়।" অর্থনীতিবিদদের মতে বাজার হচ্ছে ক্রেতাসাধারণ এবং বিক্রেতার সমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট বা শ্রেণির দ্রব্য বিনিময় করে। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বিক্রেতারা (ইন্ডাস্ট্রি) এবং ক্রেতাগণ বাজার গঠন করে। নিম্নের ছকে ইন্ডাস্ট্রি ও বাজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এখানে উভয়ের মধ্যে ৪টি প্রবাহ রেখা দেখানো হয়েছে–

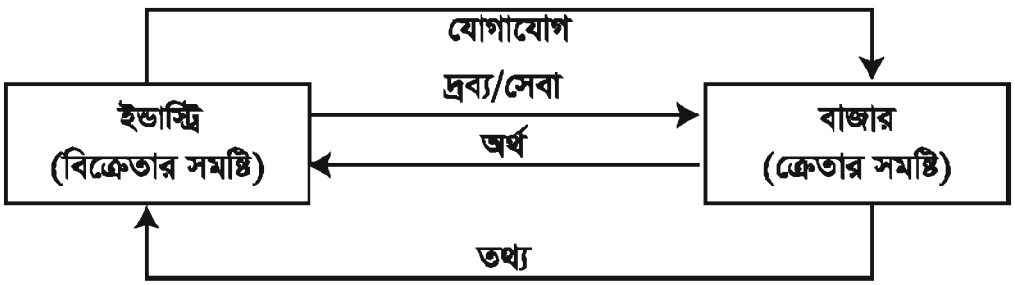


চিত্র : একটি সাধারণ বাজারজাতকরণ পদ্ধতির প্রবাহ চিত্র

২০২০

## বাংলাদেশে ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

সাধারণত ফল ও সবজি গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। গ্রামের চাষিরা তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য গ্রামের হাটে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। কিছু কিছু ব্যাপারি আছে যারা একসাথে অনেক পরিমাণ শাক-সবজি কিনে শহরের বাজারে বেশি দামে বিক্রি করে। আবার অনেক কৃষক গ্রাম থেকে পণ্য নিয়ে শহরে অধিক মূল্য পাবার আশায় নিয়ে আসে। সেগুলো সাধারণত আড়তদারের গদিতে পাইকারি দরে বিক্রি হয়। পরবর্তীতে সেগুলো আড়তদারের নিকট হতে পাইকারি দরে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কিনে নেয় এবং শহরের বড় বড় বাজারে অধিক দামে বিক্রি করে। এভাবে আড়তদার দুই দিক থেকে কমিশন বা মুনাফা পায়। প্রথমত কৃষক বা ব্যাপারি বিক্রেতার নিকট থেকে, দ্বিতীয়ত ক্রেতা বা ব্যাপরির নিকট থেকে। বর্তমানে গ্রামগঞ্জে এক ধরনের কাঁচামালের ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে যাদের প্রধান কাজ হলো ফল ও সবজি উৎপন্ন হবার পরপরই তা কিনে ফেলা এবং পরবর্তীতে অধিক মূল্য পাবার জন্য ভিন্ন জেলায় ট্রাকভর্তি করে চালান দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঢাকা, কুমিল্লা- প্রভৃতি জেলা থেকে চট্টগ্রাম জেলায় ফুলকপি, বাঁধাকপি, তরমুজ, বাঙ্গী, কাঁকরোল পটোল ইত্যাদি চালান দেয়া হয়। নিম্নে তা সবজির বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া দেখানা হলো।

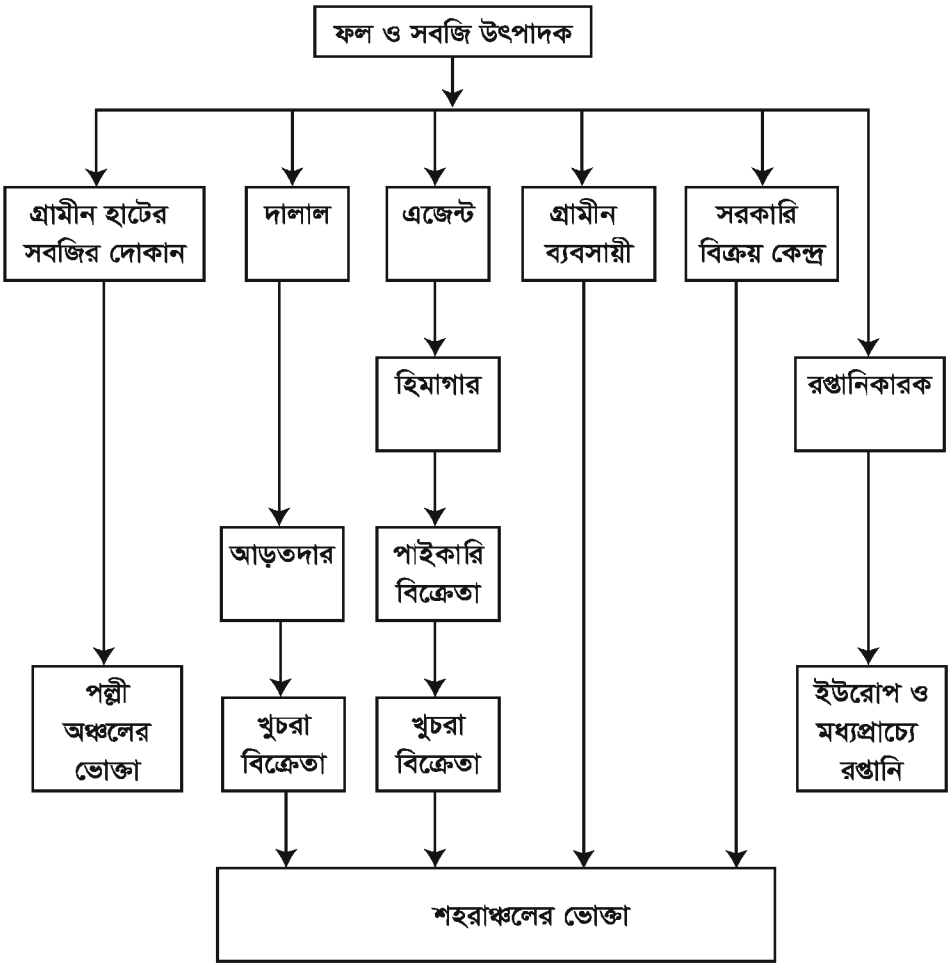

৯.৩ বাজারজাতকরণের বৈশিষ্ট্য

ফল ও সবজির বাজারজাতকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. সরবরাহের ওঠানামা : মৌসুমভেদে ফল ও সবজির সরবরাহের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতকালে সবজি এবং গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকালে ফলের সরবরাহ বাড়ে কিন্তু সবজির সরবরাহ বর্ষাকালে কমে।

২. মূল্যের তারতম্য : প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সঠিক বাজার তথ্যের অভাবের দরুন পাইকারি বাজারে ফল ও সবজির বাজার ওঠানামা করে। কিন্তু চাহিদা নির্দিষ্ট থাকায় দাম কমা বা বাড়া সরবরাহের উপর নির্ভর করে।

৩. পরিমাণ পদ্ধতি : পাইকারি বাজারে কাঁচামাল তিনভাবে পরিমাপ করা হয়। যথা-

(ক) লটে বিক্রয় করা হয়

(খ) গণনা বা আঁটি বা ঝুড়ির মাধ্যমে বিক্রয় এবং

(গ) ওজনে বিক্রয় হয়।

৪. দাদন বা ঋণ : আড়তদাররা চাষিদের দাদন বা ঋণ দিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য কম দামে কিনে নেন।

৫. ধারে বিক্রি : আড়তদাররা বড় বড় ব্যবসায়ীকে ধারে পণ্য দেন। ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রি করে টাকা জমা দেন।

৬. মূল্য নির্ধারণ : পাইকারি ও খুচরা উভয় বাজারেই পণ্যের মূল্য দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত করা হয়। ইদানীং বড় বড় বাজারে মূল্য তালিকা লাগানোর জন্য সরকারি প্রচেষ্টা দেখা যায়।

৭. পানি ছিটানো : শাকসবজি ও ফলকে সতেজ রাখার জন্য ব্যবসায়ীরা নিয়মিত পানি ছিটিয়ে রাখেন।

ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন

(১) ফল ও সবজি সংগ্রহে সতর্কতা অবলম্বন।

(২) পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাছাই করা বা সর্টিং।

(৩) পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ব্যবস্থা প্রবর্তন বা গ্রেডিং।

(৪) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ।

(৫) উৎপাদনকারীদের সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হওয়া।

(৬) পণ্য উৎপাদনের জন্য স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ ব্যবস্থা।

(৭) উৎপাদন এলাকায় ও বাজারে Low Cost হিমাগার স্থাপন।

(৮) রেলওয়ে, স্টিমার প্রভৃতিতে হিমকক্ষ স্থাপন।

(৯) ধান, পাটের মতো বিভিন্ন সবজি ও ফলের বাজার মূল্যও সুষ্ঠুভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(১০) প্যাকেজিং ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

(১১) ফড়িয়া, দালাল, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি শ্রেণির মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা হ্রাসকরণ।

(১২) ফল ও সবজি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এগ্রোবেসড শিল্প স্থাপন।

# অনুশীলনী-৯

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাজারজাতকরণের পুরো প্রক্রিয়ার শুরু হয় কোথা থেকে?
২. বাজার বলতে কী বোঝায়?
৩. পণ্যের হাতবদল কীভাবে হয়?
৪. আধুনিক বাজারজাতকরণ বলতে কী বোঝায়?
৫. পণ্য বা সেবা উৎপাদন করার পূর্বে উৎপাদনকারীকে কী লক্ষ্য রাখতে হয়?
৬. বাজারজাতকরন প্রক্রিয়া কী কী বিষয়ের সমন্বিত ফল?
৭. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ কার্যাবলি কত প্রকার ও কী কী?
৮. বাজারজাতকরণের কাঠামোগত কাজ কী কী?
৯. দেশে পচনশীল ফল ও সবজির জন্য পরিবহন ব্যবস্থাগুলো কী কী?
১০. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বলতে কী বোঝায়?
১১. ঢাকা, কুমিল্লা জেলা থেকে কী কী সবজি চট্টগ্রামে পাঠানো হয়?
১২. কোন কোন মৌসুমে সবজি ও ফলের উৎপাদন বাড়ে?
১৩. পাইকারি বাজারে কাঁচামাল কী কী পদ্ধতিতে বিক্রি হয়?
১৪. শাকসবজি ও ফলকে সতেজ রাখার জন্য ব্যবসয়ীরা কী করে থাকেন?

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাজারজাতকরণ ও আধুনিক বাজারজাতকরণ বলতে কী বোঝায়?
২. ফল ও সবজি বাজারজাতকরণের গুরুত্ব লেখ।
৩. ফল ও সবজি বাজারজাতকরণের সেবামূলক কাজ কী?
৪. বাজারজাতকরণের প্রবাহ চিত্রটি বর্ণনা কর।
৫. ফল ও সবজি বাজারজাতকরণের বৈশিষ্ট্য গুলো কী কী?
৬. ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান ৫টি কাজ লেখ।

## রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা দাও। এর গুরুত্ব ও কার্যাবলি লেখ।
২. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ পদ্ধতির প্রবাহ চিত্র লেখ এবং বর্ণনা কর।
৩. ফল ও সবজির বাজারজাতকরণ বৈশিষ্ট্য ও এর উন্নয়নের বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

# ব্যবহারিক

## এগ্রোবেসড ফুড-২

## নবম শ্রেণি

## প্রথম পত্র

২০২০

# ব্যবহারিক
# নবম শ্রেণি

## প্রথম পত্র
## অনুশীলনী-১ : ফল ও সবজি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে উৎপাদিত ফল ও সবজির প্রচলন ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ফল ও সবজিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক) প্রধান ফল ও সবজি
খ) অ-প্রধান ফল ও সবজি এবং
গ) বাংলাদেশের উপযোগী বিদেশি ফল ও সবজি

নিম্নে এ ফলও সবজির বিস্তারিত নাম ও শ্রেণিবিভাগের তালিকা দেওয়া হলো–

ক) প্রধান প্রধান ফল

আম, কলা, পেঁপে, আনারস, লিচু, নারিকেল, কাঁঠাল, পেয়ারা, আতা, শরিফা, তরমুজ, সফেদা, বেল, জাম, জাম্বুরা, কমলা লেবু ইত্যাদি।

খ) প্রধান প্রধান সবজি

মুখী কচু, মান কচু, ওলকচু, ডাঁটা, মিষ্টি আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, মুলা, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, শসা, লাউ, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, করলা, কাঁকরল, চিচিঙ্গা, পটোল, শিম, মটরশুঁটি, বরবটি, ঢেঁড়স, বেগুন, আলু, টমেটো ও গাজর।

গ) অপ্রধান ফল

আঙ্গুর, তাল, খেজুর, চালতা, আমড়া, তেঁতুল, আমলকী, জামরুল, করমচা, গোলাপজাম, দেওফল, গাব, কামরাঙ্গা, জলপাই, ডুমুর, লটকন, ডালিম, তুঁতফল, বেতফল, ডেউয়া, পানিফল, বিলিম্বী, অরবরই, সুপারি, সাতকড়া, আদা, জামির ইত্যাদি।

ঘ) অপ্রধান সবজি

দুধ কচু, মৌলভী কচু, মেটে আলু, মৌআলু, বিট, ব্রকোলি. শাক আলু, চুকুর, শাপলা, মিষ্টি মরিচ, স্কোয়াশ, সাজনা, শতমূলী।

ঙ) বাংলাদেশেল উপযোগী বিদেশি ফল

রামবুটান, স্ট্রবেরি, জাবটিকাবা, শানতোল, থাই জামরুল, থাই আম, প্যাশন ফল, ড্রাগন ফ্রুট, এভাকেডো, ডুরিয়ান, ফলসা, ট্রপিক্যাল আপেল ইত্যাদি।

বাংলাদেশে উপযোগী বিদেশি সবজি

ফরাসি সিম, ঘেরকিন, চীনা কপি, রুটাবাগা, ব্রাসেলস স্প্রাইট ইত্যাদি।

ছক-১

| ক্র. নং | প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ফলের ভাগ | ফলের নাম ও মোট সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | প্রধান ফল | |
| ২ | অপ্রধান ফল | |
| ৩ | বিদেশি ফল | |
| | সর্বমোট | |

ছক-২

| ক্র. নং | প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সবজির ভাগ | সবজির নাম ও মোট সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | প্রধান প্রধান সবজি | |
| ২ | অপ্রধান সবজি | |
| ৩ | বিদেশি সবজি | |
| | সর্বমোট | |

এখন

$$\text{প্রধান ফলের শতরা হার} = \frac{\text{প্রধান ফলের সংখ্যা}}{\text{মোট ফলের সংখ্যা}} \times ১০০$$

$$\text{প্রধান সবজির শতকরা হার} = \frac{\text{প্রধান সবজির সংখ্যা}}{\text{মোট সবজির সংখ্যা}} \times ১০০$$

এভাবে অপ্রধান ও বিদেশি ফল ও অপ্রধান সবজি ও বিদেশি সবজির শতকরা হার নির্ণয় করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি।
২. প্রাসঙ্গিক তথ্য মোতাবেক ফল ভিত্তিক সংখ্যা নিরূপণের তালিকা/ছক
৩. চিনিসহ ফল ও সবজির সংক্ষিপ্ত বিবরণযুক্ত পুস্তিকা
৪. কাগজ, কলম, স্কেল, রাবার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. ফল ও সবজির শনাক্তকরণের জন্য ফল ও সবজি বাগানে বা বজারে যেতে হবে।
২. ফল ও সবজি চিত্র সংবলিত তালিকার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করতে হবে।
৩. ছক মোতাবেক ফল ও সবজির নাম লিখতে হবে।
৪. বিভিন্ন মৌসুমে বাগান বা বাজারে গিয়ে ছক মোতাবেক কোন কোন ধরনের ফল পাওয়া যায় তা লিখতে হবে এবং সংখ্যা বের করতে হবে।
৫. পূরণকৃত ছক দেখে কোন কোন ফল ও সবজির উৎপাদন বেশি বা বাজারে ফল বা সবজি বেশি পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করা যাবে।
৬. ফল ও সবজির শতকরা হার নির্ণয় করে ফল ও সবজির অবস্থান নির্ণয় করা যাবে।

## অনুশীলনী: ২: বিভিন্ন প্রকার ফল ও সবজির পুষ্টিমান তালিকা (চার্ট) তৈরিকরণ অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফলমূল ও শাকসবজি আমাদের শরীরের পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস। প্রতিটি ফলই পুষ্টিতে ভরপুর। বিশেষ করে আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে উৎপাদিত আম, কাঁঠাল, কলা ও আনারস ইত্যাদি ফল বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে পরিপূর্ণ। এসব ফলে আমিষ ও শর্করা ছাড়াও আছে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থ যেমন: ক্যালসিয়াম, লৌহ এবং ভিটামিন যথা- ক্যারোটিন, ভিটামিন-সি ইত্যাদি। এসব উপাদান আমাদের শরীরের জন্য খুবই অত্যাবশ্যক। আমাদের ষড়ঋতুর দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল হচ্ছে মৌসুমি ফল এবং শীতকালে বা রবি মৌসুম হচ্ছে সবজি উৎপাদনের সময়। এ সময় আমাদের দেশে প্রচুর ফল ও সবজি উৎপাদন হয়। এ সকল সবজি ও ফলের সাথে আমাদের পরিচিতি হওয়া এবং এগুলোর পুষ্টি উপাদান ও পরিমাণ জানা খুবই প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

কাগজ, কলম, পেন্সিল, রাবার ও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক।

ফল ও সবজির পুষ্টি তালিকা তৈরির জন্য নিম্নের কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

১। দুইটি বড় ড্রইং শীট সংগ্রহ করতে হবে। একটি ফলের পুষ্টি ও দ্বিতীয়টি সবজির পুষ্টি তালিকার জন্য।

২। প্রথমটিতে মৌসুমি সকল ফলের নাম লিখতে হবে।

৩। প্রতিটি ফলের পুষ্টি উপাদান লেখার জন্য ড্রইংশীটে পেন্সিল ও স্কেলের সাহায্যে ঘর টানতে হবে।

৪। নিম্নের ছক অনুযায়ী ফলের পুষ্টি তালিকা তৈরি করতে হবে।

| ফলের নাম | আমিষ (গ্রাম) | শ্বেতসার (গ্রাম) | চর্বি (গ্রাম) | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ভিটামিন বি১ (মি.গ্রা.) | ভিটামিন বি২ (মি.গ্রা.) | ভিটামিন সি (মি.গ্রা.) | ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.) | লৌহ (মি.গ্রাম) | ক্যারোটিন (মাই.গ্রা.) | খাদ্য শক্তি (কি.ক্যালরী) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| আমড়া | ১.১ | ১৫ | ০.১ | ০.৬ | ০.২৮ | ০.০৪ | ৯২ | ৫৫ | ৩.৯ | ৮০০ | ৬৬ |

৫। পুষ্টি উপাদান সংক্রান্ত তথ্য জানতে লাইব্রেরি হতে বিভিন্ন বই ও ম্যানুয়েলের সাহায্য নিতে হবে।

৬। শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

৭। চার্ট তৈরির জন্য কালার পেন্সিল বা কলম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮। চার্ট তৈরি হলে তা শ্রেণি শিক্ষককে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৯। পরিশেষে তা শ্রেণিকক্ষে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

১০। একইভাবে শীতকালীন সবজি ও গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির পুষ্টি তালিকা তৈরি করে শিক্ষকের নিকট হতে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

সতর্কতা

১। কোনো ভুল তথ্য দেওয়া যাবে না।

২। লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট হতে হবে।

## অনুশীলনী-৩ : ফল ও সবজি সংগ্রহোত্তর পরিষ্কার, বাছাই ও গ্রেডিং অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফল ও সবজি গাছ থেকে পাড়ার সাথে সাথেই ফল বিক্রি বা বাজারজাত করা যায় না। দূরে কোথায় পাঠাতে হলেও ২/১ দিন সময় লাগে, ফলগুলো পরিষ্কার, ঠাণ্ডাকরণ, কিউরিং, সর্টিং এবং গ্রেডিং অত:পর প্যাকেজিং করে ফল বা সবজিকে বাজারজাত করতে হয়। এসব কাজে সময় ও শ্রমিকের প্রয়োজন। অনেক সময় বাগানের মালিক সকল ফল বিশেষ করে আম বাগানে ছোট থাকতেই বিক্রি করে দেন। এটা কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। এতে করে ক্রেতা আম কিনে দ্রুত পাকিয়ে বাজারজাত করে বেশি মুনাফা লাভের আশায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এতে করে ভোক্তারা মানসম্মত আম পেতে ব্যর্থ হন। আশা করি সরকার এ দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ফল পানি দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য বড় গামলা বা টাব।

২। ফল বাছাই টেবিল।

৩। ফল গ্রেডিং করার গ্রেডিং বিন (তাত্ত্বিক অংশে ছবি আছে)।

৪। ফল রাখার ঝুড়ি বা পাত্র।

৫। প্যাকিং কাগজ, হ্যান্ড গ্লোভস, পরিষ্কার তাজা পাতা, খড় ইত্যাদি।

৬। ফ্যান, ঠাণ্ডা ঘর বা খোলামেলা ছায়াযুক্ত স্থান।

কাজের ধাপ

১। ফল ও সবজি সংগ্রহ করার পর প্রথমে তা একত্রীকরণ করতে হবে।

২। তারপর ফল ও সবজির সাথে লেগে থাকা ধুলা বালি, কাদা পানি ও অন্যান্য ময়লা বড় পাত্রে পানির কলের নিচে নিয়ে ভালো করে ধুতে হবে। যেমন– আম, জাম, টমেটো ইত্যাদি।

৩। এরপর ফলগুলো হতে কাটা, ফাটা বা থেঁতলানোগুলো আলাদা করতে হবে।

৪। রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফলগুলো আলাদা করতে হবে।

৫। ছোট, মাঝারি ও বড় ফলগুলো আলাদা আলাদা করতে হবে। এ কাজ হাতের সাহায্যে বা গ্রেডিং বিনের সাহায্য করা যায়।

৬। কাঁচা ও পরিপক্ব ফল আলাদা করতে হবে।

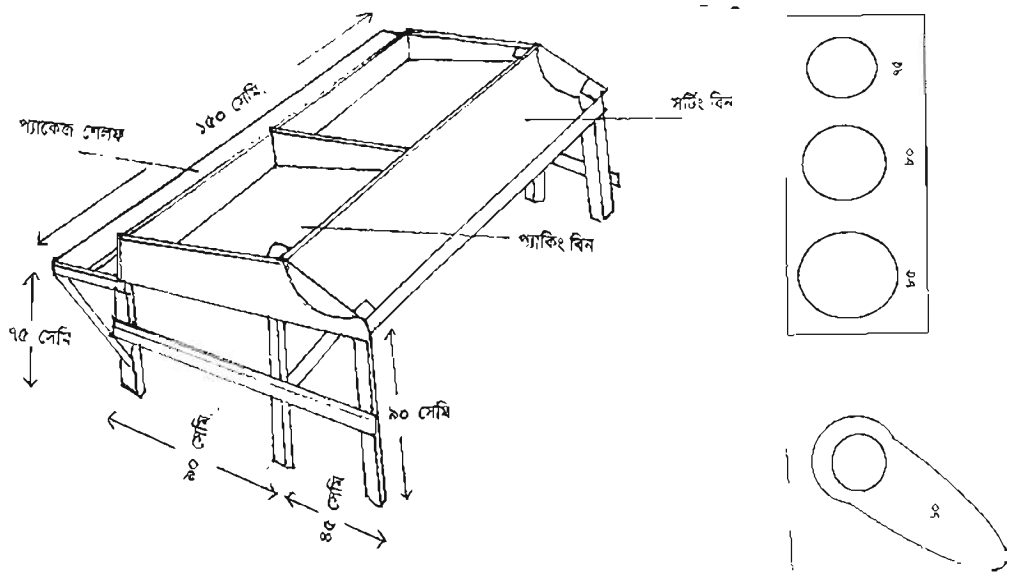


চিত্র : ফল রাখার টেবিল ও ফল গ্রেডিং বিন

**দ্রুত পচনরোধে ব্যবহার্য প্রযুক্তি :**

১। হিমায়িত গাড়িতে পরিবহন।

২। নিয়ন্ত্রিত গুদামে বাইরের বাতাস ঢুকানো

৩। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল প্রায় ১০°C তাপমাত্রার গুদামে কিছুদিন রাখা।

৪। গুদাম ঘরে $CO_2$ মাত্রা বেশি হলে প্রতিটন ফলের জন্য ১৪-১৫ কেজি চুন (লাইম) গুদামে রাখতে হবে।

## অনুশীলনী-৪: ফল পাড়া ও সবজি সংগ্রহের পাত্র ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও ব্যবহার অনুশীলন

### প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফল পাড়া ও সবজি তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাত্র ব্যবহার করা হয়। পণ্যের ধরন ও গাছের উচ্চতার উপর নির্ভর করে পণ্য সংগ্রহের পাত্র নির্বাচন করতে হয়। পণ্য কতদূরে স্থানান্তর করা হবে তার উপরও পাত্রের আকার, গঠন ইত্যাদি নির্ভর করে।

### প্রয়োজনীয় উপরকরণ:

(১) ফল পাড়ার থলে।

(২) ফল পাড়ার বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, ব্যাগ বা বালতি।

(৩) ফল পেড়ে রাখার বিভিন্ন পাত্র।

(৪) সবজি তোলার বিভিন্ন ঝুড়ি, সাজি, ডালা ইত্যাদি।

(৫) ফল সংগ্রহের ট্রলি (হ্যান্ড ট্রলি ও ট্রাক্টরের সাথের ট্রলি)।

ফল পাড়া ও সবজি তোলার পাত্র নির্বাচন ও ব্যবহারের জন্য নিম্নের কাজগুলো অনুসরণ করতে হবে।
(১) উঁচু গাছের ফল পাড়ার জন্য সুতা দিয়ে বোনা থলে বা ক্যানভাস কাপড়ের তৈরি থলে ব্যবহার করা উচিত। এতে করে ফলের আঘাত কম লাগে। গাছ থেকে ফলের বোঁটা কেটে নেওয়ার জন্য এসব থলের রিমের এক প্রান্তে লোহার পাত দিয়ে তৈরি হুক লাগানো থাকে (চিত্র)। থলে বা ব্যাগটি লম্বা বাঁশ বা খুঁটির আগায় শক্ত করে লাগানো থাকে।

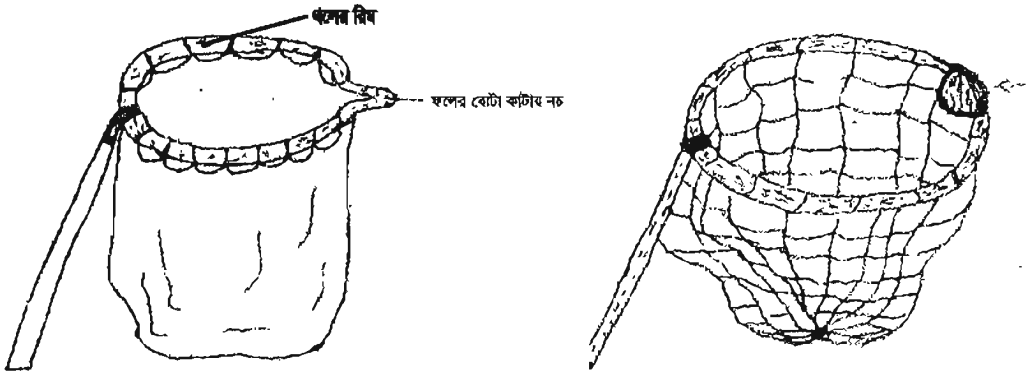


চিত্র : ফল পাড়ার বিভিন্ন ঝুড়ি/থলে

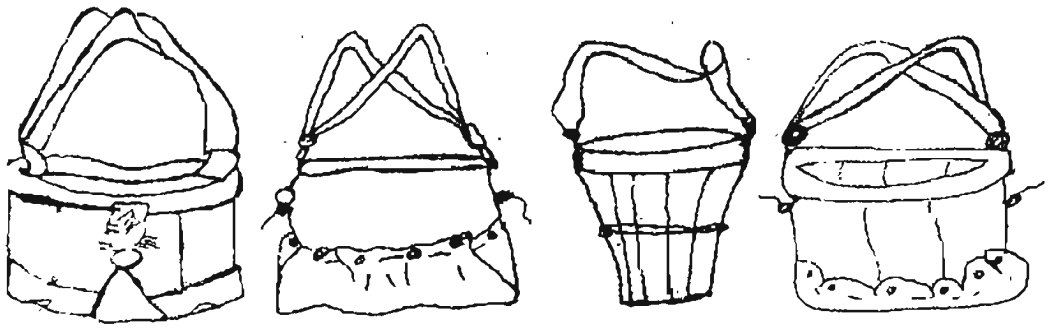

চিত্র : ফল পাড়ার বিভিন্ন ব্যাগ

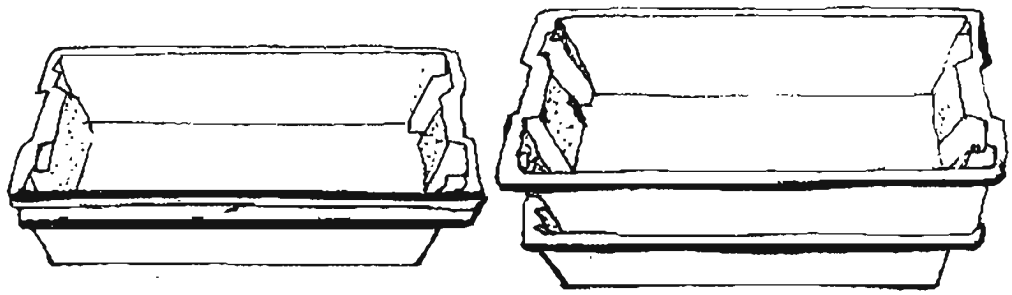

চিত্র : ফল রাখার পাত্র

২০২০

(২) ফল ও সবজি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, থলে, বালতি ও ট্রলি ব্যবহার করা যায়। এগুলো বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হতে পারে। ফল ও সবজি সংগ্রহের জন্য করোগেটেড কার্ডবোর্ডের প্যাকিং বাক্স ব্যবহার করা হয় যার দু'মুখই খোলা যায়। এতে সংগৃহীত পণ্য বড় পাত্রে ঢেলে রাখার সময় কম আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সবজি তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাজি, ডালা, টুকরি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

(৩) এ কাজে প্লাস্টিকের পাত্রও ব্যবহার করা যায়। এগুলোর প্রাথমিক দাম একটু বেশি হলেও টেকসই হয়। পরিষ্কার করা সহজ হয়। খালি পাত্র অল্প জায়গায় অনেকগুলো গাদা করে রাখা যায় এবং সহজেই পরিহবহন করে নেয়া যায়। একই পাত্র বহুদিন ব্যবহার করা যায়।

সতর্কতা

পাত্রের গাত্র অসমান, খসখসে ও ধারালো হলে পণ্যের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও সহজেই পচন ধরে।

**অনুশীলনী-৫: বিভিন্ন ধরনের মোড়ক বা প্যাকেজিং দ্রব্যের ব্যবহার অনুশীলন**

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পণ্য বা ফল ও সবজি সংরক্ষণ ও পরিবহনে সাধারণত যে সকল মোড়ক ব্যবহার হয় সেগুলো হলো–

(ক) বাঁশ, খড় ও নরম কাগজ

(খ) পেপার বোর্ড

(গ) ফাইবার বোর্ড

(ঘ) প্লাস্টিক ব্যাগ

(ঙ) নেটের থলে

(চ) কাগজ বা প্লাস্টিকের ফ্লিপের আস্তর দেয়া থলে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মোড়ক–

বিভিন্ন মোড়ক দ্রব্যের ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

(১) নরম কাগজ ও খড়-যেমন খবরের কাগজ, খড় ও বাঁশ সংগ্রহ করতে হবে। এগুলো মোড়ক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার সাশ্রয়ী, ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং সহজলভ্য। এগুলো পরিষ্কার করা যায় না বরং ভেঙ্গে বা নষ্ট হয়ে যায়।

(২) পেপার বোর্ড কাগজের চেয়ে মোটা, শক্ত যা দ্বারা কার্টন বা প্যাকেট তৈরি করা হয় এবং তার মধ্যে পণ্য সংরক্ষণ করা হয়। এ ধরনের প্যাকেট পরিবহনে বাইরের আঘাত সহ্য করতে পারে। এ ধরনের প্যাকেট একটার উপর আরেকটা গাদাগাদি করে রাখা যায় না। প্যাকেট ভেঙ্গে যায়।

(৩) নরম কাঠের বাক্স বেশ টেকসই হয় এবং গাদা করে রাখা যায় তবে অনেক সময় কাঠ বা কাঠ জাতীয় বাক্সের পণ্য হতে পানি চুষে নেয় ফলে পণ্যের মান খারাপ হয়ে যায়। এটি বহন করা কষ্টসাধ্য।

(৪) ফাইবার বোর্ডে কাগজের কয়েকটি স্তর থাকে। একে ঢেউতোলা কার্ডবোর্ডও বলে। এ ধরনের বাক্সকে খুলে রাখা যায়। কিন্তু পানিতে ভিজে গেলে নষ্ট হয়ে যায়।

(৫) পলিথিনের ব্যাগ মোড়ক হিসেবে উন্নতমানের তবে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তবে পলিথিন বর্জ্য রিসাইকেল করা গেলে ক্ষতির কারণ নেই।

(৬) নেটের ব্যাগে অল্প পরিমাণ পণ্য নেয়া যায়। এতে নরম ফল ও সবজি রাখা যায় না। নেট তৈরিতে খরচ কম হয়।

(৭) কাগজ বা প্লাস্টিক ফ্লিপের আস্তর দেয়া ব্যাগের ভিতর পণ্য রাখলে তা ভালো থাকে এবং পণ্যের জলীয় পদার্থ দ্রুত শুকায় না।

সতর্কতা

১। সব সময় পুরোনো মোড়ক ব্যবহার না করে নতুন মোড়ক দেখাতে হবে।

২। বর্ণিত উপকরণ ছাড়াও স্থানীয়ভাবে নতুন কোনো মোড়ক ব্যবহার করা গেলে তা উল্লেখ করা যাবে।

অনুশীলনী-৬ : প্যাকিং শেডের কার্যক্রম অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

প্যাকিং শেডে মাঠ থেকে তুলে আনা টাটকা পণ্যসামগ্রী একত্র করা, প্যাক করা, কখনো কখনো সাময়িকভাবে গুদামজাত করা হয়। এখান থেকে দূরবর্তী শহরের বাজার, রাজধানী বাজার এবং অন্যান্য বড় ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

(১) পণ্যের আকার নির্ধারণী রিং

(২) প্যাকিং স্ট্যান্ড বা টেবিল

(৩) গোলাকার ঘূর্ণায়মান টেবিল

(৪) প্যাকিং বাক্স

(৫) পানির ট্যাঙ্ক

(৬) পানি

(৭) অমোচনীয় কালি

(৮) কলম বা মার্কার কলম

(৯) টাটকা ফল বা সবজি

(১০) দাঁড়িপাল্লা বা ওয়েট ব্যালেন্স

(১১) বাঁশ ও তাঁবু

প্যাকিং শেডের কার্যক্রম নিম্নরূপ :

(১) মাঠ থেকে সদ্য তুলে আনা ফল বা সবজি প্যাকিং হাউজের ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত জায়গায় একত্র করতে হবে।

(২) ট্যাংকের পানিতে ফল ও সবজিগুলোকে ভালোভাবে ধুতে হবে। ফল ও সবজির অতিরিক্ত অংশ ছেঁটে ফেলে দিতে হবে।

চিত্র : প্যাকিং শেড

(৩) পোকাক্রান্ত, রোগাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, বিকৃত ও অপুষ্ট ফল বা সবজিকে বাছাই করে আলাদা করে ফেলতে হবে।

(৪) আকার নির্ধারণী রিং অথবা দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে পণ্যসামগ্রীর আকার বা ওজন অনুযায়ী গ্রেডিং করতে হবে। পরিপক্কতার অবস্থা ও রং অনুযায়ী পণ্যকে গ্রেডিং বা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে।

(৫) ফল ও সবজির আকার, ধরন ও বাজার চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিং বাক্সের ভিতর পণ্যগুলোকে মজবুতভাবে স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি প্যাকেট পণ্য দিয়ে ভরা থাকবে। অর্থাৎ ফাঁকা থাকবে না। কিন্তু উপচে পড়ার মতো ভরা হবে না। পণ্যসামগ্রী বাক্সে ভরার সময় হালকা চাপ দিয়ে ভরতে হবে। বাক্সের ভেতরের দেয়াল নরম জিনিস বা কাপড়ের প্যাড দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। প্রতিটি ফল নরম জিনিস দিয়ে মুড়ে দিতে হবে।

(৬) প্যাকিং সম্পন্ন প্যাকেটের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে অমোচনীয় কালি বা মার্কার দিয়ে লেবেল লাগাতে হবে। যাতে পণ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে।

(৭) প্যাক করা পণ্যসামগ্রী গন্তব্যস্থানে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত প্যাকিং হাউজের ঠান্ডা স্থান বা ঘরে সংরক্ষণ করতে হবে। নিম্নে প্যাকিং শেডের কার্যক্রমের ফ্লোচার্ট দেয়া হলো :

প্যাকিং শেডের কার্যক্রমের ফ্লো-চার্ট

সতর্কতা :

(১) বাছাই, গ্রেডিং ও প্যাকিং ইত্যাদি কার্যাদি সাবধানতার সাথে করতে হবে। যাতে পণ্যের গায়ে আঘাত না লাগে।

(২) বেশি পাকা ও কাঁচা ফল একত্রে প্যাকিং করা যাবে না।

অনুশীলনী-৭ : কলা সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কলা ক্লাইমেকটরিক শ্রেণির ফল। কলা পরিপুষ্ট হওয়ার পর গাছ থেকে কেটে সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ব হলে কলার অগ্রভাগে কালচে রঙের ফুলের গর্ভদণ্ড শুকিয়ে পড়ে যায়। বাকলের উপরের শিরাগুলো ভরে গিয়ে কলা পরিপুষ্ট হয়। পরিপক্বতার বিভিন্ন পর্যায় কলার কোষের যে আকার ও আকৃতির পরিবর্তন হয় তা নিচের চিত্রে দেখানো হলো। এ সময় কলার বোঁটার দিকে হলুদ হতে থাকে। এ শ্রেণির ফল পাকা শুরু হলে অল্প সময়ের মধ্যেই সবগুলো পেকে যায় এবং ২-৩ দিনের মধ্যে বাকল অতিরিক্ত পেকে কালো হয়ে নষ্ট হতে শুরু করে। এ জন্য কলা বাজারজাত করতে যতটা সময় লাগবে তা হাতে নিয়ে গাছ হতে কলা পাড়তে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. কাঁদিসহ কলাগাছ
২. কাস্তে বা দা
৩. মই
৪. ঝুড়ি
৫. পলিথিনের লাইনিং দেয়া ফাইবার বোর্ডের প্যাকিং বাক্স
৬. পানির ট্যাংক ও পানি
৭. থাইয়োবেনডাজল (টিবিজেড) অথবা
৮. ফিটকিরি
৯. ইথাইলিন
১০. প্যাকিং ঘর

চিত্র : কলার পরিপক্বতার বিভিন্ন পর্যায় (ফলের প্রস্থচ্ছেদ)

কলা সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হবে–

(১) পরিপক্ব কলা দু'জনে মিলে পাড়তে হবে। আঘাতের হাত থেকে রক্ষার জন্য কলা গাছের উচ্চতার অর্ধেকের কিছুটা উপরে এক পাশের কিছু অংশ কাস্তে বা দা দিয়ে কেটে দিতে হবে। এতে গাছটি কলার কাঁদিসহ কাটা স্থান থেকে আস্তে আস্তে নুয়ে পড়বে। এ সময় কাঁদিটি সাবধানে সংগ্রহ করতে হবে।

২০১০

(২) কাটা কলার কাঁদি ঝুড়িতে ভরে, মাথায় করে অথবা হাতে বহন করে অথবা অন্য কোনো যানবাহনে করে প্যাকিং শেডে নিয়ে আসতে হবে।

(৩) প্যাকিং শেডে আনার পর কাদির ছড়াগুলো পরীক্ষা করতে হবে। ছড়ার প্রতিটি কলার আকার, আকৃতি ও দাগত্রুটি ইত্যাদি ভালোভাবে দেখে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিং করতে হবে।

(৪) কলার ছড়া কাঁদি থেকে কেটে পৃথক করতে হবে। এ সময়ে কাটাস্থান দিয়ে কস বের হয়ে কলার গায়ে লেগে রঙ ও চেহারা নষ্ট করে দেয়। এ অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য কাটার পর পরই ছড়াগুলো পানির ট্যাংকে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এছাড়া কষ পড়া বন্ধ করার জন্য কাটা জায়গায় ফিটকিরি লাগানো যেতে পারে।

(৫) কলার ধুলা, ময়লা ও কষ ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ফলের সঙ্গে লেগে থাকা ফুলের অংশ ফেলে দিতে হবে এবং খুঁতওয়ালা ফলগুলো ছড়া থেকে কেটে সরিয়ে নিতে হবে।

(৬) পানির ট্যাংক থেকে ছড়াগুলো তুলে নিয়ে তলায় ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে রাখতে হবে। এগুলোর উপর স্প্রেয়ার মেশিন দিয়ে থাইয়ো বেনডাজোল অথবা ইমাজেলিল নামক ছত্রাকনাশক স্প্রে করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

(৭) কলার ছড়াকে পলিথিনের লাইনিং বা আবরণ দেয়া ফাইবার বোর্ডের বাক্সে প্যাক করতে হবে। তবে মোড়কটির ওজন ১৮ কেজির বেশি যেন না হয়।

(৮) বাজারের কাছাকাছি জায়গায় নিয়ে কলা পাকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কলাকে একই সাথে সমানভাবে পাকানোর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কক্ষে রাখতে হবে।

(৯) ইথাইলিন ব্যবহার করলে কলা তাড়াতাড়ি পাকে। কলা পাকানো কক্ষে কৃত্রিম তাপ সৃষ্টি ও ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ কক্ষের ভিতর বাতাস সঞ্চালনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে যাতে ইথাইলিন গ্যাস ভালভাবে ছড়ানো যায় এবং শ্বসনজনিত সৃষ্ট তাপ বেরিয়ে যায়। কলা পাকানোর কক্ষের তাপমাত্রা ১০.৫-১৬.৫$^{0}$ C বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০-৯৫% এবং ইথাইলিনের পরিমাণ ১০০-১০০০ পিপিএম রাখতে হবে।

সতর্কতা

১। গাছ থেকে কলা সংগ্রহ, প্যাকিং করে আনা ধৌত করা, পরিষ্কার করা এবং প্যাকিং -এর সময় কোনো আঘাত লাগানো যাবে না।

২। কলা কখনো বেশি সময় ধরে ১৩$^{0}$C তাপমাত্রার নিচে রাখা যাবে না।

৩। কলা স্তূপাকারে বেশি উঁচু করে রাখা উচিত না।

## অনুশীলনী-৮ : আম সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার অনুশীলন

### প্রাসঙ্গিক তথ্য

আম একটি ক্লাইমেকটরিক শ্রেণির ফল। পরিপক্বতা লাভের পর হঠাৎ আমে শ্বসন হার বেড়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে পেকে নরম হয়ে যায়। এ জন্য আম দূরবর্তী বাজারে প্রেরণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি পেকে ওঠার আগেই যাতে বাজারে পৌঁছে যায়, সে হিসেব করে ফল পাড়তে হয়। সাধারণত ফুল আসার ৫-৬ মাসের মধ্যেই আম সংগ্রহের উপযোগী হয়। গাছের সব আম একসাথে পাকে না। দুইচারটা আমের রং হলুদ হয়ে এলেই ফল পাড়া হয়। তবে জাতভেদে এ রঙের তারতম্য দেখা যায়। দূরের বাজারে পাঠানোর জন্য রং ধরার আগেই আম পাড়তে হয়।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ :

(১) ফলন্ত আমগাছ
(২) লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা শক্ত সুতা দিয়ে হাতে বোনা বা ক্যানভাস বা মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি ফল পাড়ার থলে।
(৩) ফল পাড়ার ঝুড়ি
(৪) প্যাকিং ঘর
(৫) আকার নির্ধারণী রিং
(৬) পানির ট্যাংক ও পানি
(৭) প্যাকিং টেবিল
(৮) টি.বি.জেড অথবা ইমাজেলিল (ছত্রাকনাশক)
(৯) বহু কক্ষ বিশিষ্ট ফাইবার বোর্ডের প্যাকেট।

আম সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে :

(১) পরিপক্ব আম উপরে উল্লেখিত ফল পাড়ার থলের সাহায্যে পাড়তে হবে। এ ব্যবস্থায় আমকে সম্পূর্ণ অক্ষর রাখা ও রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
(২) পাড়া আম ফল পাড়ার ঝুড়ি বা বাক্সে ভরে, মাথায় করে অথবা ট্রলিতে করে প্যাকিং করার ঘরে পাঠাতে হবে।
(৩) এ সময় আম থেকে প্রচুর পরিমাণ কষ বেরুতে থাকে। এজন্য আমকে পানির ট্যাংকে চুবিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আমের অ্যানথ্রাকনোজ রোগ প্রতিরোধের জন্য এ পানিতে থাইয়ো বেনডাজোল (টি.বি.জে) বা ইমাজেলিল নামক ছত্রাকনাশক ০.১% হিসেবে মেশাতে হবে।
(৪) পানি থেকে আম তুলে রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত অতি পাকা ও অতি কাঁচা ফলগুলোকে বাছাই করে ফেলে দিতে হবে। তারপর আমকে খালি চোখে অথবা পণ্যের আকার নির্ধারণী রিং এর সাহায্যে আকার অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করতে হবে।
(৫) আমগুলোকে বহু কক্ষ বিশিষ্ট ফাইবার বোর্ডের বাক্সে এক বা একাধিক স্তরে সাজাতে হবে। দূরবর্তী বাজারে পাঠানোর জন্য যে বাক্স ব্যবহার করা হবে তা অবশ্যই শক্ত হবে। যাতে পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সময় ফলের কোনো ক্ষতি হবে না।

সতর্কতা

(১) ফল পাড়া, প্যাকিং ঘরে আনা, ধোয়া, বাছাই করা, শ্রেণিবিন্যাস করা, প্যাকিং করা ও বাজারে পৌঁছানোর কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হবে যাতে ফলের গায়ে আঘাত না লাগে।

(২) পরিবহনকালে বা সাময়িকভাবে সংরক্ষণকালে মোড়ক বা প্যাকেটের ভিতরে সৃষ্ট তাপ যেন বের হয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুশীলনী-৯ : আনারস সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন

প্রাথমিক তথ্য

আনারস একটি যৌগিক ফল অর্থাৎ একটি আনারস অনেকগুলো ফলের সমষ্টি। আবার আনারস একটি নন ক্লাইমেকটরিক ফল। অপরিপক্ব ফল সংগ্রহ করলে তা পেকে ওঠে না এবং নষ্ট হয়ে যায়। তাই আনারস অবশ্যই সুপরিপক্ব অবস্থায় থাকতে শুরু করলে সংগ্রহ করতে হয়। ফল পাকতে শুরু করলে এর গোড়ার দিকের রং সবুজ থেকে হলুদ অথবা হালকা বাদামি হয়ে যায়। ফলের অম্লত্ব কমতে থাকে এবং বাইরের আবরণে ক্লোরোফিলের পরিমাণ দ্রুত কমতে থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. ফলন্ত আনারস গাছ
২. ধারালো দা বা ছুরি
৩. ফল রাখার পাত্র বা ঝুড়ি
৪. প্যাকিং করার টেলিসকোপিক বাঙ
৫. টি.বি. জেড, কীটনাশক
৬. পানির ট্যাংক
৭. স্প্রে মেশিন

আনারস সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজগুলো অনুসরণ করতে হবে।

(১) আনারস পাকতে শুরু করলে ধারালো দা বা ছুরি দিয়ে ফলের বোঁটা কেটে আনারস সংগ্রহ করতে হবে।

(২) সংগৃহীত আনারস ফল পেড়ে রাখার পাত্রে রাখতে হবে।

(৩) মাথায় করে বা কোনো পরিবহন যানে প্যাকিং শেডে আনতে হবে।

(৪) রোগাক্রান্ত এবং আঘাতপ্রাপ্ত আনারসগুলোকে বেছে আলাদ করতে হবে।

(৫) আকার ও পরিপক্বতার উপর ভিত্তি করে আনারস শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। আকার অনুযায়ী আনারসকে নিম্নোক্ত শ্রেণি বা গ্রেডে ভাগ করা যায়। চোখে দেখে বা আকার নির্ধারণী রিং বা ওয়েট ব্যালান্স দিয়ে গ্রেডিং করতে হয়। যথা–

| গ্রেড | | ফলের ওজন |
|---|---|---|
| ১. | এ | ১৫০০ গ্রাম ও তার উপর |
| ২. | বি | ১১০০ হতে ১৫০০ গ্রাম |
| ৩. | সি | ৮০০-১১০০ গ্রাম |
| ৪. | ডি | ৮০০ গ্রামের নিচে |
| ৫. | বেবি আনারস | ৫০০ গ্রামের কাছাকাছি |

আবার বাহ্যিক পরিপক্কতার মাত্রানুযায়ী ফলকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। চোখে দেখে ফলের পরিপক্কতার মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।

| গ্রেড | | ফলের ওজন |
|---|---|---|
| ১. | এম-১ | ফল প্রায় পুরো পাকা অবস্থায় |
| ২. | এম-২ | আধা পাকা ফল |
| ৩. | এম-৩ | কাঁচা ফল |

(৬) আনারসের ট্রিস্টার রোগ প্রতিরোধের জন্য টি.বি. জেড মিশ্রিত পানিতে ডিজিয়ে রাখতে হয় অথবা টি.বি. জেড মিশ্রিত পানি স্প্রে করতে হয়।

(৭) প্যাকিং বাক্সে আনারসের বোঁটা নিচের দিকে দিয়ে প্যাক করতে হয়। তবে ফলগুলোকে সমান্তরালভবে পাশপাশি রেখে মাথাগুলো বিপরীতমুখী করে সাজিয়ে ও প্যাক করা যাবে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আকারে প্যাকেট করা যাবে।

| | | |
|---|---|---|
| ১. | আকার 'এ' | প্রতি প্যাকেটে ৮ টা ফল |
| ২. | আকার 'বি' ও 'সি' | প্রতি প্যাকেটে ১২টা ফল |
| ৩. | আকার 'ডি' | প্রতি প্যাকেটে ২০ টা ফল |

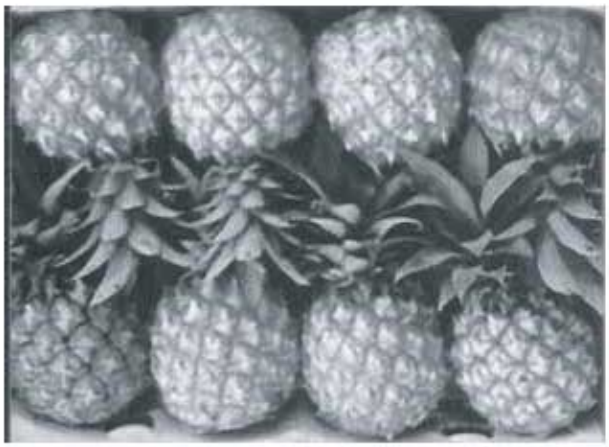

চিত্র : প্যাকিং বাক্সে আনারস সাজানো

(৮) প্যাকিং বাক্সে সাধারণত ৫ কেজি করে আনারস সাজানো হয়ে থাকে।

(৯) পরিবহনকালে নাড়াচড়া করার সুবিধার জন্য প্যাকেটের গায়ে নিম্নের তথ্যাবলি দিয়ে লেবেল লাগাতে হবে–

- যে দিক উপরে থাকবে তার চিহ্ন
- ভঙ্গুরতার চিহ্ন
- তাপের চিহ্ন এবং তাপ ও আর্দ্রতায় রাখতে হবে তার নির্দেশ

(ক) পরিপক্ব সবুজ ফলের জন্য ১০-১৩$^0$C
(খ) পাকা ও আধাপাকা ফলের জন্য ৭-১০$^0$C
(গ) সব ফলের জন্য আর্দ্রতা ৮৫-৯০%

(১০) পরিবহনকালে উঠানো নামানোর সময় লেবেলের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। অতিরিক্ত ঝাঁকুনিতে ফলের গায়ে যাতে ক্ষতি না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

সতর্কতা
(১) মাঠ হতে অপক্ব আনারস তোলা যাবে না। কারণ এগুলো পাকবে না।
(২) ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় আনারস ৪ সপ্তাহ ভালো থাকে।

অনুশীলনী-১০ স্টীপিং (Steeping) পদ্ধতিতে সবুজ ফল সংরক্ষণ অনুশীলন
প্রাসঙ্গক তথ্য
কোন সংরক্ষক দ্রবণে ফল ও সবজি ডুবিয়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বলে। গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড, পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট (KMS) ও লবণ নির্দিষ্ট অনুপাতে পানিতে মিশিয়ে সংরক্ষক দ্রবণ তৈরি করা হয়। কাঁচা আম, জলপাই, আমড়া, আমলকী ফল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৯-১২ মাস কাল পর্যন্ত স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত ফলসমূহ পরবর্তীতে আচার, চাটনি, বা অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষক মূল্যবান ফলের অপচয় রোধ করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :
১. ঢাকনাসহ প্লাস্টিক ড্রাম বা কনটেইনার যা অবশ্যই বায়ুরোধী হবে।
২. আঠাযুক্ত বড় ধরনের টেপ
৩. গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড
৪. কে.এম.এস
৫. লবণ ও পানি

স্টীপিং পদ্ধতি অনুশীলন করার জন্য নিম্নের কাজগুলো অনুসরণ করতে হবে :
(১) পরিপুষ্ট কাঁচা ফল সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।
(২) ফলের আকার অনুযায়ী ফল কেটে বা আস্ত অবস্থায় ফল সংরক্ষণ করা যায়। অপুষ্ট বীজ মুক্ত কাঁচা আমের ক্ষেত্রে দুই বা চার টুকরায় কেটে বীজ ও বীজের খোসা ফেলে দিতে হবে। পুষ্ট বীজযুক্ত আমের ক্ষেত্রে আমগুলো লম্বা লম্বিভাবে তিন টুকরা করে কাটতে হবে।

(৩) স্টীপিং দ্রবণ তৈরির জন্য ৮% লবণ, ১.২৫% গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড এবং ০.১% পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট ব্যবহার করতে হবে। ১ কেজি দ্রবণ তৈরির জন্য ৮০ গ্রাম লবণ, ১২.৫ গ্রাম গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড এবং ১ গ্রাম (KMS) ৯০৬.৫ গ্রাম পরিষ্কার পানিতে মিশাতে হবে।

(৪) প্লাস্টিক ড্রাম বা কন্টেইনারটি পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ৮০-৯০$^0$C তাপমাত্রার পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

(৫) ফল বা ফলের টুকরা জীবাণুমুক্ত ড্রামে রেখে স্টীপিং দ্রবণ যোগ করতে হবে। প্রতি কেজি ফল বা ফলের স্লাইসের জন্য ১.২৫ থেকে ১.৫ কেজি দ্রবণ প্রয়োজন হবে।

চিত্র: স্টীপিং দ্রবণে ফল সংরক্ষণ

(৬) দ্রবণ ও ফলভর্তি পাত্রের মুখে ঢাকনা লাগিয়ে দিয়ে সংযোগস্থলের উপর দিয়ে আটাযুক্ত টেপ ভালোভাবে লাগাতে হবে যাতে পাত্রটি বায়ুরোধী হয়।

(৭) পাত্র অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৮) ব্যবহারের পূর্বে দ্রবণে সংরক্ষিত ফল বা ফলের টুকরাগুলো পরিমিতভাবে পানিতে ধুতে হবে। তারপর ৮০$^0$C তাপমাত্রায় পানি গরম করে তাতে ৩ মিনিট ফলগুলো হালকাভাবে নাড়াচাড়া করে ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা

(১) কন্টেইনারটি উত্তমরূপে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

(২) দ্রবণের উপাদানগুলো সঠিকভাবে মিশাতে হবে।

২০২০

## অনুশীলনী-১১: অপরিপক্ব বীজযুক্ত সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন

### প্রাসঙ্গিক তথ্য

অপরিপক্ব বীজযুক্ত সবজি বলতে যে সকল সবজি পাকার পূর্বেই তুলে খাওয়া হয়। অর্থাৎ এ সকল সবজির উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিপক্বতার পূর্বেই বাণিজ্যিক পরিপক্বতা লাভ করে। এসকল সবজিগুলো নিম্নরূপ–

(১) শুটি জাতীয়- শিম, মটরশুঁটি, বরবটি, ফেলন ইত্যাদি।

(২) কুমড়া জাতীয়- কুমড়া, লাউ, শসা, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা।

(৩) বেগুন পরিবারের সবজি- বেগুন, মরিচ।

(৪) অন্যান্য সবজি- ঢেঁড়স।

এ সবজিগুলো দীর্ঘ সময় গুদামে রাখার উপযোগী নয়। অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের অধিকাংশ সবজির গায়ের চামড়া নরম থাকে, যার জন্য নড়াচড়া করার সময় সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ সকল সবজির আকার ও রঙ দেখেই অধিকাংশ সবজি গাছ থেকে তোলা হয়। এসব সবজির মধ্যে কতকগুলো বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বেশি অপরিপক্ব বা কচি অবস্থায় তোলা হয়। যেমন- লাউ, শসা, ঢেঁড়স ইত্যাদি। শসার ক্ষেত্রে শসা যত কচি হবে ততই তার বাণিজ্যিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে কারণ শসা সাধারণত কাঁচা অবস্থায় সালাদ হিসেবেই বেশি খাওয়া হয়।

### প্রয়োজনীয় উপকরণ

(১) ছুরি বা কাস্তে বা পাতলা দা

(২) ঝুড়ি বা ডালা বা টুকরি

(৩) সবজি ক্ষেত

(৪) প্যাকিং বাক্স বা ঝুড়ি

(৫) ছত্রাকনাশক

অপরিপক্ব (কচি) সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে :

(১) সবজিগুলোকে ধারালো ছুরি বা কাস্তে দিয়ে বোঁটা কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

(২) সবজি সংগ্রহের সাথে সাথে এগুলোকে ঝুড়িতে করে প্যাকিং হাউজে নিতে হবে।

(৩) প্যাকিং হাউজে আঘাতজনিত ক্ষতসহ আঁকা বাঁকা, অসমান ও দেখতে ভালো নয় এমন সবজি বেছে ফেলে দিতে হবে। তাছাড়া চাহিদার চেয়ে নিম্নমানের পণ্যও বেছে ফেলে দিতে হবে।

(৪) সবজির আকার, আকৃতি ও চেহারা দেখে শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। চোখে দেখে ও স্কেল দিয়ে মেপে পণ্যের আকার নির্ধারণ করতে হবে।

(৫) খাওয়ার অসুবিধা হবে না এমন মাত্রায় মোমের প্রলেপ শসা, বেগুন, মিষ্টি মরিচ ও ঢেঁড়সে দেয়া যাবে। খাওয়ার অসুবিধা হবে না এমন মাত্রার মোমের আস্তরণ সাথে অল্প মাত্রার ছত্রাকনাশক দেয়া যেতে পারে।

(৬) বাজারজাত করার জন্য শিম, শসা, বেগুন, মরিচ, মিষ্টি মরিচ, ঢেঁড়স ইত্যাদি কার্ডবোর্ডের কার্টন প্যাকিং করতে হবে। বিদেশে পাঠাতে হলে কাঠের তৈরি বাক্সে প্যাকিং করে শিপিং কন্টেইনারে পাঠাতে হবে।
(৭) পণ্যের ভেতর যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিম, ঢেঁড়স প্রভৃতি সবজি পানিতে ডুবিয়ে বা পানি ছিটিয়ে ঠান্ডা রাখতে হবে।
(৮) পণ্য পরিবহনকালে উঠানো-নামানো কাজ খুব সাবধানে করতে হবে। যাতে পণ্য আঘাত না পায়।

সতর্কতা

(১) পন্য সংরক্ষণ ও পরিবহনের সময় সবজি ও ফল একই সাথে রাখা যাবে না। কারণ ফল ইথিলিন উৎপন্ন করে যা সবুজ সবজিকে তাড়াতাড়ি বিবর্ণ করে।
(২) সাময়িকভাবে সংরক্ষণকালে বেগুন, শসা, লাউ, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, করলা, ঢেঁড়স ১০$^0$C-১২.৫$^0$C তাপমাত্রায়, মরিচ- ৫-৭$^0$C তাপমাত্রায় এবং সবুজ শিম ৫-৮$^0$C তাপমাত্রায় এবং সকল সবজি ৯০-৯৫% আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুশীলন-১২ : পরিপক্ব বীজযুক্ত সবজিসমূহের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বেশির ভাগ সবজিই অপরিপক্ব বা কচি অবস্থায় ভক্ষণ করা হয়ে থাকে। পরিপক্ব বীজযুক্ত সবজির মধ্যে টমেটো ও মিষ্টি কুমড়া অন্যতম। এই সবজি দুটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব। এগুলোর বাণিজ্যিক ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিপক্বতা একই সাথে হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো সময় কচি অবস্থায়ও এগুলো ভক্ষণ করা হয়। পরিপক্ব বীজযুক্ত সবজি সাধারণত রং দেখে গাছ থেকে তোলা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

(১) ছুরি বা কাস্তে
(২) ঝুড়ি বা জালি বা টুকরি
(৩) সবজি ক্ষেত
(৪) প্যাকিং বাক্স বা ঝুড়ি
(৫) পানির ট্যাংক ও পানি
(৬) আকার নির্ধারণী রিং
(৭) দাঁড়িপাল্লা
(৮) মোম

পরিপক্ব সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনের জন্য নিচের কাজগুলো করতে হবে।

(১) পরিপক্ব বীজযুক্ত সবজির মধ্যে মিষ্টি কুমড়া ছুরি বা কাচি দিয়ে বোঁটা থেকে কেটে সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু টমেটো হাত দিয়ে উপরের দিকে একটু টান দিলেই বোঁটার ভঙ্গুর স্থান থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

(২) সবজি সংগ্রহের পর সেগুলোকে ঝুড়ি, টুকরি বা ট্রলিতে করে প্যাকিং শেডে নিতে হবে। তবে মিষ্টি কুমড়া মাঠেও প্যাকিং করা যায়।

(৩) সবজিকে ঠান্ডা ও পরিষ্কার করার জন্য পানির ট্যাংকে ডোবাতে হবে।

(৪) বাছাই করে বেশি পাকা, বিকৃত ও ক্ষতযুক্ত সবজি ফেলে দিতে হবে।

(৫) চাহিদা অনুযায়ী সবজিকে শ্রেণিবিন্যাস বা গ্রেডিং করতে হবে। মেপে বা নির্ধারণী রিং দিয়ে বা চোখের আন্দাজে গ্রেডিং করা যাবে।

(৬) খাওয়ার অসুবিধা হবে না এমন মাত্রায় মোমের প্রলেপ দিতে হবে।

(৭) প্লাস্টিক বা ফাইবার বোর্ডের বাক্সে পণ্য প্যাক করে বাজারজাত করতে হবে।

(৮) পণ্যের ভিতর বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

## সতর্কতা

(১) মিষ্টি কুমড়া ১২.৫-১৫$^0$C তাপমাত্রা ও ৬০-৭০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এবং টমেটো তাপমাত্রায় ১০-১২.৫$^0$C তাপমাত্রায় ও ৮৫%-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় রাখতে হবে।

## অনুশীলন-১৩: মাইক্রো ওভেন ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন

### প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাইক্রোওয়েভ হচ্ছে উচ্চ কম্পনের বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় তরঙ্গ যা ওভেনের ভিতর সুষমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ ওভেনের ভিতরের অংশে প্রতিফলিত হয়ে গ্লাস ট্রেতে রাখা খাদ্যদ্রব্যের ভিতরে অবস্থিত পানির কণায় প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করে খাদ্যদ্রব্যকে রান্না করে। সাধারণ রান্নার মতোই সবকিছু কুটে বেছে একত্র করে ওভেনে বসিয়ে দিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রান্না হয়ে যায়। প্রথম প্রথম একটু সময় বেশি দিলে পুড়ে যেতে পারে তাই নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই খাদ্য বের করে আনলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে ওভেনের দরজা খুলে রান্না দেখা যায়। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের বিভিন্ন অংশগুলো নিম্নরূপ–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | ওভেনের দরজার ছিটকিনি | (২) | ওভেনের সিল |
| (৩) | ওভেনের ভিতরের অংশ | (৪) | স্প্যাটার শিল্ড |
| (৫) | সেফটি ইন্টারলক সিস্টেম | (৬) | ওভেনের দরজা খোলার বাটন |
| (৭) | গ্লাস ট্রে | (৮) | রোলার গাইড |
| (৯) | ওভেনের দরজার স্বচ্ছ আবরণ | | |

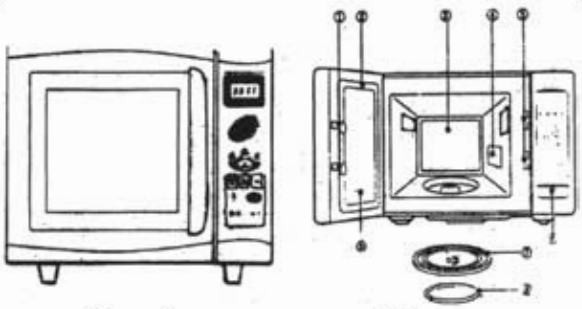

চিত্র: মাইক্রোওভেন ও তার বিভিন্ন অংশ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

(১) মাইক্রোওয়েভ (২) রান্নার পাত্র যেমন- গ্লাস বা ক্রিস্টালের পাত্র বা মৃৎপাত্র বা চিনামাটির পাত্র বা প্লাস্টিক পাত্র। (৩) খাবার যেমনঃ- কেক তৈরির খামির (৪) গ্লাভস।

মাইক্রোওয়েভের দ্বারা রান্নার দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হবে।

(১) সিঙ্গার মাইক্রোওভেনের ইনপুট পাওয়ার ১.৩-২.৮ কিলোওয়াট আর আউটপুট ৯০০ ওয়াট। আউটপুট যত বেশি খাবার রান্নার সময় তত কম।

(২) খাবার পাতলা বা জলীয় উপাদান বেশি হলে রান্না দ্রুত হবে। খাবার যত ঘন যেমন- মাংসের টুকরা সিদ্ধ হতে দেরি হবে। ফ্রিজারের ঠাণ্ডা খাবার রান্না হতে দেরি হবে।

(৩) খাবারের পরিমাণ বেশি হলে সময়ও তত বেশি লাগবে।

(৪) মাইক্রোওয়েভে পাতলা এবং মসৃণ অংশ মোটা এবং অমসৃণ অংশের চেয়ে দ্রুত রান্না হয়। যেমন আস্ত মুরগির ডানাগুলো মুরগির বুকের অংশের চাইতে দ্রুত রান্না হবে। পাতলা অংশকে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে মুড়ে দিতে হবে যাতে পুড়ে না যায়।

(৫) রান্নার পাত্রের জন্য কাচ, চিনা মাটির পাত্র, কাগজের পাত্র প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করতে হয়।

(৬) রান্নার পাত্র ঢেকে দিতে হবে। যদি প্লাস্টিক র‍্যাপিং দিয়ে মুড়ে দেয়া যায় তবে দ্রুত রান্না হবে। তবে র‍্যাপিংটিতে ছোট ছোট ছিদ্র করে দিতে হবে।

(৭) নির্দিষ্ট সময় পর চুলা থেকে নামানোর পরও দেখা যায় খাদ্য ফুটছে, বলকাচ্ছে বা রান্না হচ্ছে এর কারণ খাদ্যের অন্তর্নিহিত তাপ। তাই রান্নার সময় এই তাপটিকেও হিসেবে ধরতে হবে।

সতর্কতা

(১) কখনই খাবার না দিয়ে খালি ওভেন ব্যবহার করা যাবে না।

(২) অতিরিক্ত রান্না হওয়া খাদ্য উত্তপ্ত হয়ে আগুন ধরে যেতে পারে তাই সঠিক পরিমাণ ও সঠিক সেটিং করে ওভেন ব্যবহার করতে হবে।

(৩) ওভেনের সিলে যেন ময়লা না জমে।

(৪) খোসাযুক্ত খাদ্য যেমন- আলু, টমেটো, ডিমের খোসা ফেলে দিতে হবে, অন্যথায় বিস্ফোরিত হতে পারে।

(৫) রান্নার পাত্রটি বেশি উত্তপ্ত হতে পারে তাই এ কাজে গ্লাভস ব্যবহার করা উচিত।

(৬) মাইক্রাওয়েভের নির্দেশিকা ভালোভাবে পড়ে রান্না শুরু করতে হবে।

অনুশীলন-১৪: প্রেসার কুকার ব্যবহার অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১৬৮১ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ডেনিস পেপিন এই কুকার ব্যবহার করেন বলে একে পেপিনের ডাইজেস্টারও বলা হয়। প্রেসার কুকারে পানির উপরিস্থ চাপ বাড়িয়ে এর স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে রান্না করা সম্ভব হয়। প্রেসার কুকারে বিভিন্ন অংশগুলো নিম্নরূপ-

(১) ঢাকনা

(২) অ্যালুমিনিয়ামের বডি

(৩) পিনভাল্‌ব বা ভাল্‌ব ওয়েট

(৪) বায়ু নিষ্কাশন ভাল্‌ব বা সেফটি ভাল্‌ব

(৫) রাবার প্যাড বা গ্যাসকেট

(৬) সহায়ক হাতল

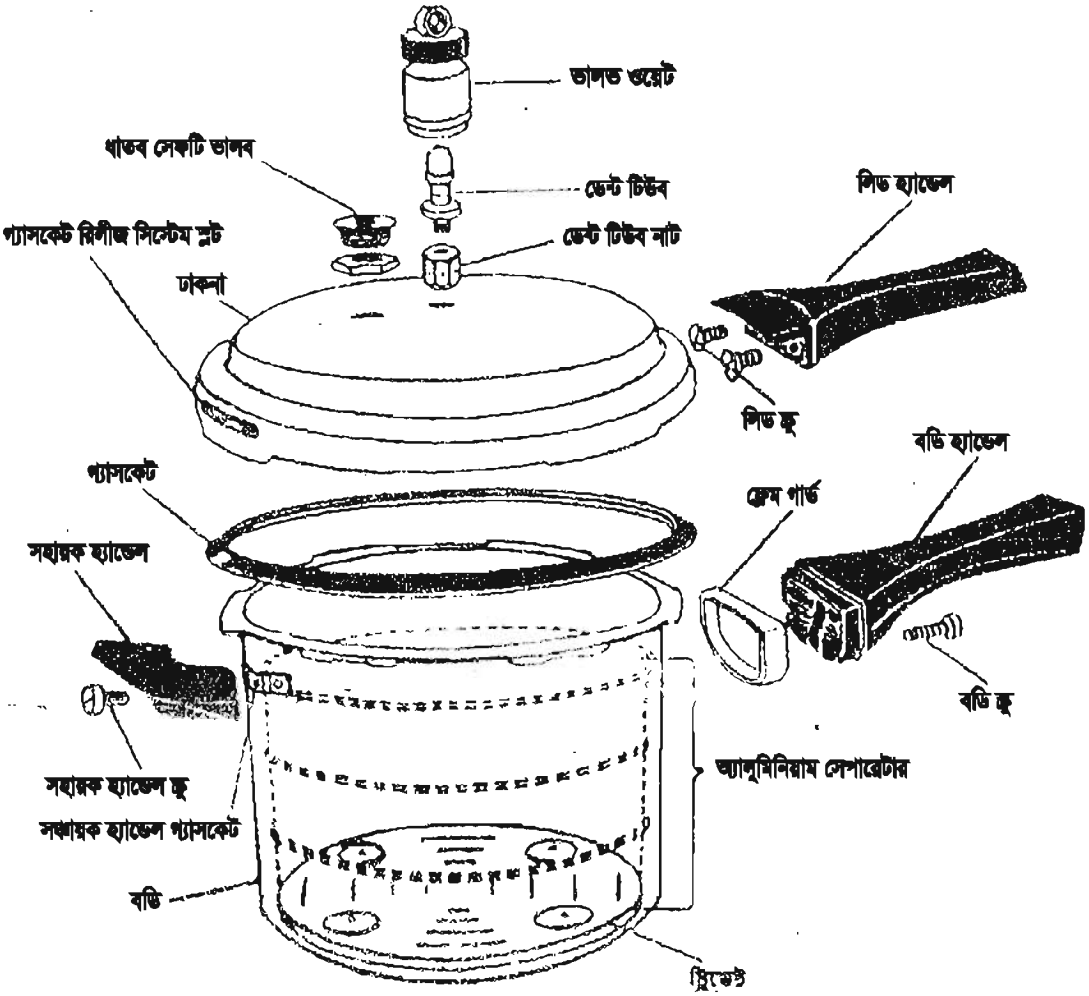


চিত্র: প্রেসার কুকারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ।

উপকরণ: একটি প্রেসার কুকার ও রান্নার জন্য খাবার।

প্রেসার কুকারে রান্নার দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

(১) প্রথমে প্রেসার কুকার ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

(২) তারপর এর ঢাকনা কৌশলে খুলে ফেলতে হবে। একটি রাবার বেষ্টনী বা গ্যাসকেট দ্বারা ঢাকনাকে কুকারের বডির সাথে বায়ুরোধী করে আটকে রাখা হয়।

(৩) বডির ভিতর প্রয়োজনীয় রান্নার উপকরণ ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে ঢাকনা সঠিক ভাবে লাগাতে হবে। বায়ুরোধী করে লাগালে ভিতর হতে কোনো বাষ্প বা বাতাস বের হতে পারে না।

(৪) এরপর কুকারটি চুলায় বসিয়ে দেয়া হয়। কুকারের ঢাকনায় দুইটি ছিদ্র থাকে। একটি ছিদ্র পিনভালভ বন্ধ করে রাখে, অন্যটি সেফটি ভাল্‌ভ দ্বারা বন্ধ থাকে। এই ভাল্‌ভ দ্বারা বাতাস বাষ্পের সাথে বেরিয়ে আসে।

(৫) কুকারে উৎপন্ন বাষ্পের চাপ বাড়লে সেফটি ভাল্‌ভ অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় কুকারের মধ্যে কোনো বাতাস থাকে না। এখন কুকারে তাপ দিতে থাকলে পানি থেকে উৎপন্ন বাষ্প ঢাকনায় বাধা খেয়ে ফিরে আসে এবং পানির উপর চাপ সৃষ্টি করে। এভাবে ক্রমাগত বাষ্প উৎপন্ন হবার ফলে পানির উপরের

২০২০

বাষ্প চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বাষ্পের এই বর্ধিত চাপ পানির কণাকে বাষ্পে পরিণত হতে বাধা দেয়। কিছুটা তাপ বেরিয়ে আসে এবং সব মিলিয়ে পাত্রের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। বর্ধিত এই তাপের কারণে খাদ্য অতি দ্রুত ও সহজে রান্না হয়।

(৬) যদি কোনো সময়ে বাষ্পের চাপ বেশি হয়ে পড়ে তাহলে পিন ভাল্‌ভ বা ভাল্‌ভ ওয়েট খুলে যায় ও কিছু বাষ্প বেরিয়ে আসে। এই বাষ্প বেরিয়ে যাবার ফলে অতিরিক্ত চাপ কমে যায়। এরপর আবার জ্বাল চলতে থাকে।

(৭) রান্না সম্পন্ন হলো কিনা তা এই বাষ্প বেরিয়ে যাবার বাঁশি বা শিষ শুনে বুঝা যায়। কোনো খাবার ৩-৪ শিষে রান্না হয়ে যায় আবার মাংস বা হাড়যুক্ত মাংস ৮-১০ শিষ পর্যন্ত দিয়ে রান্না সম্পন্ন করতে হয়। এ জাতীয় কুকারে রান্নার সময় ফিসফিস শব্দ শোনা যায়। বাষ্পের চাপ ওঠানামা করার সময় বাষ্প বেরিয়ে আসার কারণে এমন শব্দ হয়ে থাকে।

সতর্কতা

(১) কুকার চুলা থেকে নামানোর সাথে সাথেই ঢাকনা খোলা যাবে না।

(২) বেশি সময় রান্না হলে খাদ্যদ্রব্য নরম হয়ে গলে যেতে পারে।

(৩) চুলার জ্বাল বেশি বাড়ানো যাবে না।

## অনুশীলনী ১৫ : এগ্রোবেসড শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিচিতি ও ব্যবহার

প্রাসঙ্গিক তথ্য

একটি ছোট আকারের এগ্রোবেসড কারখানায় কাজ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। যার কতকগুলোর সচিত্র তালিকা নিম্নরূপ :

চিত্র : রেল মিটার

চিত্র : ট্রিপ হাইড্রোমিটার

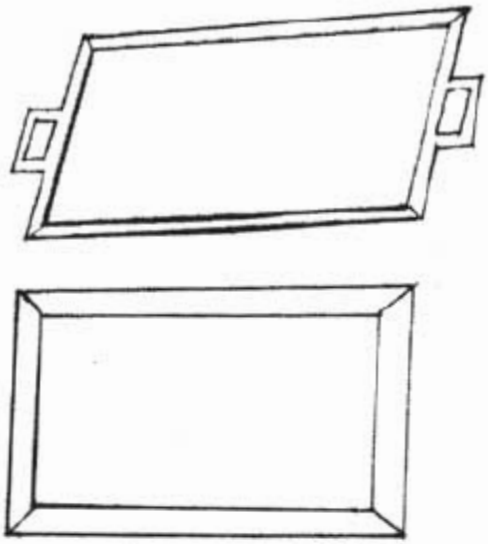

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের ট্রে

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার ওয়েট ব্যালান্স

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার ওয়েট ব্যালান্স

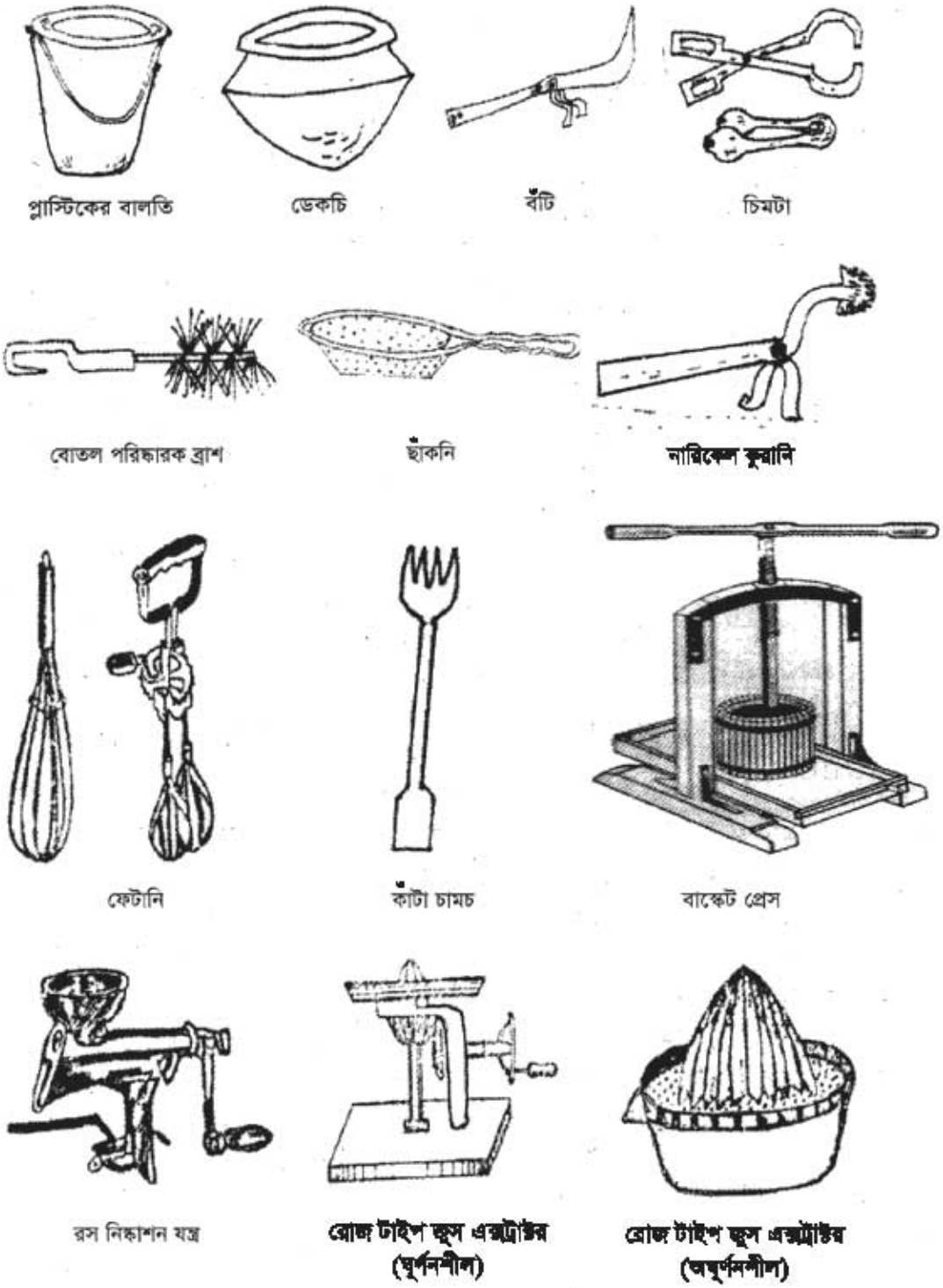


চিত্র : প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

২০২০

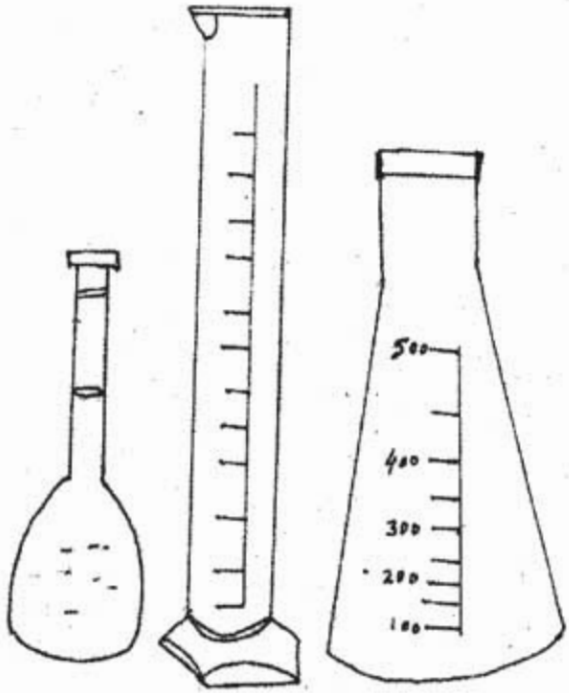


চিত্র : আয়তন মাপার সিলিন্ডার

(ক) ফল ও সবজিকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী করে তোলা।
(খ) ফলের রস নিষ্কাশন বা শাঁসের মণ্ড তৈরি।
(গ) বোতল বা টিনের পাত্র যৌতকরণ।
(ঘ) তরল খাদ্যদ্রব্য পাত্রে ভর্তি করা।
(ঙ) খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করা বা রান্না করা।
(চ) তৈরি খাদ্য বোতল বা টিনের পাত্রে ভর্তি করা।
(ছ) বোতল বা পাত্রের মুখ বন্ধ করা ও সীল করা।
(জ) পাত্রে লেবেল আঁটা, মোড়ক পরানো প্রভৃতি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

(১) ফল ও সবজি ধোয়ার ঝুড়ি ট্রে ও অ্যালুমিনিয়ামের বড় ডেকচি।
(২) অ্যালুমিনিয়ামের পাতে মোড়া বড় টেবিল ও বেঞ্চ।
(৩) বিভিন্ন ধরনের ছুরি।
(৪) বিভিন্ন সামগ্রী ও তৈজসপত্র, যেমন– মাপন কাপ, মগ, চামচ, কাটা চামচ, বালতি, ছাঁকনি হাতা, কাচের গ্লাস, বিকার, ফানেল, বাঁশের চালুনি, ট্রে, মাপন সিলিন্ডার, দা, বঁটি, দাঁড়িপাল্লা, বোতল পরিষ্কারের লাইলন ব্রাশ ইত্যাদি তৈজসপত্র।

উক্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও মালামালের প্রয়োজন হবে। নিম্নে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতির তালিকা ও সেগুলোর কাজ বর্ণনা করা হলো-

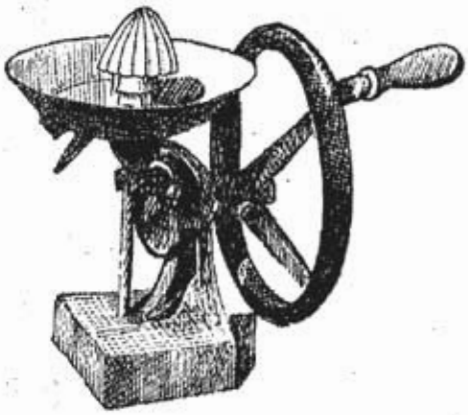

রস নিষ্কাশন যন্ত্র

মিক্স মাস্টার

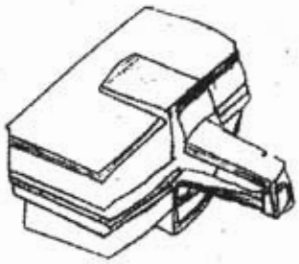

স্যান্ড উইচ মেকার

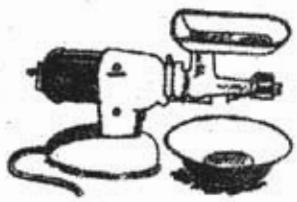

স্ক্রু টাইপ জুস এক্সট্রাকটর

স্লাইসার

লাইম জুস স্কুইজার

চিত্র : প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

২০২০

চিত্র : প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

২০২০

কোরার ও পাঞ্চার-আনারসের মাঝের অংশ ও আনারস গোল করে কাটার যন্ত্র।

(৬) ফেটানি ও কুরানি-ফেটানি ডিম ফেটার জন্য কুরানি নারিকেল বা সবজি কোরার জন্য ব্যবহার হয়।

(৭) বাস্কেট প্রেস-ফলের নিষ্কাশন করা হয়।

(৮) জুস এক্সট্রাক্টর-ফলের রস নিষ্কাশন করা হয়।

(৯) লাইম জুস এক্সট্রাক্টার-লেবুর রস নিষ্কাশন করা হয়।

(১০) স্ক্রু টাইপ জুস এক্সট্রাক্টার- রস নিষ্কাশন করা হয়।

(১১) রোড টাইপ এক্সট্রাক্টর- লেবুর রস নিষ্কাশন করা হয়।

(১২) মিক্স মাস্টার- কমলালেবুর বা ম্যান্ডারিনের রস নিষ্কাশন করা হয়।

(১৩) ক্রাশার- কাঠের রোলারের সাহায্যে ফলের রস নিষ্কাশন করা হয়।

(১৪) ব্লেন্ডার- বিভিন্ন ফলের শরবত তৈরির জন্য ব্যবহার হয়।

(১৫) গ্রাইন্ডার-হলুদ, মরিচ গুড়া করা হয়।

(১৬) মিনসার- সবজি ছোট ছোট টুকরায় পরিণত শাঁস বের করা হয়।

(১৭) পাল্পার- টমোটো, আম বা অন্যান্য ফলের শাঁস বের করা হয়।

(১৮) স্ট্রেইনার-ছাঁকনির কাজ করা হয়।

(১৯) হ্যান্ড স্লাইসার (কাঠের ও স্টিলের) হাতে সবজি কাটা হয়।

(২০) জেল মিটার দ্রবণে পেকটিনের মান নির্ণয় করা হয়।

(২১) ব্রিক্স হাইড্রোমিটার-সিরাপ বা স্কোয়াশে চিনির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

(২২) রিফ্রাক্টোমিটার-সিরাপ বা দ্রবণে (TSS) নির্ণয় করা হয়।

(২৩) ক্যাপ সিলিং মেশিন ও ক্রাউন কর্কিং মেশিন-উভয় মেশিনই বোতলে ছিপি লাগিয়ে থাকে।

(২৪) ক্যান সিলার-ক্যানের ঢাকনা বায়ুরোধী করে লাগানো হয়।

(২৫) ব্যাগসিলার-পলিব্যাগ বায়ুরোধী করে আটকানো হয়।

(২৬) ট্রলি-বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বহন করা হয়।

(২৭) টোস্টার-স্যান্ডউইচ তৈরি করা হয়।

উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ছাড়া আরও যন্ত্রপাতি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি যন্ত্রপাতিই ব্যবহার পর ধুয়ে মুছে শুকায়ে নিরাপদ জায়গায় তালাবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হয়।

অনুশীলনী-১৬ ল্যাবরেটরিতে কাজ সাধারণ নিয়মাবলি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন ফলাফল। এ সকল ফলাফলকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানীদের কাজ। বিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান। খাদ্য ও পুষ্টির বিভিন্ন প্রযুক্তি, মাঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ব্যবহারিক খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানের প্রভাব অনেক বেশি। খাদ্য ও পুষ্টি একটি পরীক্ষা ধর্মী বিজ্ঞান। পরীক্ষা না করে ভোক্তাদের কিছু শিখানো যায় না। খাদ্য ও পুষ্টির বিভিন্ন প্রযুক্তি, মাঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ব্যবহারিক খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানের গুরুত্ব খুবই প্রয়োজন। নিম্নে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সাধারণ নিয়ামবলি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বর্ণনা করা হলো–

উপকরণ : বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি, ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী

কাজের ধাপঃ

১। পরীক্ষাগারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রায় সকল রাসায়নিক দ্রব্য বিষাক্ত অথবা ক্ষয়কারী। সুতরাং এ সকল দ্রব্য নিয়ে কাজ করার সময়, যেন তা কখনো নিজের বা অন্যের শরীরে বা কাপড়ে না পড়ে।
এ কারণ :

(ক) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষাগারে ঢোকার আগে সাদা অ্যাপ্রন পরে নেবে। তাতে ক্ষয়কারী রাসায়নিক বস্তু থেকে শরীর ও কাপড়-চোপড় রক্ষা পায়। এছাড়া এপ্রন পরলে শিক্ষার্থী পরীক্ষাগারে কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি লাভ করে।

(খ) চোখ অমূল্য সম্পদ। একে রক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে চশমা পরে থাকতে হবে। যাদের চোখের কোনো সমস্যা নেই, তাদের বর্ণহীন পাওয়ারবিহীন চশমা পরতে হবে।

(গ) কখনো কোন রাসায়নিক দ্রব্য খালি হাতে স্পর্শ করবে না।

(ঘ) না জেনে কখনো কোন গ্যাসের গন্ধ সরাসরি গ্রহণ করবে না, বা কোন স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করবে না।

(ঙ) অনেক জৈব যৌগ, বিশেষ করে তরল পদার্থ সহজে দাহ্য। সুতরাং আগুনের কাছে কোন বোতল রাখবে না বা আনবে না।

(চ) যদি দুর্ঘটনাবশত কোনো রাসায়নিক দ্রব্য শরীরে বা কাপড়ে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তা বেশি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এটি এসিড হলে পানিতে ধোয়ার পরপরই খুব লঘু সোডিয়াম বাইকার্বনেট দ্রবণ অথবা খুব লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ক্ষার পড়লে পানিতে ধোয়ার পরপরই বোরিক এসিড দ্রবণ দিয়ে ধুতে হবে। সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক ও চিকিৎসককে জানাতে হবে এবং তাদের উপদেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

(ছ) প্রয়োজনে কাজে সহপাঠীকে সাহায্য করবে।

২। ব্যবহারিক ক্লাসের দিন সাথে করে ব্যবহারিক বই ও নোটখাতা আনবে।

৩। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা কাজ করার জন্য পরীক্ষাগারে প্রবেশের পূর্বেই পরীক্ষা কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝে নেবে।

৪। পরীক্ষা কাজ আরম্ভ করার আগে অপরিষ্কার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে নেবে। কাচের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার মনে হলেও পরিষ্কার করে নিবে।

৫। রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যতটুকু বলা হয়েছে, সে পরিমাণ ব্যবহার করবে। কখনই তার চেয়ে বেশি নয়।

৬। বিকারক বোতল হতে বিকারক নেওয়ার সময় ছিপি টেবিলে না রেখে অন্য হাতে বা কাচের পাত্রে রেখে দেবে। বিকারক নেওয়ার পর বোতল ছিপিবদ্ধ করে যথাস্থানে রেখে দেবে, নিচের টেবিলে জড় করবে না। কোনো অবস্থায় ঢেলে নেওয়া বিকারক পুনরায় বোতলের মধ্যে রাখবে না।

৭। কঠিন দ্রব্য চামচ বা স্পেচুলা spatula দিয়ে নেবে, কোনো অবস্থায় হাতে ধরবে না।

৮। অযথা পানির ট্যাপ খুলে রাখবে না বা গ্যাস জ্বালিয়ে রাখবে না।

৯। কোনো কঠিন বস্তু সিংকে ফেলবে না। তরল বস্তু সিংকে ফেলার সময় অতিরিক্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, যেন তা পাইপে জমে থেকে ক্ষয় না করে। বিশেষ বিশেষ তরল বর্জ্য waste বোতলে সংগ্রহ করতে হয়। পরে যথাস্থানে ফেলে দিতে হবে।

১০। পরীক্ষানলে সবসময় টেস্ট টিউব হোল্ডার দিয়ে ধরবে।

১১। পরীক্ষানলে কোনো তরল পদার্থকে তাপ দেওয়ার সময় তাকে নিজের চোখমুখ হতে অন্যদিকে, অর্থাৎ যেদিকে কোনো সহপাঠী কাজ করছে না, সে দিকে ঈষৎ কাত করে ধরবে এবং নলটিকে অল্প অল্প নাড়তে থাকবে।

১১। খুব সাবধানে কাচের যন্ত্রে তাপ প্রয়োগ করবে, যেন তা তাপে ফেটে না যায়।

১২। নোট খাতায় পরীক্ষা কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখবে এবং মূল্যায়নের জন্য তোমার প্রতিবেদন report শিক্ষকের নির্দেশ মতো উপস্থাপন করবে।

১৪। প্রদত্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৫। পরীক্ষা কাজের পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।

নিম্নে পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নাম ও ছবি দেয়া হলো–

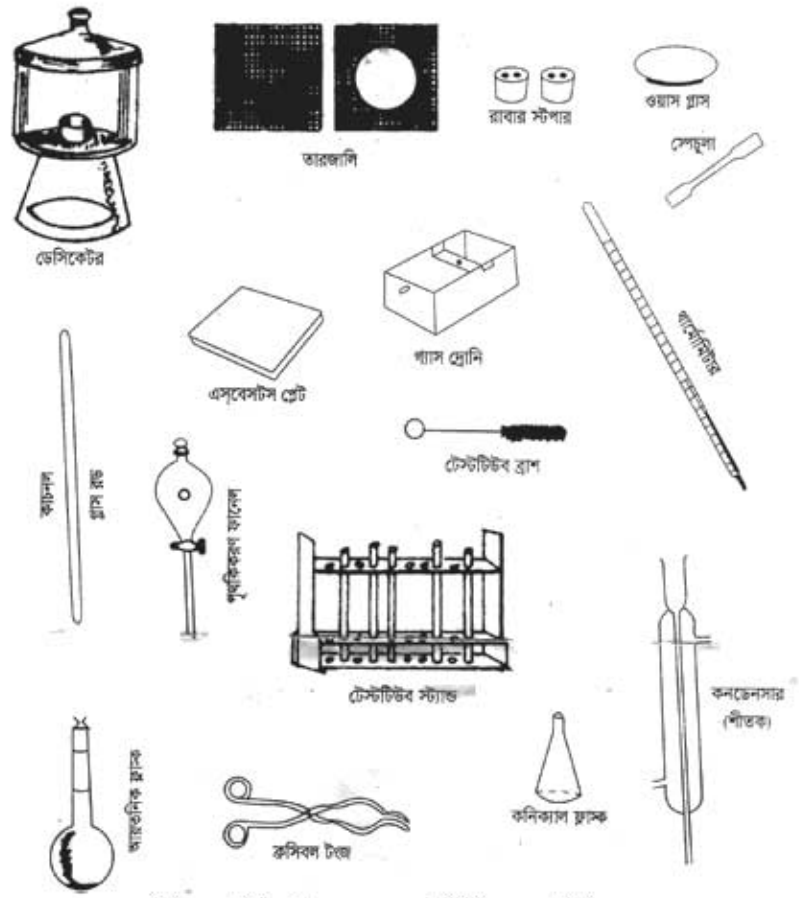


চিত্র : পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

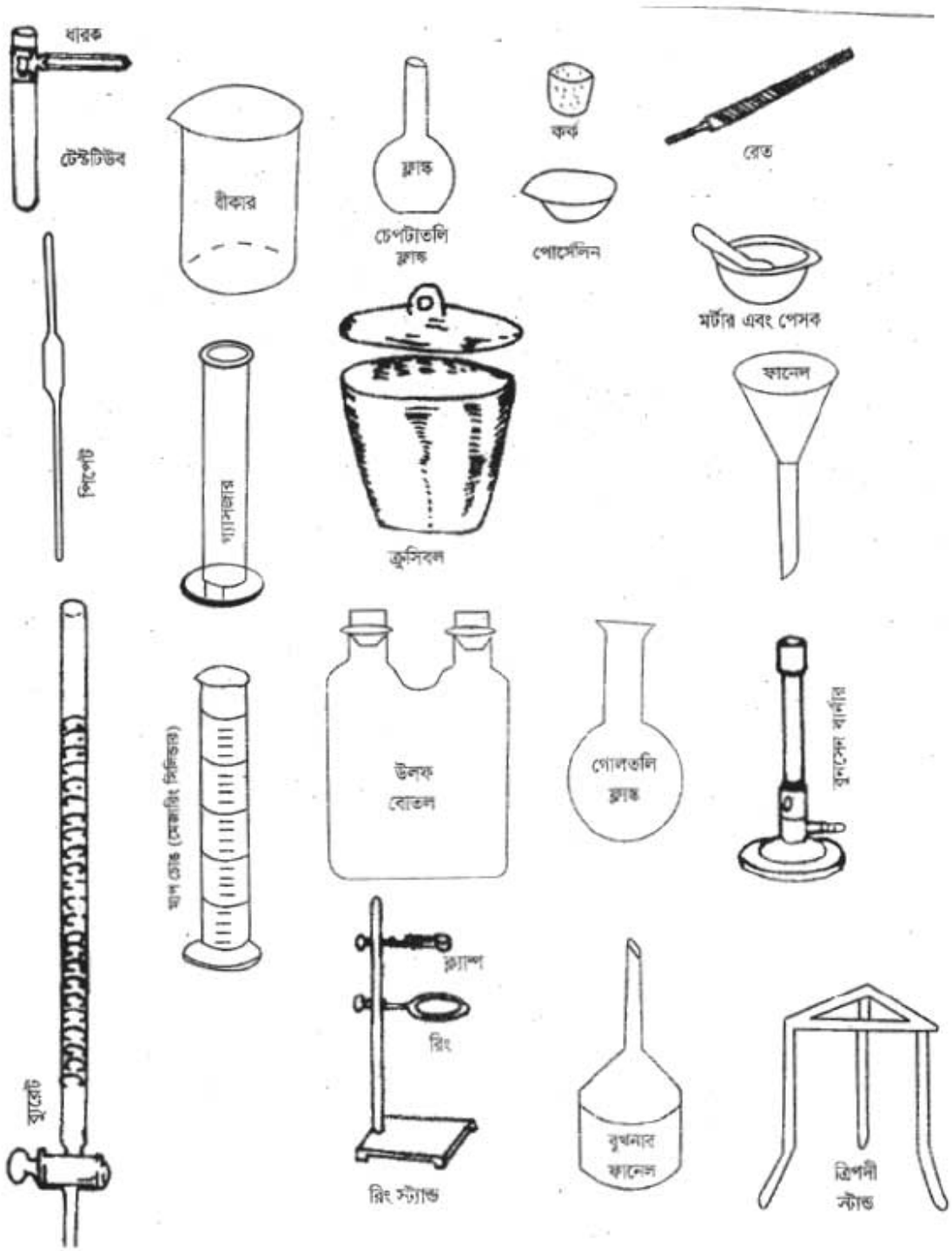


চিত্র : পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

২০২০

# এগ্রোবেসড ফুড-২
## দশম শ্রেণি
## অধ্যায়- ১
# ফল ও সবজি সংরক্ষণ

### ভূমিকা

ফল ও সবজি আমাদের জীবনে রোগ প্রতিরোধকারী অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু দেশে আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, নারিকেল, ডালিম, তরমুজ ইত্যাদি ফলের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। একইভাবে শীত মৌসুমে শীতকালীন শাকসবজি যেমন- বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন, আলু, ডাঁটা শাক, পালং শাক, শিম, বরবটি ইত্যাদি প্রচুর উৎপাদন হয়।

কবির ভাষায়- "পুষ্টিহীন ও দৃষ্টিহীন সবজি খান প্রতিদিন।" "সবজি তুলে নিজের হাতে রান্না করুন সাথে সাথে, পুষ্টি উপাদান রক্ষা পাবে তাতে।" পুষ্টি সমস্যা সমাধানে ফল ও শাকসবজির ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। ফল ও সবজি ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎস হিসেবেও একেবারে নগণ্য নয়। তাছাড়া উৎপাদনের খরচ ও শ্রমের কথা বিবেচনা করলে বাংলাদেশের খাদ্যাভ্যাব ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে ফল ও সবজি ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্ত ফল ও সবজি পচনশীল পণ্য বলে মাঠ থেকে সংগ্রহ করার পর তাড়াতাড়ি না খেলে অথবা বিশেষভাবে সংরক্ষণ না করলে এগুলো স্বল্প সময়ে পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন উপায়ে ফল ও সবজিকে দেরিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। এই রক্ষা করাকে সংরক্ষণ বলা হয়। সংরক্ষণের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে সংরক্ষণকাল কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক বছর হতে পারে। সংরক্ষণকাল প্রকৃতি ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল।

### সংরক্ষণের সংজ্ঞা

বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফল ও সবজির ভৌত আকার-আকৃতি এবং এর পুষ্টিমান বজায় রেখে ফল ও সবজিকে দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী করে রাখাকে খাদ্য সংরক্ষণ বা Food Preservation বলে। যেমন- হিমাগারে আলু ও টমেটো সংরক্ষণ, বাঁশের মাচায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ, ডীপ ফ্রিজারে গাজরের ফালি ও মটরশুঁটির বিচি সংরক্ষণ। চিনি, লবণ, তেল, ভিনেগার বা সিরকা ব্যবহার করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

### ১.১ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ ফল ও সবজি বেশি পরিমাণে উৎপাদন হয়। বাংলাদেশের সব জায়গায় অল্প বিস্তর উৎপাদিত হলেও অধিকাংশ ফল ও সবজির উৎপাদনের বড় এক অংশ কতিপয় এলাকায় সীমাবদ্ধ। ফল উৎপাদনের দিক দিয়ে দেশের কিছু এলাকা যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগ ও বাজারজাতকরণের উন্নত ব্যবস্থার অভাবে উৎপাদন মৌসুমে প্রচুর ফল ও সবজি নষ্ট হয়। এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে আনারস ঢাকায় আনতে ২১% পচে যায়।

এজন্য গুরত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান ও কষ্টে উপার্জিত ফল ও সবজি থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সব ফল বা সবজির পুষ্টিমান দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ন রেখে সংরক্ষণ করা যায় এবং ব্যবহার করা যায়।

ফল ও শাকসবজির সহজাত পচনশীলতা, উৎপাদন কতিপয় এলাকায় কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য মৌসুমে উৎপাদন এলাকায় ফল ও সবজির দাম অনেক কমে যায়। কৃষকেরা শ্রম দিয়ে ও অর্থ ব্যয় করে যে পণ্য উৎপাদন করেন তা অল্প মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হন। ফলে তারা আর্থিক দিক দিয়ে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। এক রিপোর্টে দেখা যায় মৌসুমে উৎপাদন এলাকা হতে ব্যবহারের এলাকায় বিভিন্ন ফল ও সবজির দাম প্রায় ৫০% হতে ৪০০% বেশি হয়ে থাকে। মূল মৌসুমের তুলনায় অন্যান্য সময়েও দামের অনুরূপ পার্থক্য দেখা যায়। দামের এই বিরাট তারতম্য উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর।

উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা উৎপাদনকারী কৃষকগণকে এ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। উৎপাদন মৌসুমে এদেশে উদ্বৃত্ত ফল বা সবজি নষ্ট হলেও অমৌসুমে বিদেশ হতে আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করতে হয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। স্থানীয় এবং উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতির এ দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। ফল ও সবজি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে প্রক্রিয়াজাতকরণ এগ্রোবেসড শিল্প গড়ে উঠবে। এতে পরিবহন, বিপণন, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সারা বছরই চলতে থাকবে। ফলে বেকার যুবক ও পুরষ-নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সারাবছর পুষ্টি সরবরাহে সমতা আসবে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হবে।

## ১.২ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের প্রাথমিক কার্যাবলি

ফল ও সবজি উৎপাদনের এবং সংগ্রহের পর বাজরজাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উৎপাদিত ফল ও সবজি এমন হতে হবে যাতে তার প্রচুর বাজার চাহিদা থাকে। তাজা ফল ও সবজির সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের মৌলিক প্রস্তুতিগুলো হলো -

ক) পণ্য তোলার বয়স বা সময় নির্ধারণ
খ) পণ্য একত্রীকরণ
গ) পণ্য প্যাকিং করা ও
ঘ) পণ্য নির্দিষ্ট স্থানে পরিবহন করা।

তবে এ কাজগুলোর পরিধি ও মাত্রা অনেকটাই নির্ভর করবে বাজারজাতকরণ স্থানের দূরত্ব ও পণ্যের গুণগত মানের উপর। বাজারজাতকরণের জন্য পণ্যকে অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়, সুন্দরভাবে ছাঁটাই, বাঁছাই বা শ্রেণিবিন্যাস করতে হয়। ভালোভাবে এবং বেশি সময়ের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হলে তেল ও বা মোমের প্রলেপ দিয়ে নিতে হয়। ফল ও সবজি তাজা অবস্থায় বাজারজাত করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ভালোভাবে পণ্য তোলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৪টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

যেমন-

ক. ভালো উৎপাদন পরিকল্পনা : উৎপাদন পরিকল্পনা এমন হওয়া প্রয়োজন যেন ফল ও সবজির পরিপক্কতার বা তোলার সময় বাজারে বেশি চাহিদা থাকে।

যোগাযোগ : ক্রেতার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা যাতে ক্রেতা পণ্যের সবচেয়ে উত্তম তোলার সময় এবং তাদের প্রত্যাশিত গুণাগুণ সম্পর্কে সব সময় অবহিত থাকেন।

গ. আগাম ব্যবস্থাপনা : প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরিবহন যান, অগ্রিম ব্যবস্থাপনার সুযোগ থাকতে হবে।

ঘ. যথাযথ তত্ত্বাবধান : শ্রমিকেরা ফসল তোলার পরবর্তী কার্যক্রম অত্যন্ত সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে করছে কিনা তা যথাযথ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। ফল ও সবজির সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের প্রাথমিক কার্যাবলিও নিচে আলোচনা করা হলো :

১. ফসল তোলার সূচক : প্রতিটি ফল ও সবজি টাটকা অবস্থায় বাজারজাতকরণের জন্য সংগ্রহের একটি সর্বোৎকৃষ্ট সময় বা পর্যায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ : যেসব ফসলের পাকা ফল খাওয়া হয়, টাটকা অবস্থায় খেতে চাইলে সম্পূর্ণ পাকার পরই সংগ্রহ করা উচিত। যেমন- আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা ইত্যাদি। এসব ফল দূরে চালান দিতে হলে সম্পূর্ণ পাকার কিছু পূর্বেই সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অপরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করা যাবে না। যেমন- আমের বেলায় বোঁটার নিকট সামান্য রঙ ধরলেই তা পেড়ে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা যেতে পারে। অপক্ক ফল পেড়ে জাগ দিয়ে পাকানোর প্রথা এদেশে চালু আছে। একশ্রেণির লোভী কৃষক বা মহাজন যারা অপক্ক ফল ও সবজি ক্রয় করে আড়তে জমা করে। অতঃপর কিছু রাসায়নিক দ্রব্য স্প্রে করা হয়। দুই-এক দিনের মধ্যে সমস্ত ফল ও সবজি পেকে বিক্রয়ের উপযোগী হয়ে যায়। যেমন- আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা, টমেটো, বেল ইত্যাদি। এভাবে শুকানো ফল বা জাগ দেওয়া ফল কখনও গুণ ও মানে উৎকৃষ্ট হতে পারে না। বেগুন, ঝিঙা, ঢেঁড়স, ধুন্দুল, চালকুমড়া, লাউ ইত্যাদি সবজি বড় হওয়ার পর কিন্তু আঁশ বা বিচি হওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করতে হয়। আবার গোল আলু, মিষ্টি আলু, মুখী কচু ইত্যাদি কন্দাল ফসল ভালোভাবে পরিপক্ক হওয়ার পর তোলা উচিত। আগে তোলা হলে এগুলো সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

চিত্র : কলা পরিপক্ক হওয়ার কিছু পূর্বেই সংগ্রহ করা হচ্ছে।

২. ফসল উত্তোলন : ফসল সংগ্রহ বা উত্তোলন একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। ফসল সম্পূর্ণ পেকে উঠলে বা তোলার সময় হলে যত্নের সহিত তা সংগ্রহ করা উচিত। এক্ষেত্রে একেক ফসলের সংগ্রহের সময় একেক রকম। তাজা খাওয়ার জন্য সংগ্রহ, বীজ পাকার জন্য সংগ্রহ ও দূরবর্তী প্রেরণের জন্য সংগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া গাছ থেকে ফল ছিঁড়া বা উপর থেকে পাড়ার সময় ফল বা সবজির গায়ে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হাত বা যন্ত্রের সাহায্যে ফল পাড়া ভালো।

৩. ক্ষেত থেকে পরিবহন : টাটকা ফল ও সবজি গাছ হতে সংগ্রহের পর তা প্যাকিং শেডে একত্রিত বা স্তূপ করা হয়। এজন্য ঝুড়ি, বস্তা, ঝাঁকা, প্যাকেট ইত্যাদি দ্বারা প্যাক করে নিতে হয়। অতপর এ সকল প্যাকেটক দূরবর্তী নির্দিষ্ট বাজারে বিভিন্ন পরিবহন যানে চালান দেয়া হয়। এ সময়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনাধীন রাখতে হবে, তাহলো যানবাহনে তোলার সময় পণ্যগুলো যেন আছড়ে ফেলা না হয়। মেঠো রাস্তাগুলো উঁচুনিচু বা এবড়ো-থেবড়ো থাকলে বা রাস্তার যেখানে সেখানে গর্ত থাকে সেগুলো সমান করে নিতে হয়। সম্ভব হলে খারাপ রাস্তা পরিবহার করতে হয়। পণ্য বোঝাই গাড়ি ধীরে ধীরে চালাতে হয় যাতে ঝাকুনিতে পণ্যের ক্ষতি না হয়। গাড়িতে পণ্যের গায়ে কভারসহ রোগজীবাণুমুক্ত আবরণ দেওয়া যেতে পারে। সব অবস্থাতেই পণ্য ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয় এবং পণ্যের মধ্য দিয়ে আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

৪. তাপ থেকে রক্ষা : ফল ও সবজিকে তাপের আঘাত থেকে সব সময় রক্ষা করা প্রয়োজন। অল্প সময়ের জন্য হলেও সূর্যের আলোতে পণ্যের উত্তাপ বাড়িয়ে দেয়। অতিরিক্ত তাপ পণ্যের যে ক্ষতি করে তা আর পূরণ করা যায় না এবং ঐ পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পণ্য তোলার পর তা সাময়িকভাবে গাছের ছায়ায় কিংবা তাঁবুর নিচে রাখতে হয়। পণ্য তোলার এ কাজটি দিনের বেলায় খুব ভোরে ঠাণ্ডার সময় করতে হয় পণ্য তোলার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হয় এবং পরিবহনের সময় এগুলো ঢেকে দিতে হয়। ঢাকার সময় খেয়াল রাখতে হয় যেন ঢাকনা এবং পণ্যের মাঝে বাতাস চলাচলের মতো জায়গা থাকে। ঢেকে দেওয়া কাপড় বা তারপলিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এতে পণ্যের পরিবেশ ঠান্ডা থাকে। সরাসরি সূর্যালোক (Sun Ray) থেকে রক্ষা পায়।

৫. প্যাকিং হাউজের কার্যক্রম : প্যাকিং শেডে পণ্যকে তাপ থেকে রক্ষার জন্য শেডের নিচে একত্রিত করা হয়। বড় বড় খামারে পণ্য পরিবহন যানে আসার পর হাত দিয়েই নামানো হয়। শুকনো অবস্থা রাখার জন্য ঢালু প্যাড লাগানো কাঠের টুকরা বা রামবো অথবা চলমান কনভেয়ার বেল্টে রাখা হয় এবং যথাস্থানে নিয়ে স্তূপ করা হয়।

প্যাকিং শেড থেকে পণ্য সামগ্রী দূরবর্তী শহরের বাজারে বা অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ীর কাছে গাড়িতে করে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ জায়গায় উৎপাদনকারীদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের দেখা হয় এতে বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর আদান-প্রদান হয়। এবং কোনো ফসল চাষ করলে আর্থিকভাবে বেশি লাভজনক তা জানার পর ভবিষ্যৎ ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়।

৬. অস্থায়ী গুদাম : প্যাক করা সামগ্রী গন্তব্যে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত তা প্যাকিং শেডে ছায়ায় জড় করে রাখতে হয়। তবে পণ্যের পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং বাষ্পায়িত ঠান্ডা অথবা যান্ত্রিক ঠান্ডা করার সুবিধা বা হিমাগারের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেখানে পণ্যকে অস্থায়ীভাবে গুদামজাত করে কিছুদিন রাখা যেতে পারে।

## ১.৩ সংরক্ষণের জন্য কতিপয় বাণিজ্যিক ফসলের প্রাথমিক কার্যাবলি

ফল ও সবজি ফসল বর্তমানে কৃষকেরা বাণিজ্যিকভাবেই চাষাবাদ করে থাকে। বর্তমানে বাজারে এগুলোর যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া ফল ও সবজি চাষাবাদ করে দানা জাতীয় ফসল হতে অনেক বেশি আর্থিক লাভ হয়। প্রাথমিক কার্যাবলি বলতে ফল ও সবজি গাছ থেকে পাড়ার পর বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত বেশ কিছু কার্যাবলি ধারাবাহিক পর্যায় রয়েছে। এ পর্যায়গুলো বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। নিম্নে ফসল ভিত্তিক এ কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো :

১. আম : পুরোপুরি পেকে ওঠার ঠিক আগের অবস্থায় আমগাছ থেকে যত্নসহকারে পাড়া হয়। সংরক্ষণের আগে বাছাই করলে ভালো হয়। থেঁতলানো, পচা, ক্ষত, গলা, ফাটা, রোগ ও পোকায় কাটা প্রভৃতি দোষ ও ত্রুটিযুক্ত আম প্রথমে বাছাই করতে হয়। তারপর জাত অনুযায়ী আম গ্রেডিং করে আবার জাতের মধ্যে বড় ও ছোট আকারের আম আলাদা করা হয়। ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সে খড় বিছিয়ে আলতোভাবে আম রেখে হিমাগারে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

২. কলা : কলা দ্রুত পচনশীল ফল হওয়ায় একে বেশি দিন ঘরে সংরক্ষণ করা যায় না। কলা পরিপুষ্ট অথচ সবুজ থাকা অবস্থায় পাড়া হয়। গাছ থেকে পেড়ে ছায়াযুক্ত স্থানে এনে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। কলার ছড়াকে কাঁদি থেকে কেটে কষ ধোয়ার জন্য পানিতে ডুবাতে হয়। ফলের সাথে লেগে থাকা ফুলের অংশ ও ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয়। এ সময় দাগী কলাগুলো ছড়া বা কানা থেকে সাবধানে কেটে বাদ দিতে হয়। ধোয়ার সময় থাইয়ো বেনজাজোল (TBZ) অথবা ইমাজেলিল নামক ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে কলায় ছত্রাকের আক্রমণ কম হয়। কলাকে তলায় ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে রেখে স্প্রেয়ারের সাহায্যে উক্ত ছত্রাকনাশক স্প্রে করা হয় (চিত্র)। কলা পরিষ্কারকরণের জন্য পানির ট্যাঙ্ক থেকে ছড়াগুলো তোলার পর পলিথিনের লাইনিং দেওয়া ফাইবার বোর্ড বাক্সে প্যাক করা হয়।

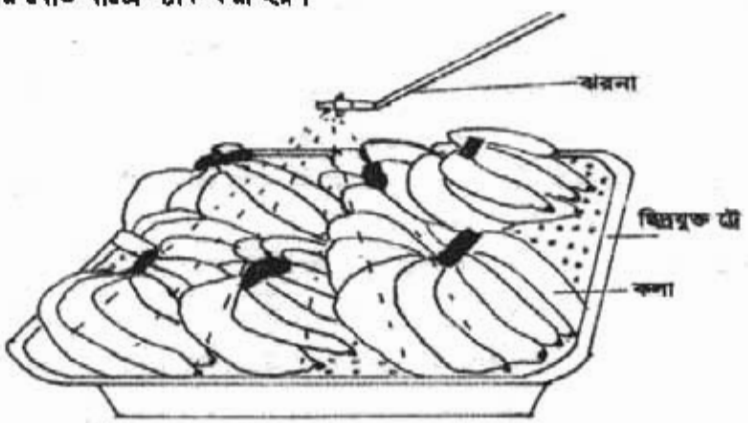


চিত্র : ছত্রাক প্রতিরোধের জন্য কলায় ছত্রাকনাশক স্প্রে

৩. পেঁপে : পেঁপে যখন গাঢ় সবুজ থেকে হালকা সবুজ রঙে রূপান্তরিত হয় এবং বোঁটার কাছে হলদে রং এর আভা দেখা দেয় তখন সংগ্রহ করতে হয়। ভালো চেহারা, আকার ও আকৃতির পেঁপে বেছে নিতে হয়। ফলের আকার চোখে দেখে স্থির করতে হয়, তবে ওজনের সাহায্যেও স্থির করা যায়। ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পেঁপে ৬০.৬$^{0}$C তাপমাত্রা পানিতে ২০ সেকেন্ড চুবিয়ে নিতে হয়।

৪. আলু : পরিপক্কতা লাভের পর হাল্ম পুলিং পদ্ধতিতে গাছ অপসারণ করে ৭/৮ দিন মাটির নিচে রেখে আলু তুলতে হয়। সংগ্রহের পর টিউবারের ত্বক উঠে গেলে বুঝতে হয় তা পরিপক্কতা লাভ করেনি। অপরিপক্ক টিউবার সংরক্ষণ করা যায় না। আলু জমি থেকে সংগ্রহের পর ছায়াযুক্ত স্থানে যেখানে সহজে বাতাস চলাচল করে সেখানে ৭/৮ দিন রেখে দিতে হয়। এতে সংগ্রহকালীন ক্ষত বা চামড়া উঠে যাওয়া অবস্থা সেরে ওঠে। এ প্রক্রিয়াকে কিউরিং বলে। ফলে আলু হতে জলীয় পদার্থ বাহিরে বেরিয়ে যাওয়া কমে যায়।

৫. পেঁয়াজ ও রসুন : মাঠ থেকে সংগ্রহের পর পেঁয়াজ ও রসুনের পলাসহ (ডাটা) কিছুদিন শুকনা ছায়াময় ও অবাধ বাতাস চলাচলের সুবিধাযুক্ত স্থানে রেখে দিতে হয়। এতে পেঁয়াজ ও রসুনের ডাঁটা বা গলা শুকিয়ে বন্ধ হয়ে আসে এবং পণ্যসামগ্রী থেকে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে যাওয়া কমে যায়। অপরিপক্ক ও অপুষ্ট ফসল এবং যেগুলোর গলা শুকিয়ে বন্ধ হয় না সেগুলো সংরক্ষণ করা যায় না।

৬. টমেটো : টমেটো ফল সম্পূর্ণ রং ধরার পূর্বেই সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত টমেটো ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিতে হয়। টমেটো সরাসরি মেঝেতে না রেখে, চট, প্লাস্টিক শিট বা পুরাতন খবরের কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্ধারিত আকারের চেয়ে নিচু মানের টমেটো বেছে ফেলতে হয়। বেশি পাকা, বেশি কাঁচা ও বিকৃত ফল বেছে বাদ দিতে হয়। টমেটোতে নির্ধারিত মাত্রায় মোম বা তেলের প্রলেপ দেয়া হয় এবং ঐ মোমের সাথে ছত্রাকনাশকও মেশানো যায়।

চিত্র : রসুনের পলাসহ সংগ্রহ

২০২০

৭. পাতাবহুল সবজি : এ ধরনের সবজিগুলো হচ্ছে-লেটুস, চায়না ক্যাবেজ, পুঁইশাক, লালশাক, কচুশাক ইত্যাদি। এগুলোর সংরক্ষণ ক্ষমতা খুবই সীমিত। মাঠ থেকে সংগ্রহের পর অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে আকার নির্ধারণ করা হয়। ছিদ্রযুক্ত পলিথিন প্যাকেটে ভরে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হয়।

## ১.৪ ফল ও সবজি সংরক্ষণের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা

সংরক্ষণের জন্য ফল ও সবজির ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রয়োজন। গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী এদের শ্বসন ও প্রস্বেদন হারে পার্থক্য থাকে বলে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এরা ভালো থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ফল ও সবজি উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। আবার অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায়ও অনেক ফল ও সবজিতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত কয়েকটি ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সম্পর্কে আলোচনা হলো-

| ফল ও সবজির নাম | তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা |
|---|---|
| আম | আম প্যাকিং করে হিমাগারে ৭-১২$^0$ C তাপমাত্রা ও ৮৫% - ৯৪% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৩-৪ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়। উচ্চ তাপমাত্রায় আম তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আবার নিম্ন তাপমাত্রায় কয়েকদিন রাখা হলে ত্বকে শৈত্যজনিত ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং শাঁস বাদামি রং ধারণ করে। এসব ফল হিমাগার থেকে বাইরে আনার পর শীঘ্রই পচে যায়। |
| কলা | কলা ১৩$^0$ C এর কিছু উপরের তাপমাত্রায় এবং ৮৫% - ৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু ১৬.৫$^0$ C - ২১$^0$ C তাপমাত্রায় ১-২ সপ্তাহের মধ্যেই কলা পেকে যায় । এজন্য ১৬.৩$^0$ C এর উপরে তাপমাত্রায় কলা সংরক্ষণ করা উচিত। কলার কোনো কোনো জাতকে ৯$^0$ - ১০$^0$C তাপমাত্রায় তিন মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কলা রেফ্রিজারেটরে বা ফ্রিজে রাখা হয় না, রাখা হলে কালো হয়ে যায়। |
| পেঁপে | পরিণত পেঁপে ৯ - ১০$^0$ C তাপমাত্রায় এবং ৮০ - ৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১-২ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়। |
| আনারস | আনারস ১১-১৩$^0$ C তাপমাত্রায় এবং ৮৫ - ৯০% আপেক্ষিক আদ্রতায় ৪সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। আবার ১০$^0$ C এর কম তাপমাত্রায় রাখা হলে আনারস পাকে না। স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় আনারস ১২-১৫ দিনের বেশি ঘরে রাখা যায় না। |
| আলু | আলূ ৪-৭$^0$ C তাপমাত্রা ও ৯৫-৯৮% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১০ মাস পর্যন্ত ভালো থাকে। পক্ষান্তরে কক্ষ তাপমাত্রায় ৩ মাসের পরেই আলু নষ্ট হয়ে যায়। |
| পেঁয়াজ | পেঁয়াজ ০-৫$^0$ C তাপমাত্রায় এবং ৬৫-৭০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৬-৮ মাস ভালো থাকে। কিন্তু উক্ত আর্দ্রতায় ২৮-৩০$^0$ C তাপমাত্রায় ১ মাসের বেশি ভালো থাকে না। |
| রসুন | রসুন ০$^0$ C তাপমাত্রঅয় এবং ৭০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৬-৭ মাস ভালো থাকে কিন্তু একই আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২৮-৩০$^0$C তাপমাত্রায় ১ মাসের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। |
| টমেটো | টমেটো ৮-১০$^0$ C তাপমাত্রাঅয় এবং ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১-২ সপ্তাহ ভাল থাকে। |

বিভিন্ন ফলের সংরক্ষণ উপযোগী তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি : ফল সংরক্ষণের সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা।

| পণ্যের নাম | তাপমাত্রা (°সে.) | আর্দ্রতা (%) | সংরক্ষণ কাল |
|---|---|---|---|
| ১. আঙ্গুর | -১.১২ - ০.৫৬ | ৯০-৯৫ | ৩-৪ মাস |
| ২. আপেল | -১.১২-৪.৪৮ | ৯০ | ৩-৮ মাস |
| ৩. আম | ১২.৮৮ | ৮৫-৯০ | ২-৩ সপ্তাহ |
| ৪. আনারস | ৭.২৮-১২.৮৮ | ৮৫-৯০ | ২-৪ সপ্তাহ |
| ৫. কমলা লেবু | ০০.০-৩.৩৬ | ৮৫-৯০ | ২-৪ সপ্তাহ |
| ৬. কলা | ১৩.৪৪ - ১৪.৫৬ | ৯০-৯৫ | ১০ দিন |
| ৭. কাঁঠাল | ১.০০-১৩.০০ | ৮৫-৯০ | ৬ সপ্তাহ |
| ৮. নাশপাতি | ১.৬৮-০.৫৬ | ৯০.৯৫ | ২-৭ সপ্তাহ |
| ৯. পেয়ারা | ৭.২৮-১০.০৮ | ৯০ | ২-৩ সপ্তাহ |
| ১০. পেঁপে | ৭.২৮-০.০ | ৮৫-৯০ | ১-৩ সপ্তাহ |
| ১১. বাতাবিলেবু | ৮.৮০-৯.০০ | ৮৫-৯০ | ৮-১২ সপ্তাহ |
| ১২. বেদানা | ০.০ | ৯০ | ২-৪ সপ্তাহ |
| ১৩.মিঠা লেবু | ৩.৩৬-৮.৯৬ | ৮৫-৯০ | ৩-৮ সপ্তাহ |
| ১৪. লিচু | ১৬-৮ | ৯০-৯৫ | ৩-৫ সপ্তাহ |

সারণি : সবজি সংরক্ষণের সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা

| পণ্যের নাম | তাপমাত্রা (°সে) | আর্দ্রতা (%) | সংরক্ষণ কাল |
|---|---|---|---|
| আলু | ৩.৩-৪.৪ | ৮৫-৯০ | ৭-৮ মাস |
| ওলকপি | ০ | ৯০-৯৮ | ২-৪সপ্তাহ |
| কাঁচামরিচ | ০-১.০ | ৯০ | ৪০দিন |
| গাজর | ০-৪.৪ | ৯০-৯৫ | ৬মাস |
| টমেটো (আধাপাকা) | ৪.৪ | ৯৫-৯৮ | ১মাস |
| ঢেঁড়স | ৭.০-১০.০ | ৯০-৯৫ | ৭-১০ দিন |
| তরমুজ | ৪.৪-৭৯.৫ | ৮০-৮৫ | ২-৩ সপ্তাহ |
| পালংশাক | ০ | ৯০-৯৫ | ১০-১৪ দিন |
| পেঁয়াজ | ০ | ৬৫-৭০ | ১-৮ মাস |
| ফুলকপি | ০ | ৯০-৯৮ | ২-৪ সপ্তাহ |
| বাঁধাকপি | ০-৪.৪ | ৯০-৯৮ | ৫ মাস |
| বেগুন | ৭.০-১০.০০ | ৯০ | ১ সপ্তাহ |
| বীট | ০-৪.৪ | ৯০-৯৫ | ৪-৫ মাস |
| মটর (অপক্ব বীজ) | ০ | ৯০-৯৫ | ২সপ্তাহ |
| মিঠাআলু | ২.৬-১৫.০ | ৮০-৮৫ | ৪-৬ মাস |
| লেটুস | ০ | ৯৫-৯৮ | ২-৩ সপ্তাহ |
| শশা | ৭.০-১৫.০ | ৯৫-৯৮ | ১০-১৫ দিন |
| শালগম | ০ | ৯০-৯৫ | ৪-৫ দিন |
| মুলা | ০ | ৯০-৯৫ | ৪-৮ সপ্তাহ |

২০২০

**ফল ও সবজি সংরক্ষণের গুদামঘর**

বাতাস চলাচলযুক্ত সাধারণ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কিছু কিছু ফল ও সবজি অল্প সময়ের জন্য আবার কিছু কিছু ফল ও সবজি তুলনামূলকভাবে বেশি সময়ের জন্য ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ফল বা সবজি এমন গুদামঘরে সংরক্ষণ করা দরকার যেখানে প্রচুর প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল করানো সম্ভব হয়। গুদামের কাঠামো এমনভাবে করা দরকার যাতে রাতে ভেন্টিলেটর (চিত্র) খুলে দিলে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে সহজেই ঢুকতে পারে। ভালো ফল পাওয়ার জন্য গুদামের তলদেশ দিয়ে বাতাস প্রবেশের জন্য পথ এবং ছাদের কাছাকাছি জায়গায় বাতাস বের করে দেওয়ার জন্য ফ্যান থাকতে হয়। সূর্য ওঠার সাথে সাথে বেরিয়ে যাওয়ার পথগুলো বন্ধ করতে হয়। দিনের পুরো গরম সময়টা এ পথগুলো বন্ধ থাকবে।

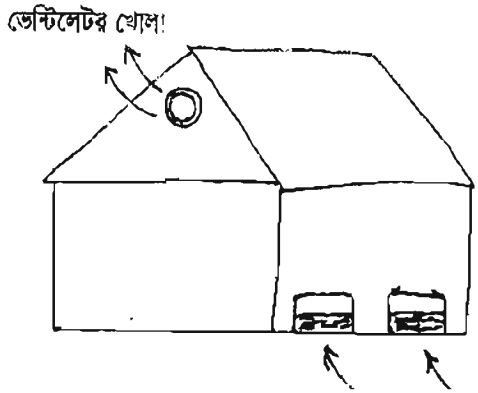


চিত্র : রাতে ভেন্টিলেটর খোলা

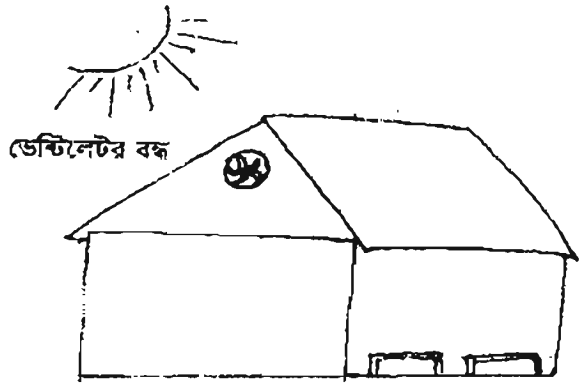


চিত্র : দিনের ভেন্টিলেটর বন্ধ

**পণ্য খোলা অবস্থায় গুদামজাতকরণ :** অনেক সময় গুদামঘরে পণ্য প্যাকেটবিহীন অর্থাৎ খোলা অবস্থায় গুদামজাত করা হয়। এক্ষেত্রে গুদামঘরে বাতাস চলাচল ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হয় যাতে গুদামের তলদেশ দিয়ে প্রতি ঘনফুট পণ্যের জন্য প্রতি মিনিটে ২ ঘন ফুট হারে বাতাস গুদাম প্রবেশ করতে পারে এ পদ্ধতিতে পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি

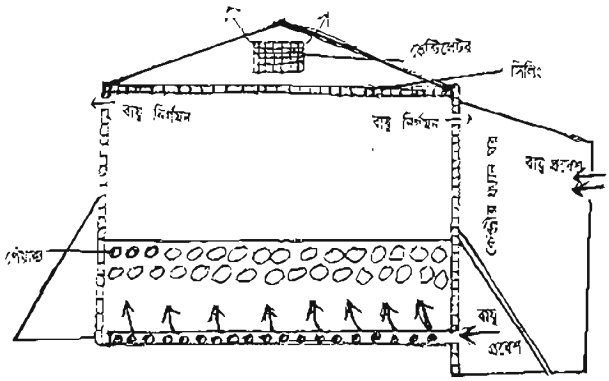


চিত্র : পণ্য খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ (পেঁয়াজ)

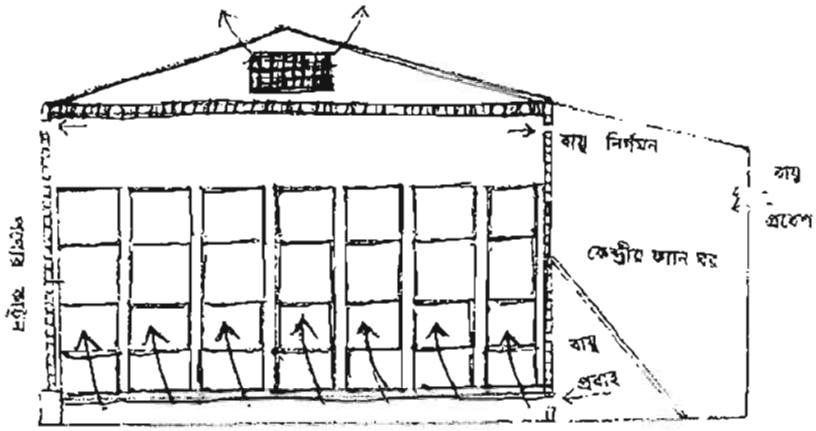


চিত্র : পণ্য প্যাকেট অবস্থায় সংরক্ষণ (পেঁয়াজ)

পণ্য কার্টনে করে গুদামজাতকরণ : ফল ও পণ্য বাক্স, কার্টন বা প্যাকেটে ভরে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে গুদামঘরে রাখা হয়। যাতে বাতাস সর্বত্র বাধাহীনভাবে চলাচল করতে পারে। পণ্যভর্তি পাত্রের সারি বাতাস চলাচলের গতির সমান্তরাল করে রাখতে হয়।

## ১.৫ খাদ্য শুষ্ককরণ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ খাদ্যদ্রব্য শুকায়ে সংরক্ষণ করে আসছে। কিন্তু কেউ জানে না কবে এ প্রথা চালু হয়েছে। কিন্তু আজ এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এখানে ফল ও সবজি শুকানো এবং সংরক্ষণ এর পদ্ধতি সুবিধা , অসুবিধা দেয়া হলো–

**খাদ্য শুষ্ককরণের সুবিধা :**

১. শুকানো শস্যে রোগজীবাণু ও ছত্রাকের আক্রমণ হয় না।
২. শুকানো শস্য বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়।
৩. শুষ্ক খাবার অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাবারের চেয়ে অনেক বেশি ঘনীভূত হয়।
৪. খাদ্যদ্রব্য শুকালে ওজন ও আয়তনে অনেক কমে যায়।
৫.অল্প জায়গায় অনেক পণ্য রাখা যায়।
৬. সহজে এবং সস্তায় পরিবহন করা যায়।
৭. শিল্প স্থাপনা এবং শ্রমিক খরচ অনেক কমে যায়।
৮. সংরক্ষণ করা ও দেশে-বিদেশে পাঠানোর জন্য সুবিধাজনক।
৯. প্যাকিং করা সহজ হয়।
১০. শুকানো শস্যে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।
১১. শুকানো শস্যে খাদ্যমান সংরক্ষিত হয়।
১২. শুকানো শস্যের গজানোর ক্ষমতা বজায় থাকে।

খাদ্য শুষ্ককরণের অসুবিধা :

১. খাবার অতিরিক্ত শুষ্ক হলে স্বাদ ও গন্ধ অনেকটা নষ্ট হয়।

২. শুষ্ক বেশি হলে খাদ্যমান কিছুটা কমে যায়।

৩. কম শুষ্ক হলে খাদ্যে ছত্রাকের আক্রমণ হয়।

৪. শুষ্ক কম/ বেশি হলে গজানোর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

শুষ্ককরণ পদ্ধতি :

ফল ও সবজি প্রধানত দু'ভাগে শুকানো হয়, যেমন-

১. ড্রাইং (সূর্যতাপে শুষ্ককরণ) ও

২. ডিহাইড্রেশন (কৃত্রিম তাপে শুষ্ককরণ)

১. ড্রাইং : সূর্যতাপের সহায়তায় খাদ্যদ্রব্য থেকে জলীয় কণা অপসারণ করে শুষ্ক করার পদ্ধতিকে ড্রাইং বা শুকানো বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা চেম্বার বা ঘরের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে শুষ্ক করা হয়। প্রায় সব খাবারই এই পদ্ধতিতে শুষ্ক করা হয়।

| ড্রাইং (শুকানো) | ডিহাইড্রেশন (কৃত্রিম শুষ্ককরণ) |
|---|---|
| ১. প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। | ১. প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়। |
| ২. বছরের সবসময় করা যায় না। | ২. সবসময় করা যায়। |
| ৩. খোলা জায়গায় করা হয় বলে খাদ্যের মান ভালো হয় না এবং খাদ্য দূষণ হবার সম্ভাবনা থাকে। | ৩. খাদ্যদ্রব্যের মান ভালো থাকে। |
| ৪. শুষ্ক করার জন্য অনেক জায়গা লাগে। | ৪. খুব অল্প জায়গার মধ্যেই শুকানো যায়। |
| ৫. খরচ কম পড়ে। | ৫. খরচ বেশি পড়ে। |
| ৬. সোলার ড্রায়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগত মান রক্ষা করা যায়। | ৬. এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ড্রায়ারের নাম হলো -কিল্ন ড্রায়ার, কেবিনেট ড্রয়ার ও চানেল ড্রায়ার। |

শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের মূলনীতি :

ক) জলীয় কণা বা আর্দ্রতা ছাড়া জীবাণু বাঁচতে পারে না বলে খাদ্যদ্রব্যকে উপযুক্তভাবে শুকাতে পারলে তা সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় ধরে জীবাণু আক্রমণ করতে পারে না।

খ) শুকালে খাদ্যশস্য ঘনীভূত হয়। ফলে অসমোটিক চাপ বেড়ে যায় এবং জীবাণুর জন্য প্রয়োজনীয় জলীয়কণা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। এভাবে জীবাণুর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয় বলে খাদ্য সংরক্ষিত হয়।

গ) শুকালে খাদ্যদ্রব্য ওজনে হালকা হয়, নাড়াচাড়া করা সহজ হয়, অল্প স্থানে বেশি পরিমাণে রাখা যায়, প্যাকিং করা সহজ হয়, পরিবহন সহজ হয়, খাদ্যমান ভালো থাকে ইত্যাদি।

## ১.৬ ফল ও সবজি সংরক্ষণে হিমায়িত সংরক্ষণ প্রযুক্তি

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ফল ও সবজির জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাড়তে থাকে। আবার তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিও কমতে থাকে। সাধারণত ১০$^{0}$C তাপমাত্রা কমলে এ গতি অর্ধেক হয়ে যায়। হিমায়ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য যে তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী সে তাপমাত্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি সবচেয়ে কম হয় এবং যার ফলে শাকসবজির কোনো ক্ষতি হয় না।

হিমায়িত সংরক্ষণ প্রযুক্তির মূল তত্ত্বটি হলো তাপ স্থানান্তর। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে তাদের তাপ স্থানান্তর হয়। ফলে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত বস্তুটি তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয় এবং ঠাণ্ডা বস্তুটি তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়। এ প্রযুক্তিতে ঠান্ডা বাতাস বেশি তাপমাত্রা সম্পন্ন ফল ও সবজির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে ফল বা সবজি এবং বাতাস উভয়ের মধ্যে তাপ বিনিময় হয়। ফল ও সবজি ঠাণ্ডা হয় এবং বাতাস উত্তপ্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। বাতাস শীতলীকরণের কাজটি নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন- ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে এনে, বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ও যান্ত্রিক হিমায়নের মাধ্যমে। বায়ু শীতলীকরণের বিভিন্ন উপায়ভিত্তিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি ৫ প্রকারের হয়ে থাকে।

যথা -

১. ঠাণ্ডা বাতাসবাহিত সংরক্ষণাগার
২. বাষ্পীভবনজাত শীতল ঘর।
৩. বাষ্পীভবনজাত শীতল প্রকোষ্ঠ।
৪. ভৌত উপায়ে হিমায়িত সংরক্ষণাগার।
৫. কোল্ড স্টোরেজ বা হিমগার পদ্ধতি।

১. ঠাণ্ডা বাতাসবাহিত সংরক্ষণাগার : এ পদ্ধতিতে বাইরের বাতাস ঠাণ্ডা করে ঘরে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কক্ষ শীতল করা হয়। খড়ের তৈরি চাল, খড় ও বাঁশের তৈরি দেয়াল এবং ছিদ্রযুক্ত কাঠের তক্তার তৈরি পাটাতন দিয়ে এই ঘর তৈরি করতে হয়। কাঠের পাটাতনের নিচে ১-১.৫ ফুট পর্যন্ত জায়গার পাথরের টুকরা বা ইটের টুকরা বিছিয়ে পানি দিয়ে ভরে দিতে হয়। পানির সংস্পর্শে পাথর বা ইটের টুকরাগুলো ঠান্ডা থাকবে।

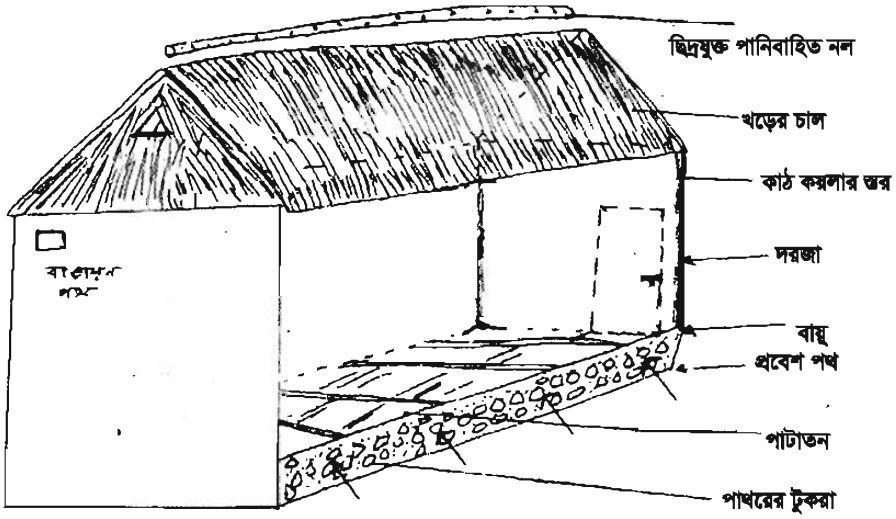


চিত্র : কম খরচের ঠাণ্ডা বাতাসবাহিত সংরক্ষণাগার

বাহিরের বাতাস এ ঠান্ডা পাথর বা ইটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা বাতাস কাঠের পাটাতনের ছিদ্র দিয়ে মূল কক্ষে প্রবেশ করবে এবং সংরক্ষিত ফল ও সবজি থেকে তাপ গ্রহণ করে বিপরীত পাশে উপরের দিকে অবস্থিত বাতায়ন কক্ষ বা ভেন্টিলেটর দিয়ে ত্যাগ করবে। দেয়ালে কাঠ কয়লার একটি স্তর লাগালে এবং পাইপের সাহায্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলে শীতলীকরণের কাজ তাড়াতাড়ি হয়। কাঠ কয়লার স্তরটি পানি শোষণ করে নেয় এবং তা বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় কক্ষের অভ্যন্তর থেকে তাপ নিষ্কাশন করে।

২. বাষ্পীভবনজাত শীতল ঘর : বাষ্পীভবনজাত শীতলীকরণ ঘর আমাদের দেশের জন্য উপযোগী একটি সহজ পন্থা। ঘরের ছাউনি দিয়ে বাঁশ ও পাটখড়ির একটি ঘর তৈরি করে তার মধ্যে ফসল রাখতে হয়। ঘরের দেয়াল বা ছাদ পানি দিয়ে মাঝে মাঝে ভিজিয়ে দিতে হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এই পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায় এবং বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ঘরের মধ্যে রক্ষিত ফসল থেকে সংগ্রহ করে। ফলে পণ্যসামগ্রী শীতল হয়। বাঁশের চাটাই দিয়ে দেয়াল তৈরি করে তাতে কাঠ কয়লা গুঁজে দিলে আরও ভালো হয়।

৩. বাষ্পীভবনজাত শীতল প্রকোষ্ঠ : এ পদ্ধতিতে চৌবাচ্চা আকৃতির প্রকোষ্ঠ তৈরি করতে হয়। এ ধরনের প্রকোষ্ঠের ১২.৫ সে.মি. চওড়া কাঁচা ইটের পাশাপাশি দুটো দেয়াল দিয়ে তৈরি করতে হয়। দেয়াল দুটির মাঝখানে ৭.৫ সে.মি. জায়গা ফাঁকা থাকে। এ ফাঁকা জায়গাটি বালি দিয়ে ভর্তি করতে হয়। চৌবাচ্চার মেঝে ৭.৫ সে.মি. পুরু হয়ে পাকা ইট দিয়ে তৈরি করতে হয়।

চিত্রঃ শীতল প্রকোষ্ঠের লম্বচ্ছেদ দৃশ্য

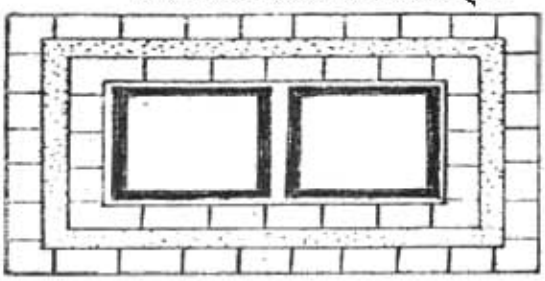

চিত্রঃ প্রস্থচ্ছেদ দৃশ্য

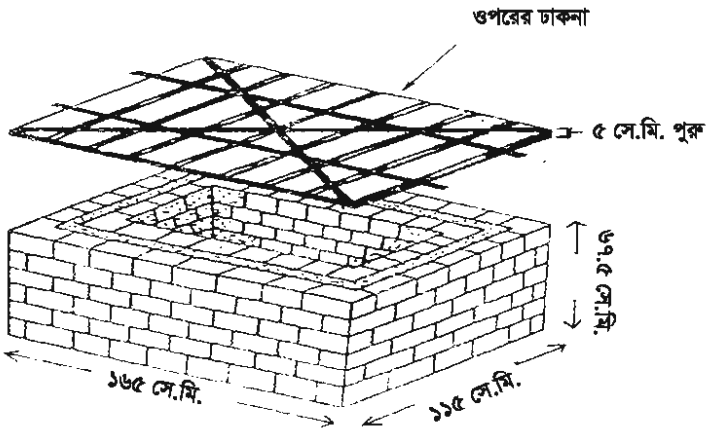


চিত্র :পার্শ্বদৃশ্য

চৌবাচ্চাটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার অনুপাত মোটামুটি ১৬:১১:৭ হলে ভালো হয়। চৌবাচ্চার ঢাকনি বাঁশ ও চট দিয়ে ৫ সে.মি. পুরু করে তৈরি করতে হয়। এটি ইচ্ছামতো আলাদা করা যায়। বালির স্তরটি সকাল বিকাল দুই বেলা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়। এ পানি কাঁচা ইটের গাঁথুনির ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে এসে বাষ্পীভূত হয়। পানির এ বাষ্পীয়ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ শীতল প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ফল ও সবজি থেকে গ্রহণ করে। এ কারণে তাপ হারিয়ে ফল বা সবজি শীতল হয়। শীতকালে আবহাওয়ার আর্দ্রতা যখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে তখন এ প্রযুক্তির কার্যকারিতা বেশি হয়।

৪. ভৌত উপায়ে হিমায়িত সংরক্ষণাগার : এ ধরনের সংরক্ষণাগারের দেয়াল ও ছাদ কাঠের তৈরি হয়। দেয়াল বা ছাদের বাইরের দিকে তাপ কুপরিবাহী ফাইবার গ্লাস লাগিয়ে ভিতর ও বাইরের মধ্যে তাপ চলাচল রোধ করা হয়। ঘরে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করানোর জন্য এয়ারকুলারের (Air Cooler) ব্যবস্থা রাখতে হয়। যেসব ফল ও সবজি ন্যূনতম ১০$^0$ C তাপমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না সেগুলোকে এভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

৫. হিমাগার Cold Storage পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক উপায়ে বাতাস ঠাণ্ডা করা হয়। এর শীতলীকরণ যন্ত্রে তিনটি মূল অংশ থাকে। যথা- কমপ্রেসার, কনডেনসার ও ইভাপোরেটর।
কমপ্রেসার : এ অংশটিতে এমোনিয়া বা ফ্রেয়ন গ্যাস চাপে সংকুচিত হওয়ার ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

কনডেনসার : এ অংশটি সংকুচিত ও উত্তপ্ত ফ্রেয়ন বা রেফ্রিজারেটর গ্যাস থেকে তাপ অপসারণ করে তরলীকৃত করা হয়।

ইভাপোরেটার : এ অংশটিতে তাপ গ্রহণ করে তরলীকৃত গ্যাস পুনরায় বায়বীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ইভাপরেটরের জন্য দুটি অংশ হলো রিসিভার বা গ্রাহক এবং এক্সপানশন ভাল্‌ভ বা সম্প্রসারণ ভাল্‌ভ। এগুলোর কাজ মূল অংশের সাথে সম্পৃক্ত।

শীতলকারী পদার্থ হিসেবে হ্যালোজিনেটেড হাইড্রোকার্বনস (যেমন-হ্যালাইড, ফ্রেয়ন) অথবা অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়। তাপ পরিত্যাগ ও তাপ গ্রহণের মাধ্যমে রেফ্রিজারেটরের গ্যাস পালাক্রমে তরল অবস্থা ও বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাপ গ্রহণের সময় সংরক্ষণ কক্ষের বাতাস থেকে তাপ নিয়ে বাতাসকে ঠান্ডা করে তাপ পরিত্যাগের বেলায় বাতাস ফ্যানের সাহায্যে টেনে নিয়ে পরিত্যাজ্য তাপ বের করে দেয়। পানির মাধ্যমেও এ তাপ বের করে দেয়া যায়। কম্প্রেসার ও কনডেনসার অংশ দুটি মূল সংরক্ষণ কক্ষের বাইরে থাকে বলে অপসারিত তাপে সংরক্ষণ কক্ষের বাতাস উত্তপ্ত হয় না।

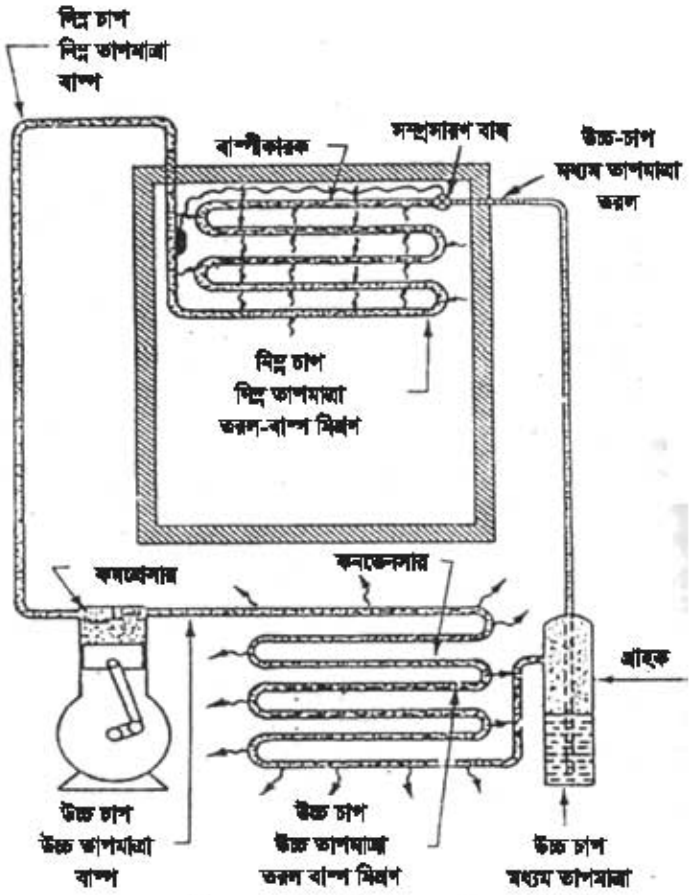


চিত্র : যান্ত্রিক হিমায়ন পদ্ধতি

## নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া ও অন্যান্য উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তি

নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া : শ্বসন প্রক্রিয়া চলার সময়ে $O_2$ গ্রহণ ও $CO_2$ গ্যাস ত্যাগ করে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বদ্ধ পরিবেশে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে ফসলের জন্য বিরূপ আবহাওয়াতে পরিণত হয়। নিয়ন্ত্রিত গুদাম পরিবেশে যখন অক্সিজেনের মাত্রা অনেক নিচে নেমে যায় তখন বাহির হতে বাতাস গুদামে ঢুকানো হয়। আর যদি কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে ব্যাগ ভর্তি করে চুন (১০-১১%) কেজি/ টন পণ্যের জন্য গুদামে রাখা হয়। এভাবে গুদামে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

২০২০

(১-৫% অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড) পণ্য পাকা প্রক্রিয়া, পণ্য নষ্টকারী জীবাণুর বর্ধন এবং অন্যান্য অসুবিধা সৃষ্টির গতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এ পদ্ধতি ভালোভাবে কাজে লাগানো গেলে পণ্যের পরিবর্তন প্রক্রিয়া প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চলে যায় এবং পণ্য বেশিদিন ভালো থাকে।

অন্যান্য উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তি : ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য আরও উন্নত প্রযুক্তি রহিয়াছে। এগুলো হচ্ছে–

১. খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ
২. খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উৎসেচকের ক্রিয়া কমিয়ে সংরক্ষণ।
৩. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুগুলোর ক্রিয়া কমিয়ে সংরক্ষণ।
৪. অ্যালকোহল বা ভিনেগার মিশিয়ে সংরক্ষণ।
৫. রোদে প্যাক করে সংরক্ষণ।

জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ : অধিকাংশ জীবাণু ৬০$^0$ C তাপমাত্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। তাই খাদ্যদ্রব্যকে ৬৩$^0$ C তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করা হলে প্রায় ৯০ শতাংশ জীবাণু মারা যায়। পাস্তুরাইজেশন করেও জীবাণুর পরিমাণ কমানো যায়। এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যকে ৬৬$^0$ C তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট উত্তপ্ত করে হঠাৎ ১০$^0$ C তাপমাত্রায় শীতল করা হয়। এতে অধিকাংশ জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে শোধন করা খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন ভালো থাকে।

উৎসেচকের ক্রিয়া কমিয়ে সংরক্ষণ : ১০$^o$ C এর কম তাপমাত্রায় ফল ও সবজির মধ্যস্থ এনজাইম বা উৎসেচকগুলোর কাজ কমে যায়। আবার ১০০$^o$ C উচ্চ তাপমাত্রায় উৎসেচকগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব তাপমাত্রা কমিয়ে বা উৎসেচকের কার্যকারিতা কমিয়ে অথবা উচ্চ তাপমাত্রায় উৎসেচক ধ্বংস করে দিয়ে ফল বা সবজি সংরক্ষণ করা যায়।

জীবাণুর ক্রিয়া কমিয়ে সংরক্ষণ : খাদ্যদ্রব্য যেমন- ফলের রস, চাটনি, কেচাপ ইত্যাদির সংরক্ষণ করার জন্য অনেক সময় মৃদু বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করা হয়। যেমন- ৩৫০ পি.পি.এম. মাত্রায় সালফার ডাই-অক্সাইড প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকঘটিত জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিরোধ করে।

অ্যালকোহল বা ভিনেগার মিশ্রিত করে সংরক্ষণ : ফলের রস বা খাদ্যদ্রব্যে বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল বা ভিনেগার (৫% এসিটিক এসিড যুক্ত জলীয় দ্রবণ) মিশ্রিত করে সংরক্ষণ করা যায়। এতে জীবাণুর ও উৎসেচকের প্রভাব কমে যায়। খাদ্যদ্রব্যে ১২-১৫% পর্যন্ত এলকোহল বা ভিনেগার মিশানো চলে।

রোদে প্যাক করে সংরক্ষণ : আচার, আমসত্ত্ব, মোরব্বা, শুষ্ক মাশরুম বা ফলমূল প্রভৃতি বর্ষাকালে মাঝে মাঝে জারের মুখ খুলে সূর্যালোকে উত্তপ্ত করতে হয়। এতে খাদ্যদ্রব্যের জলীয় অংশ কমে যায়। ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ কমে যায় এবং বেশি দিন ভালো থাকে।

সংরক্ষণের অর্থনৈতিক ভূমিকা :

ফল ও সবজি সংরক্ষণের অর্থনৈতিক ভূমিকা খুবই ব্যাপক। বাংলাদেশের উন্নয়নে এর ভূমিকা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। যেসব ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা হলো-

১. অপচয় রোধ : মৌসুমে দেশের কিছু বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রচুর ফল ও সবজি উৎপাদিত হয়। সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে এবং এ পণ্যগুলো দ্রত পচনশীল বলে অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য দ্রত পচন আরম্ভ করে যেমন- টমেটো, বাঁধাকপি, আনারস ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে এ পচনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ৫০% হয়ে থাকে। সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে এই অপচয় রোধ করা যেতে পারে।

২. এগ্রোবেসড শিল্প : ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্প স্থাপন করে বেকার সমস্যা, মৌসুমে অপচয়, পুষ্টি সমস্যা দূর করে আর্থিক লাভবান হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. পণ্যের মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা : মৌসুমে ফল ও সবজি অতিরিক্ত উৎপাদন হলে তার মূল্য পড়ে যায়। ফলে কৃষকেরা কষ্টার্জিত পণ্যের মূল্য পায় না। সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে চাষিরা তাদের পণ্য সংরক্ষণ করতে পারবে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারিভাবে সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা উচিত।

৪. আমদানি-রপ্তানি : মৌসুমে আমাদের দেশে ফল ও সবজির আধিক্য হলেও অমৌসুমে ফল ও সবজির অভাব দেখা যায়। আমাদের বিগত ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ফল ও সবজির মোট আমদানি ৪৪ লক্ষ টন সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠলে আমদানি কমে রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় : ফল ও সবজির আমদানি কমে গেলে বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

৬. কর্মসংস্থান : সুষ্ঠু সংরক্ষণের ফলে এগ্রোবেসড শিল্প গড়ে ওঠার সাথে সাথে কমসংস্থান বেড়ে যাবে।

## অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংরক্ষণ কাকে বলে?
২. ফল উৎপাদনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল উল্লেখযোগ্য?
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় আনারস আনতে কত ভাগ পচে যায়?
৪. মৌসুমে উৎপাদন এলাকায় ফল সবজির দাম ভোক্তার এলকায় কত ভাত বেশি হয়?
৫. ফল ও সবজির সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের মৌলিক কার্যাবলি কী কী?
৬. FAO এর মতে পণ্য তোলা ও ব্যবস্থাপনার যে ৪টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তা কী কী?
৭. বেগুন, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়স, ধুন্দল সবজিগুলো কখন সংগ্রহ করতে হয়?
৮. কলাকে ছত্রাক থেকে রক্ষার জন্য কী ঔষধ স্প্রে করতে হয়?
৯. কলাকে কী ধরনের প্যাকিং বাক্সে সংরক্ষণ করে?
১০. TBZ মানে কী?
১১. পেঁপেকে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কী করা হয়?
১২. কীভাবে আলুর কিউরিং করা হয়?
১৩. পেঁয়াজ ও রসুন কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?
১৪. পাতা বাহুল সবজিগুলো কী কী?
১৫. কলা ফ্রিজে রাখলে কী হয়?
১৬. স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় আনারস কত দিন ধরে রাখা যায়?
১৭. গুদামে খোলা পণ্যের জন্য প্রতি ঘনফুট পণ্যে কতটুকু বাতাস প্রবেশ করাতে হয়?
১৮. ড্রাইং ও ডিহাইড্রেশন বলতে কী বোঝায়?
১৯. কোন কোন ড্রায়ারের মাধ্যমে ডিহাইড্রেশন করা হয়?
২০. খাদ্যশস্য শুকালে কিসের চাপ বাড়ে?
২১. কত তাপমাত্র কমলে জৈব রাসায়নিক ক্ষতি অর্ধেক হয়ে যায়?
২২. হিমায়িত সংরক্ষণ প্রযুক্তির মূল তত্ত্বটি কী?
২৩. বায়ু শীতলকরণ সংরক্ষণ প্রযুক্তি কত প্রকার ও কী কী?
২৪. হিমাগার শীতলীকরণ যন্ত্রের মূল অংশ কয়টি ও কী কী?
২৫. কম্প্রেসার অংশে কী ঘটে?
২৬. শীতলকারী পদার্থ হিসেবে হিমাগার শীতলীকরন যন্ত্রে কী ব্যবহৃত হয়?
২৭. শ্বসন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বদ্ধ পরিবেশে কী ঘটে?
২৮. নিয়ন্ত্রিত গুদামে $CO_2$ বেড়ে গেলে কী করতে হয়?
২৯. খাদ্যদ্রব্যের ৯০% জীবাণু কীভাবে ধ্বংস করা যায়?
৩০. পাস্তুরাইজেশন কী?
৩১. ফল ও সবজির এনজাইম কীভাবে কমানো ও বাড়ানো যায়?
৩২. ফলও সবজিতে কোন রাসায়নিক প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিরোধ করে?
৩৩. কী পরিমাণ অ্যালকোহল বা ভিনেগার মিশিয়ে ফলের রস সংরক্ষণ করে?
৩৪. বিগত অর্থবছরে ফল ও সবজির আমদানি পরিমাণ কত?

২০২০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সংরক্ষণের সংজ্ঞা দাও।
২. FAO এর মতে পণ্য তোলা ও ব্যবস্থাপনার ৪টি বিষয়ের বর্ণনা দাও।
৩. ফসল তোলার সূচক বলতে কী বোঝায়?
৪. ক্ষেত থেকে পণ্য কীভাবে পরিবহন করলে ভালো হয়?
৫. সূর্যতাপ হতে সংগৃহীত পণ্যকে কীভাবে রক্ষা করা যায়?
৬. সংরক্ষণের জন্য কীভাবে আম সংগ্রহ করা উচিত?
৭. আলু কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়?
৮. টমেটো কীভাবে সংরক্ষণ করা উত্তম?
৯. কলা সংরক্ষণের তাপমাত্রা ও আদ্রর্তা বর্ণনা কর।
১০. আনারস সংগ্রহের তাপমাত্রা ও আদ্রতা বর্ণনা কর।
১১. ফল ও সবজি সংরক্ষণের গুদাম ঘরের বর্ণনা দাও।
১২. খাদ্য শুষ্ককরণের সুবিধাগুলো কী কী?
১৩. ড্রাইং ও ডিহাইড্রেশনের পার্থক্যগুলো কী কী?
১৪. শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের মূলনীতি কী?
১৫. ঠাণ্ডা বাতাসবাহিত সংরক্ষণাগারের বর্ণনা দাও।
১৬. উন্নত সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো কত প্রকার ও কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফল ও সবজি সংরক্ষণ কী? এর প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ।
২. ফল ও সবজি সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের প্রাথমিক কার্যাবলি লেখ।
৩. আম, কলা, পেঁপে, আলু, পেঁয়াজ, রসুন ও টমেটোর সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক কার্যাবলি বর্ণনা কর।
৪. আম, কলা, পেঁপে, আনারস ও আলুর সংরক্ষণের জন্য তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বর্ণনা কর।
৫. খাদ্য শুষ্ককরণের সুবিধা, অসুবিধা, পদ্ধতি ও মূলনীতি বর্ণনা কর।
৬. ফল ও সবজি সংরক্ষণের হিমায়িত প্রযুক্তিগুলো কী কী বর্ণনা কর।
৭. নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া ও অন্যান্য উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তি বর্ণনা কর।

# অধ্যায় - ২
# ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফল একটি সুস্বাদু খাবার। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে, যা আমাদের শরীরের জন্য অতীব প্রয়োজন। প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় ফল ও সবজি অবশ্যই থাকতে হবে। এগুলো কিছুটা হলেও খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান দুটোই বাড়ায় এবং ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের অভাবজনিত রোগের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। কাজেই ফল ও সবজির উৎপাদন, প্রাপ্যতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মতো ফল ও সবজি সাধারণ অবস্থার রেখে দিলে বেশিদিন ভালো থাকে না। বাইরের আবহাওয়া থেকে মোল্ড, ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির আক্রমণে এবং ভেতর থেকে এনজাইমের ক্রিয়া এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে ফল ও সবজি নষ্ট হয়। ফল ও সবজি পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করলে তা থেকে বহুল পরিমাণে অপদ্রব্য ও জীবাণু অপসারিত হয়। কাজেই বেশ কিছু সময়ের জন্য এগুলো ভালো থাকে। এভাবে জীবাণু থেকে ফল ও সবজিকে দূরে সরিয়ে রেখে সংরক্ষণ করাকে অ্যাসেপসিস বলে।

যেহেতু ফল ও সবজি অতিমাত্রায় পচনশীল এবং মৌসুমভিত্তিক তাই আমাদের উচিত ফল ও সবজির সুষ্ঠু বিতরণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। এতে করে শুধু যে আমাদের প্রয়োজন মিটবে তা নয় এবং উদ্বৃত্ত ফল ও সবজির প্রক্রিয়াজাত খাবার রপ্তানি করে বহু বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যাবে।

## ২.১ সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে কৃষি সম্পদে ভরপুর একটি দেশ। এদেশে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসবজি জন্মানোর জন্য যেসব আবহাওয়াগত বা পরিবেশগত উপাদান দরকার যেমন- উর্বর মাটি, তাপমাত্রা, আলো বাতাস, আর্দ্রতা, পানির প্রাচুর্য, প্রয়োজনীয় জনবল ইত্যাদি সবই বিদ্যমান। বিরাজমান উপাদানগুলো কাজে লাগিয়ে এসব কৃষি সম্পদগুলো আরও অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব, যদি আমাদের কৃষক বা উদ্যোক্তার আগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করা যায়। আর এই বাজার দুই ধরনের পারে। যেমন–

ক) সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের বাজার ও

খ) প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের বাজার।

কৃষক বা উদ্যোক্তার কাছে বেশি লাভ পৌঁছাতে হলে প্রথম ধরনের বাজারের সাথে সাথে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের বাজারের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এতে দেশ ও জাতি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর নজর দেয়া না যাবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশীয় কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র সহজতর ও প্রশস্ততর হবে না।

সংরক্ষণ : উপযুক্ত প্রযুক্তি বা আধুনিক কলাকৌশলের মাধ্যমে ভৌত ও পুষ্টিমান বজায় রেখে ফল ও সবজি দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী করে রাখার পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বলা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ফল ও সবজির তাজা অবস্থার গুণাগুণ বজায় থাকে এবং সংরক্ষিত ফসল তাজা ফল ও সবজি হিসেবে ভক্ষণ বা খাওয়া যায়। যেমন-হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষণ, বাঁশের মাচায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

সংরক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো–

১) ফল ও সবজির সজীব অবস্থা বজায় রাখা।

২) ফল ও সবজির শরীরের জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াকর্মের মাত্রা অনেক কমিয়ে আনা।

৩) ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন যেন খুব ধীরে ঘটে তার ব্যবস্থা করা।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : এটি এক ধরনের সংরক্ষণ। যে পদ্ধতির মাধ্যমে ফল ও সবজির আকৃতি, প্রকৃতি, অবয়ব পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংরক্ষণ করা হয় তাকে প্রক্রিয়াজাত সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণ বা প্রসেসিং বলে। যেমন–চিনির সিরায় আমের টুকরা সংরক্ষণ। টমেটো গাছ থেকে তোলার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে পচে যায়। আর যদি প্রসেসিং করে টমেটো সস বা কেচাপ তৈরি করে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে বোতলজাত করা যায়, তবে তা অনেকদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায় ও এর গুণগত মানও বেড়ে যায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো :

১। ফল ও সবজির জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া।

২। ফল ও সবজি জড় বস্তুতে পরিণত হওয়া।

বাংলাদেশের ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভাবনা

প্রক্রিয়াজাত শিল্প ও বাজারজাতকরণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেভাবে এগিয়ে গেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। তবে আশার কথা যে ইদানীং কিছু কিছু ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে বা গড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। যেমন- রাজশাহীতে প্রাণ কোম্পানির আম প্রক্রিয়াজাত শিল্প, মুন্সীগঞ্জে ও জয়পুরহাটে ইতালির ফ্লেমিংগো নামক কোম্পানি আলু থেকে পটেটো ফ্লেক্স তৈরি করছে। এছাড়াও ছোট আকারে বহু প্রতিষ্ঠান দেশে ও বিদেশে ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করছে। ক্যানিং করা ফল ও সবজি এবং আলু হতে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখযোগ্য হারে যেসব পণ্য উৎপাদিত হয় এবং তা থেকে কী ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য তৈরি হতে পারে তা নিচের ছকে দেখানো হলো :

| ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | উল্লেখযোগ্য উৎপাদন অঞ্চল | সম্ভাব্য প্রক্রিয়াজাত খাদ্য |
|---|---|---|---|
| ১. | আম | রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর | রস, আমসত্ত্ব, টফি, স্কোয়াস, ঝাল ও মিষ্টি আচার |
| ২. | আনারস | মধুপুর, সিলেট ও চট্টগ্রাম | রস, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি ও ক্যানডি |
| ৩. | কাঁঠাল | শ্রীপুর, মধুপুর, গাজীপুর | স্কোয়াস, জ্যাম, জেলি ও ক্যানডি। |
| ৪. | পেয়ারা | বরিশাল ও দিনাজপুর | রস ও জেলি |
| ৫. | টমেটো | বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর | সস, কেচাপ ও জ্যাম |
| ৬. | কলা | বগুড়া, ঝিনাইদহ | চিপস ও ক্যানডি |
| ৭. | বরই | পার্বত্য চট্টগ্রাম | মিষ্টি আচার/ চাটনি |
| ৮. | আলু | মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, বগুড়া ও জয়পুরহাট | চিপস, ফ্লেক্স ও ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চফ্রাই। |

## ২.২ ফল ও সবজি সংরক্ষণের মূলনীতি

ফল ও সবজি কোনো নির্জীব, নিরেট বা জড় পদার্থ নয় এরা জীবন্ত বস্তু। গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর ফল ও সবজির জীবিত অবস্থা চলতে থাকে। ফল ও সবজির জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াকর্ম (জারণ ও বিজারণ) গাছ থেকে পাড়ার পরও চলতে থাকে। এর ফলে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফল ও সবজির ওজন কমে যায়। প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় ফল ও সবজি হতে পানি বাষ্পায়িত হয়ে শুকিয়ে যায়। পচন ক্রিয়া শুরু হয়। সংরক্ষণযোগ্যতা দ্রুত লোপ পায়। কাজেই সংরক্ষণের মূলনীতিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. তাপমাত্রা কমিয়ে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি হ্রাস করা।
২. পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার আর্দ্রতা বাড়ানো।
৩. বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা।
৪. পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় উপাদানসমূহের পরিবর্তন করা।
৫. প্রয়োজন অনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা।

তাপমাত্রা কমানো : ফল ও সবজির শ্বসন ও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া হচ্ছে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া। তাপমাত্রা বাড়লে যে কোনো রাসায়নিক গতি ত্বরান্বিত হয়। আবার তাপমাত্রা কমিয়ে এই গতির হার কমানো যায়। হিমাগারে বা রেফ্রিজারেটরে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করে তাপমাত্রা কমিয়ে আনলে শ্বসন ও প্রস্বেদনের গতি কমে যাবে এবং ফল ও সবজি পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে পরিপক্ব অবস্থায় পরিণত হওয়া বিলম্বিত হবে এ নীতির উপর ভিত্তি করেই হিমায়িত সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

আর্দ্রতা বাড়ানো : ফল ও সবজিতে থাকে ৮০% জলীয় পদার্থ কিন্তু আমাদের পারপার্শ্বিক আবহাওয়াতে জলীয় অংশের পরিমাণ শাক ও সবজি থেকে কম থাকে। এ কারণেই তাজা ফল ও সবজি থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলীয় অংশ বের হয়ে বাহিরের আবহাওয়ায় মিশে যায়। গাছ থেকে পাড়া ফল ও সবজিতে শিকড় দ্বারা গৃহীত পানি এসে এ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই ফল ও সবজি শুকিয়ে আকার ও আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। এ নীতির উপর ভিত্তি করে হিউমিডিফায়ার যন্ত্র উদ্ভাবন ঘটেছে। এ যন্ত্রের সংরক্ষণ কক্ষের আর্দ্রতা বাড়িয়ে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা যায়। এ ছাড়াও দেশীয় পদ্ধতিতে যেমন– পানি ছিটিয়ে, ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহ ও পানিতে চুবিয়ে আর্দ্রতা বাড়ানো যায়।

বাতাস চলাচল : শ্বসন প্রক্রিয়ার ফলে ফল ও সবজি থেকে সৃষ্ট যে গ্যাস বের হয়, তাকে ইথিলিন গ্যাস বলে। এটিকে ফল পাকানো হরমোন বা জৈব রাসায়ানক পদার্থ বলে। এর সংস্পর্শে ফল ও সবজি এলে তা দ্রত পেকে যেতে আরম্ভ করে। যদি গুদামঘর বায়ুরুদ্ধ থাকে তবে ইথিলিন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ফল ও সবজি দ্রুত পেকে পচন ক্রিয়া শুরু হয়। যদি গুদামঘরে কিছু সময় পর পর বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা হয় তাতে ফল ও সবজির সংরক্ষণ সময় বাড়ানো যায়।

গ্যাসীয় উপাদানের পরিবর্তন : ফল ও সবজির শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ব্যবহার হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন থাকে শতকরা ২১ ভাগ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে ০.০৩ ভাগ। যদি কোন উপায়ে গুদামঘরের অক্সিজেন কমিয়ে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে শ্বসন প্রক্রিয়া অনেক কমে যাবে। এটি একটি আধুনিক পদ্ধতি এবং পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে বহুল পরিমাণে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার : ফল ও সবজি পাকার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যত্ন সহকারে পাড়া হয়। অতঃপর তা স্বল্প মেয়াদ বা দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ করা হয়। ফল ও সবজি একবার পেকে গেলে তা সংরক্ষণ না করে বিক্রয় করাই শ্রেয়। তবে পাকার পূর্বে পেড়ে তা সংরক্ষণ করলে কতিপয় রাসায়নিক ব্যবহার করে সংরক্ষণকাল বাড়ানো যায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণের মূলনীতি

ফল ও সবজি সংগ্রহের পর প্রক্রিয়াজাত করার সময় এদের ভৌতও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে –

ক) উৎসেচক বা এনজাইমের দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ও

খ) বিভিন্ন প্রকার অনুজীবের আক্রমণ।

ফল ও সবজি পাকার সময় এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু উৎসেচকের কাজ শুরু হয়। ফলে খুব দ্রুতই ফল ও সবজি পেকে ওঠে। উৎসেচকের ক্রিয়া বন্ধ করতে হলে ফল ও সবজিকে ফুটন্ত পানিতে কয়েক মিনিট রেখে তারপর উঠিয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে ব্লাঞ্চিং বলে। ফল ও সবজিতে জীবাণুর আক্রমণ হতে পারে। এগুলোর নিম্নলিখিত উপায়ে কমিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা যায় :

ক) তাপ প্রয়োগে

খ) তাপমাত্রা কমিয়ে

গ) জলীয় অংশ হ্রাস করে

ঘ) জীবাণু শূন্য করে।

এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

তাপ প্রয়োগ : উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগ করে ফল ও সবজির জীবাণু ধ্বংস করে সংরক্ষণ করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক) পাস্তুরাইজেশন ও

খ) স্টেরিলাইজেশন

ক) পাস্তুরাইজেশন : ১০০° সে. অথবা অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় জীবাণু ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে পাস্তুরাইজেশন বলে। তবে কম সময় এবং কত তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হবে তা নির্ভর করে খাদ্যের প্রকৃতি ও পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতির ওপর। এ পদ্ধতি দুইভাবে করা যায়। যেমন-

হোল্ডিং পদ্ধতি : এতে অল্প তাপমাত্রা ও দীর্ঘ সময় লাগে।

HTST পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রাও খুবই অল্প সময় (High Temperature-Short Time) লাগে। পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে ফল ও সবজিকে ৬৩$^0$ C তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট কাল উত্তপ্ত করে হঠাৎ ঠাণ্ডা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি দুধ জীবাণুমুক্ত করা হয়। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের নাম অনুসারে এ প্রক্রিয়ার নাম হয়েছে পাস্তুরাইজেশন। এতে যক্ষ্মা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি রোগের জীবাণু ধ্বংস করে দুধকে নিরাপদ করে।

(খ) স্টেরিলাইজেশন : ১০০$^0$ C এর অধিক তাপমাত্রায় ফল ও সবজিকে উত্তপ্ত করে জীবাণু ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে স্টেরিলাইজেশন বলে। বাষ্পকে চাপ প্রয়োগ করে ১০০$^0$ C এর বেশি তাপমাত্রা পাওয়া যায়। শাক সবজিকে ক্যানিং বা টিনজাত করে সম্পূর্ণ অনুজীব মুক্ত করতে ১২১$^0$ C তাপমাত্রা প্রয়োগ করা হয়।

তাপমাত্রা কমিয়ে : রোদে শুকানো ফল ও সবজিকে তাপমাত্রা কমিয়ে ফ্রিজিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণত যে সব ফল ও সবজি পরিপক্বতায় পৌঁছে গেছে সেগুলোই ফ্রিজিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। ১৮$^0$ C তাপমাত্রায় অনুজীব জন্মাতে পারে না এবং এনজাইমের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ থাকে।

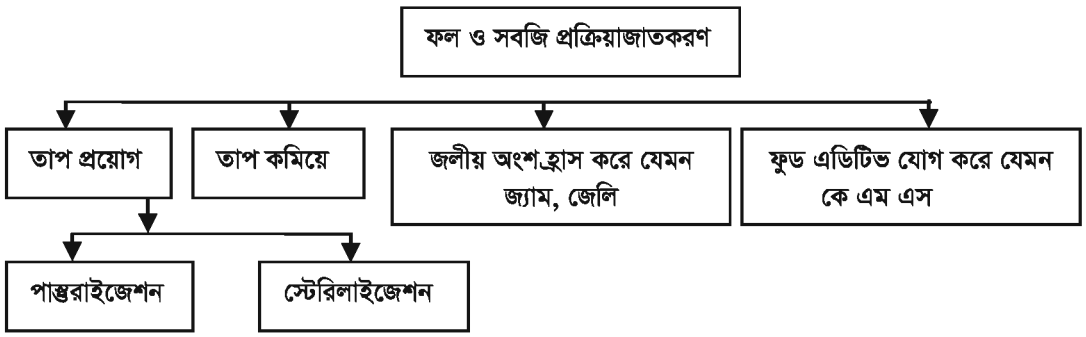


চিত্র : বিভিন্ন প্রকার ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজতকরনের ছক

জলীয় অংশ হ্রাস করে : এ পদ্ধতিতে ফল ও সবজিকে ভালো করে শুকানো হয়। তারপর তা ঘন চিনির সিরাপ বা লবণের দ্রবণে বা তেলের মধ্যে শুকানো অবস্থায় ডুবিয়ে রেখে প্রক্রিয়াজাত করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। কারণ খাদ্যদ্রব্যে জলীয় ভাগ কম থাকলে জীবাণুর ক্রিয়া কমে যায়। যেমন- জ্যাম, জেলি, আচার ও মোরব্বা ইত্যাদি।

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে : খাদ্য সংরক্ষণের জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি বাহির থেকে যোগ করা হয় তাকে খাদ্য সহযোগী দ্রব্য বা ফুড এডিটিভস (Food additives) বলে। এটা খাদ্যের মূল উপাদান নয়। শুধুমাত্র সংরক্ষণের কারণ বা মোড়কজাতকরণের সময় বাহির থেকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় যোগ করা হয়। যেমন-

১) পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট বা KMS
২) সোডিয়াম বেনজয়েট
৩) এসিটিক এসিড
৪) সালফার ডাই অক্সাইড ও সোডিয়াম সালফাইড
৫) অ্যালকোহল ও ভিনেগার
৬) ফরমালডিহাইড ইত্যাদি।

## ২.৩ বাণিজ্যিক ও গার্হস্থ্য পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ

অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর মাটির জন্য বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ ফলমূল ও শাকসবজি চাষাবাদ হয়ে থাকে। উৎপাদিত ফলমূল ও শাক-সবজির অধিকাংশই মৌসুমি ও দ্রুত পচনশীল। উপযুক্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ মাধ্যমের অভাবে ঐ সমস্ত পণ্য মৌসুমে খুবই সস্তা দামে বাজারে বিক্রয় হয় ও এর একটি বিরাট অংশ পচে নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং এখানে পুষ্টিকর খাদ্যের

প্রচুর অভাব রয়েছে। এরূপ দেশের পক্ষে উন্নতমানের ফলমূল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং অনতিবিলম্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সমস্ত পচনশীল ফল-মূলের অপচয় রোধ করে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকারি ও বেসরকারিভাবে নেয়া উচিত। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বলতে যে সকল খাদ্য বুঝায় তা হলো–

১) জুস, স্কোয়াশ, ককটেল, কর্ডিয়াল, নেকটার ও সিরাপ।
২) জ্যাম, জেলি ও মারমালেড
৩) আচার, চাটনি ও কাসুন্দি
৪) মোরব্বা ও ক্যান্ডি
৫) ফল ও সবজি টিনজাতকরণ
৬) ফল ও সবজি শুকানো যেমন– আমসত্ত্ব, আমসি, আলুর চিপস।
৭) ফল ও সবজি চিনি ও লবণে প্রক্রিয়াজাতকরণ।

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে এটি একটি লাভজনক এগ্রোবেসড ফুড শিল্পে রূপ নিচ্ছে। বর্তমানে দেশে বেশ কিছু প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে। এক রিপোর্টে জানা যায় বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলায় প্রায় এক হাজারেও অধিক ছোট-বড় এগ্রো প্রসেসিং শিল্প গড়ে উঠেছে। বিগত পাঁচ বছরে দেখা যায় বাংলাদেশের কিছু প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ অব কোম্পানিগুলো এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে।

যেমন–

ক) প্রাণ ফুড
খ) আকিজ গ্রুপ
গ) এ.সি.আই ফুড
ঘ) এ.সি.আই এগ্রোভেট অ্যান্ড বেভারেজ লি.
ঙ) স্কয়ার কনজুমারস প্রোডাক্ট
চ) কোকোলা ফুডস্
ছ) ইস্পাহানী ফুডস্
জ) ড্যানিশ ফুডস্
ঝ) মেরিডিয়ান ফুডস্
ঞ) ফু-ওয়াং ফুড
ট) প্যারাডাইস ফুড প্রোডাক্টস
ঠ) নেস্‌লে ম্যানুফ্যাকচারিং
ড) রাজশাহী ম্যাঙ্গো প্রোডাক্টস
ঢ) বিডি ফুডস
ণ) আহমেদ ফুড প্রোডাক্ট
ত) প্রিন্স ফুড ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত : ফল-মূল ও শাকস-সবজি সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টিনজাতকরণ, ফলের রস উৎপাদন এবং জ্যাম, জেলি ও চাটনি উৎপাদন করে থাকে। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করার চেষ্টা করছে। নিচের সারণিতে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে উৎপাদিত ফল ও সবজি এগ্রোবেসড শিল্পে ব্যবহারের শতকরা হার দেখানো হলো :

| ক্রমিক নং | দেশের নাম | শতকরা পরিমাণ (%) |
|---|---|---|
| ১। | মালয়েশিয়া | ৮৩ |
| ২। | ফিলিপাইন | ৭৮ |
| ৩। | যুক্তরাষ্ট্র | ৭০ |
| ৪। | ব্রাজিল | ৭০ |
| ৫। | থাইল্যান্ড | ৩০ |
| ৬। | ভারত | ০৫ |

## কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তাদের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের নিট ঋণ ও অগ্রীমের ৫% হারে হিসাবায়ন করে চলতি অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৬,৪০০ (ষোলো হাজার চার শত) কোটি নির্ধারণ করা হয়েছে। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় ৫.৪৭ শতাংশ বেড়ছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বাইরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নিজিস্ব অর্থায়ানে যথাক্রমে ৩০ কোটি টাকা, ৬৭৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করবে। বিগত বছরগুলোতে আমাদের দেশ হতে ফল, সবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ –

| ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | ২০১২-১৩ সাল (মে. টন) | ২০১৩-১৪ সাল (মে. টন) | ২০১৪-১৫ সাল (মে. টন) |
|---|---|---|---|---|
| ১। | চাউল | ৬২৪১৩ | ৮৬৪৪২২ | ১৪৯৬১২৪ |
| ২। | গম | ২৫৭১০৩০ | ৩৩৪৩০৮৫ | ৩৫৩৫৫৬৬ |
| ৩। | ভুট্টা | ১৫৬৫৬০ | ৫৬৭৩৩০ | ৪০৩৭২৫ |
| ৪। | তাজা ফল | ৩১০০১৫ | ৩৪৫৮৮৮ | ৩৪৮৭৫৩ |
| ৫। | শুকনা ফল | ৩৬২৩৫ | ৫৯০৮৮ | ৪০৬৭১ |
| ৬। | তেল জাতীয় | ৫০৩৭৫১ | ৮৪৯৬০০ | ৬৮৮৫৪ |
| ৭। | মসলা জাতীয় | ৬৯৬১৫৫ | ৭৭১০০০ | ৭৫৯৬২৭ |
| ৮। | সবজি জাতীয় | ২০০৭৪ | ১৬৫৬৩ | ১৮৮৮৩ |
| ৯। | স্টার্চ জাতীয় | ৩৭১৬০ | ৪৯৫১৭ | ৩৪৭৫২ |
| ১০। | ডাল জাতীয় | ৮৯৮৬৬৩ | ৬০২৫১৫ | ৮২৭৯১০ |
| ১১। | কাঠ জাতীয় | ২৩৫১০০ | ২৭৪৭৭০ | ২৫৫১৪১ |
| ১২। | তামাক জাতীয় | ৩৩১৪ | ৩২৭৮ | ১৭৭৮ |

উৎস : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : ২০১৬ ইং

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ দু'পর্যায়ে হয়ে থাকে। যথা-
ক) বাণিজ্যিক পর্যায়ে
খ) গার্হস্থ্য পর্যায়ে

বাণিজ্যিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ আমাদের দেশে এ ধরনের বড় ও ক্ষুদ্র এগ্রোবেসড শিল্প প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। আশার কথা যে ইদানীংকালে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে আগ্রহী হচ্ছে। যেমন- প্রাণ ফুড, এ.সি.এম.ই. এসিআই, স্কয়ার ফুড ইত্যাদি। আম, কাঁঠাল, আনারস, লেবু, টমেটো, আলু, শাক-সবজি ইত্যাদির বাণিজ্যিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এই খাত হতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, যুবক ও নারীদের কর্মসংস্থান ও পুষ্টি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে দেশ ও বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে।

গার্হস্থ্য পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ

সাংসারিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে ফল ও সবজি সংরক্ষণ করে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরি করা হলে তাকে গার্হস্থ্য পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। প্রতিটি ফল ও সবজিই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। মৌসুমের অতিরিক্ত ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে রাখা হলে সারা বছর গৃহিণীরা সহজেই সুস্বাদু ফল ও সবজির আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি ভোগ করতে পারেন। আর্থিক অভাব, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাবে আমাদের সমাজের সকল স্তরে এর প্রচলন এখনও আশানুরূপ নয়। অথচ এসব প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য বাজার অর্ধেক মূল্যে ঘরে তৈরি করা সম্ভব। এজন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কাজ করছে তাদের কিছু নাম দেয়া হলো-

১। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহ
৩। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৪। ইনস্টিটিউট অব নিউট্রশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা।
৬। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৭। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
৮। প্র্যাক্টিক্যাল অ্যাকশন বা ভূতপূর্ব আই.টি.ডি.জি. বাংলাদেশ
৯। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি বিভাগ
১০। বিভিন্ন এনজিও ও ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি।

২০২০ এছাড়া এগ্রো প্রসেসিং প্রকল্প বা এগ্রোবেসড ফুড শিল্প স্থাপন করে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার জন্য সরকার শিল্পোদ্যোক্তাদের সহায়তাও করছেন। এই কারণে মৌসুমে সামান্য টাকায় যে পরিমাণ

আম, আনারস, কুল, চালতা বা টমেটোর চাটনি প্রস্তুত করা যায় তা দিয়ে একটি ছোট পরিবারের ২-২.৫ মাস সহজেই ব্যবহার করতে পারে। বর্ষাকালে সবজির অপ্রতুলতার সময় শুকানো বাঁধাকপির ব্যবহার প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়।

## ২.৪ ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নানা ধরনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও তৈজসপত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সরঞ্জামগুলো ফল ও সবজির আকার-আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে অনেক ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল ও সবজির গুণগত মানের ক্ষতি হতে পারে। ফল ও সবজির এসিড ও ট্যানিন লোহার সংস্পর্শে এলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় এবং অবাঞ্ছিত রং ও ক্ষতিকারক পদার্থের সৃষ্টি করে। এজন্য প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের কাজে লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়, অন্ততপক্ষে যন্ত্রপাতির যেসব অংশ ফল ও সবজির সংস্পর্শে আসে। এগ্রোবেসড শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রধানত স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, এনামেল, পলিথিন, কাচ ও কাঠের তৈরি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগ্রোবেসড শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে যে সকল তৈজসপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার কিছু চিত্রসহ বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

১. চৌবাচ্চা ও বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি : কাজের আয়তন বা পরিমাণ অনুযায়ী আস্ত ফল ও সবজি ধোয়ার জন্য উপতলযুক্ত সিমেন্ট বা গ্যালভানাইজিং আয়রন নির্মিত চৌবাচ্চা এবং বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়। উত্তপ্ত পানিতে বোতল ফোটানো এবং টিন বা ক্যানের পাত্রের তলদেশে একটি সচ্ছিদ্র ধাতব পিঁড়ি অথবা অনুরূপ কেনো মাচান পেতে তার উপর বসানো হয়। এ ধরনের উপতলকে ফলস বটম বলে। ধাতব ও উপতলের অভাবে কয়েক ভাঁজে ভাঁজ করা মোটা কাপড় বিছিয়েও কাজ চালানো যায়। কাঁচা ফল ও সবজি ধোয়ার জন্যও উপতলযুক্ত চৌবাচ্চা বিশেষ উপযোগী। কারণ ধোয়া ময়লা উপতলের নিচে পড়ে যায়। প্রেসার কুকার বা অটোক্লেভের ভিতরও উপতল বসানো থাকে।

২. অ্যালুমিনিয়াম টপ টেবিল : ফল ও সবজি যাতে সহজেই কাটা যায়, পরিষ্কার করা যায় এবং এসিড বা উত্তাপে নষ্ট না হয় সেজন্য বড় কাঠের টেবিলের উপরিভাগ অ্যালুমিনিয়ামের শীট দ্বারা এ টেবিল মোড়ানো থাকে।

৩. বিভিন্ন ধরনের ছুরি : প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের পূর্বে ফল ও সবজিকে সুবিধামতো প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ছুরির প্রয়োজন হয়। যেমন -

ক) **পাইন আপেল** রিমুভার : এ ছুরি কোনাকৃতি পাতবিশিষ্ট। এ ছুরির সাহায্যে আনারসের চোখ অতি সহজেই তুলে ফেলা যায় (পরবর্তী পাতায় চিত্র )

খ) পিলিং নাইফ : এ ছুরি ফল ও সবিজির খোসা ছাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছুরি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে (পরবর্তী পাতায় চিত্র)।

গ) ক্যান ওপেনার ও কর্ক রিমুভার : এর সাহায্যে ক্যানের ঢাকনা ও বোতলের কর্ক বা শোলার ছিপি ও পেপসি কোলা জাতীয় বোতলের মুখ খোলা হয় (চিত্র)।

ঘ) পিটিং নাইফ : এ ছুরির সাহায্যে ফল বা সবজির চোখ বা অন্য অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্র অংশ খুড়ে তুলে নেওয়া হয় (পরবর্তী পাতায় চিত্র)।

ঙ) সীড রিমুভার : এর সাহায্যে ফলের বীচি আলাদা করা হয় (নিচে দেওয়া হলো)।

চ) কাটিং নাইফ : সাধারণভাবে ফল ও সবজি কাটার জন্য এ ছুরির প্রয়োজন। তাছাড়া এটি দ্বারা কাটা বা খোসা ছাড়ানোর কাজ বিশেষ সুবিধাজনক (চিত্র)।

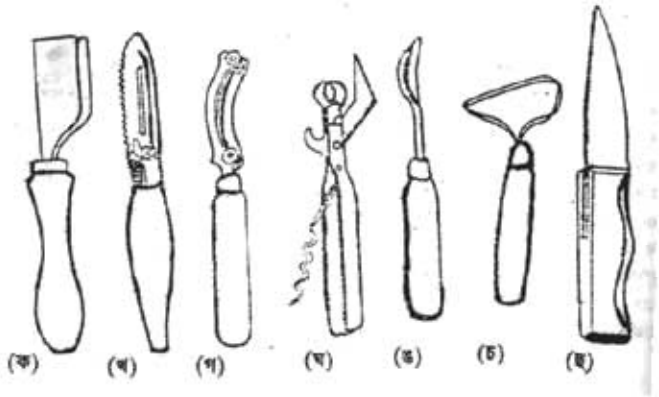


ক) পাইন আপেল রিমুভার (খ) ও (গ) পিলিং নাইফ (ঘ) ক্যান ওপেনার ও কর্ক রিমুভার
(ঙ) পিটিং নাইফ (চ) সীড রিমুভার (ছ) কাটিং নাইফ
চিত্র : বিভিন্ন প্রকার ছুরি

৪. প্যান ও ডেকচি : প্রধানত পানি বা ফল ও সবজির রস ফোটানোর জন্য অথবা অন্যান্য প্রয়োজনেও সসপ্যান বা বড় ডেকচি ব্যবহার করা হয়। এটি অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি হয়ে থাকে।

৫. বিভিন্ন সামগ্রী : হাতা, মগ, চামচ, বালতি, ছাঁকনি-হাতা, কাচের ছোট গ্লাস, কাচের বিকার, কাঁটা চামচ, ফানেল, টেস্টটিউব, প্লাস্টিক বোল, চিমটা, বাঁশের চালুনি, বোতল পরিষ্কারের নাইলন ব্রাশ ইত্যাদি তৈজসপত্র সামগ্রী প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৬. ট্রে : ফলের রস, সিরাপ ইত্যাদি ঢেলে রাখা বা ঠাণ্ডা করা এবং ফল ও সবজির টুকরা লবণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে ট্রের ব্যবহার বিশেষ উপকারী। এ সকল ট্রে স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যানামেলের তৈরি হয়ে থাকে। বাঁশের বা কাঠের ট্রে ফল ও সবজির টুকরা রোদ্রে শুকানোর জন্য বা সোলার ড্রায়ারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৭. দাঁড়িপাল্লা : ফল, সবজি, চিনি, লবণ ইত্যাদি মাপার জন্য ৫০ গ্রাম হতে ২০ কিলোগ্রাম ওজন ক্ষমতা বিশিষ্ট কাঁটা প্রকৃতির বড় দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু মসলা, এসিড, সংরক্ষক, চুন, পেকটিন মাপার জন্য সূক্ষ্ম নিক্তি বা ওয়েট ব্যালান্স ব্যবহার করা হয়।

৮. আয়তন মাপার সিলিন্ডার : পানি বা অন্যান্য দ্রবণের আয়তন (মি.লি.) মাপার জন্য দাগাঙ্কিত পাঠ রেখাযুক্ত বেলনাকৃতি কাচের পাত্র ব্যবহার করা হয়। এ পাত্রকেই মেজারিং সিলিন্ডার বা আয়তন মাপক সিলিন্ডার বলে।

৯. কোরার ও পাঞ্চার : আনারসের ভিতরের শক্ত শির বা কোর অংশ গোল করে কেটে নেওয়ার জন্য যে ফাঁকা নল ব্যবহার করা হয় তাকে কোরার বলে। আনারস ক্যানিং বা টিনজাতকরণের ক্ষেত্রে অধিক ব্যাসের আনারসের চাকা আকৃতির টুকরাকে ক্যানের ব্যাস অনুযায়ী গোল করে কাটার জন্য যে চোঙ

২০২০

ব্যবহার করা হয় তাকে পাঞ্চার বলা হয়। কোরার ও পাঞ্চার সাধারণত স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি হয়ে থাকে।

১০. গ্রেটার বা কুরানি : একাধিক ছিদ্রযুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের পাতকে গ্রেটার বা কুরানি বলে। এর ছিদ্রগুলো ধারালো বিধায় সহজেই সবজি কুরিয়ে নেয়া যায়। ছোট ছিদ্রের কুরানিতে মিহি কুরানো হয় এবং বড় ছিদ্রের কুরানিতে মোটা করে কুরানো হয়। লাউ, গাজর ও আম কুরিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য যেমন- দুধ লাউ, গাজরের হালুয়া ইত্যাদি তৈরি করা হয়। নারিকেল কুরানোর জন্য বিশেষ কুরানি ব্যবহৃত হয়।

১১. বিটার বা ফেটানি : এটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। ফলের রস বা বিশেষ করে ডিম ফেটানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

১২. বাস্কেট প্রেস : এ যন্ত্রে স্ক্রু ধরনের হাতল ঘুরিয়ে কাঠ, স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম ড্রামের ভিতরে চলনশীল পাটাতনের উপর হতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। পাটাতনের চাপে নিষ্পেষিত ফলের রস নিষ্কাশিত হয়ে ছাঁকনি প্রকারের পার্শ্বতলে সংগৃহীত হয়। আপেল, আনারস, টমেটো, তরমুজ প্রভৃতির রস এ যন্ত্রে নিষ্কাশন করা যায়।

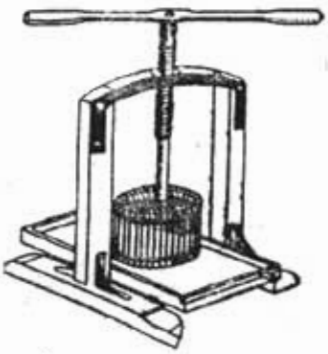

চিত্র : বাস্কেট প্রেস

চিত্র : রস নিষ্কাশন যন্ত্র

১৩. জুস এক্সট্রাক্টর : এ যন্ত্রকে জুসার বা রস নিষ্কাশন যন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এ যন্ত্র দ্বারা আনারস, কমলালেবু, ফলসা ইত্যাদি ফলের রস নিষ্কাশন করা হয় (চিত্র)।

১৪. রোজ টাইপ জুস এক্সট্রাক্টর : এ যন্ত্রে একটি ডিশের উপর ঠিক মাঝখানে ফুলের কুঁড়ির মতো দেখতে ঘূর্ণনশীল একটি খাঁজকাটা গম্বুজাকৃতি স্তম্ভ থাকে। রস নিষ্কাশনের জন্য একটি লেবু বা অন্য কোনো ফল আড়াআড়িভাবে ঠিক মাঝখানে হতে কেটে দুই টুকরা করা হয়। অতঃপর এক টুকরা কুঁড়ি বা Rose (গম্বুজাকৃতি) এর মাথায় এক হাতে চেপে বসানো হয়। অন্য হাত দ্বারা যন্ত্রের হাতলের সাহায্যে কুঁড়ি বা রোজটিকে ঘুরানো হয়। নিষ্কাশিত রস ডিশে পড়তে থাকে এবং সংগৃহীত হয়। যন্ত্রকে রোজিং মেশিনও বলা হয়ে থাকে। পাতিলেবু, কমলালেবু, মাল্টা ও মুসাম্বির রস এ যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্কাশন করা যায়। ঘরোয়া পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য এ যন্ত্রে একটি সরল সংস্করণ বর্তমানে বিশেষ প্রচলিত। তবে এটিকে যন্ত্র না বলে রস নিষ্কাশন পাত্র বলাই সমীচীন। কাচ বা পলিথিনের এ পাত্রে ডিশের উপর কুঁড়ি দৃঢ়-সংলগ্ন অর্থাৎ ঘূর্ণনশীল নয়। এক্ষেত্রে রস নিষ্কাশনের জন্য কুঁড়ির মাথায় কর্তিত ফলের অংশ বসিয়ে হাতের চাপেই টুকরাটিকে ঘুরিয়ে ঘষা হয়।

২০২০

১৫. মিক্স মাস্টার : কাপ বা জগ আকৃতির এ যন্ত্রে পাতিলেবু ছাড়াও অধিকাংশ ফলের রস নিষ্কাশন করা যায়। এটি বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র। এ যন্ত্রকে ব্লেন্ডারও বলা হয়। মশলা গুঁড়ানো বা মণ্ডে পরিণত করার জন্যও এ যন্ত্রবিশেষ উপযোগী। ফলের রস নিষ্কাশনের জন্য কাচ বা প্লাস্টিকের বড় আকৃতির কাপ বা জগ সংযুক্ত করতে হয়। কিন্তু মসলা গুঁড়া করার ছোট আকৃতির কাপ সংযুক্ত করতে হয়। একে গ্রাইন্ডিং মেশিন বলে। রস নিষ্কাশনের জন্য ব্লেন্ডারে বিচিমুক্ত ফল বা সবজির টুকরা নেওয়া হয়।

১৬. ক্রাশার : এ যন্ত্রে সূক্ষ্ম ব্যবধানে অবস্থিত পাশাপাশি পরস্পর বিপরীতমুখী ঘূর্ণায়মান দুটি কাঠের রোলার এর মাধ্যমে ফল বা সবজির টুকরাকে প্রায় ৫০ সে.মি. টুকরায় ভাঙ্গা হয়। পেয়ারা, আঙ্গুর, আপেল, আনারস ইত্যাদি এ যন্ত্র দ্বারা প্রয়োজনবোধে ভাঙ্গা বা ক্রাশ করা যায়।

১৭. মিনসার : এ যন্ত্র দ্বারা ধারালো ঘূর্ণায়মান ব্লেডের সাহায্যে ফল ও সবজিকে অতি সূক্ষ্ম টুকরায় কেটে মসৃণ মণ্ডে বা শাঁসে পরিণত করা যায়। এটি বিদ্যুৎচালিত হয়।

১৮. পাল্পার : এ যন্ত্র দ্বারা প্রধানত পাকা টমেটো ও পাকা আমের রস বা শাঁস অতি দ্রুত সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য সুবিধা অনুযায়ী অন্যান্য ফলের শাঁসও এ যন্ত্রের সাহায্যে আহরন করা যায় সাধারণত অল্প পরিমাণ পাল্পের বা রসের জন্য ব্লেন্ডার এবং বেশি পরিমাণে পাল্পের বা রসে জন্য পাল্পার ব্যবহার হয়। বড় বড় ফ্যাক্টরিতে হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহৃত হয়। এটি বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র।

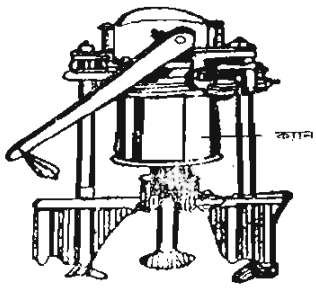


চিত্র ঃ ক্যান সিলার

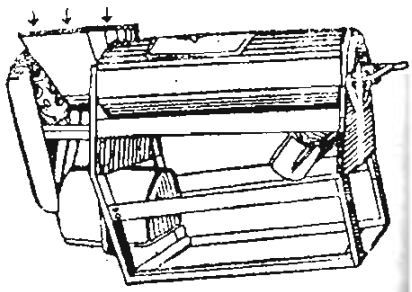

চিত্র ঃ পালপার

১৯. স্ট্রেইনার ও স্পাইসার : প্রয়োজমতো বিভিন্ন ফলের রস, মণ্ড ইত্যাদি ছাঁকার জন্য স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ছাঁকনি ব্যবহার করা হয়। সূক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত মোটা শাঁসের জন্য যথাক্রমে ১ মি.মি. ও ২ মি.মি. ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্লাইসার কাঠের তৈরি এর ভিতরে স্টীলের ব্লেড লাগানো থাকে। সবজি ও মসলা যেমন- আলু ও পেঁয়াজ হাত দিয়ে স্লাইসারের উপর ঘষলে নিচ দিয়ে স্লাইসগুলো বের হয়ে আসে।

২০. কাঠের বাক্স ও সিমেন্ট হাউজ : কাঁচা আম, অন্যান্য কাঁচা ফল বা সবজি লবণে সংরক্ষণের জন্য পাত্র হিসেবে কাঠের বাক্স ও সিমেন্ট হাউজের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী।

২১. গ্লাস কারবয় : ১০-৩০ লিটার আয়তনের সরু মুখ কাচের পাত্র বা গ্লাস কারবয় ফলের রস, মণ্ড ও নির্যাস সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২২. জেল থার্মোমিটার : জ্যাম ও জেলি প্রস্তুত করার সময় তাদের যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত ফোটানো হয় তাকে End Point বা সমাপ্তি স্ফুটনাঙ্ক বলে। যে থার্মোমিটারের সাহায্যে এ স্ফুটনাঙ্ক মাপা হয় তাকে জেল থার্মোমিটার বলে। জেল থার্মোমিটার ০০ - ১০০$^0$ C অথবা ০$^0$ - ২৮০$^0$ F পাঠ দাগাঙ্কিত থাকে।

২০২০

২৩. জেলমিটার : এটি একটি উভয় মুখ খোলা কাচের নল। অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাসের উপরাংশে পাঠরেখা অংকিত থাকে। এর সাহায্যে ফলের পেকটিন নির্যাসে পেকটিনের গুণানুসারে মান নিরূপণ করা হয়। নলের ভিতর পেকটিন নির্যাসের প্রবাহের হার অনুযায়ী এই মান নিরূপিত হয়ে থাকে।

২৪. ব্রিক্স হাইড্রোমিটার : এর সাহায্যে সিরাপ, স্কোয়াশ প্রভৃতি পানীয় দ্রব্যে চিনির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এটি থার্মোমিটারের ন্যায় উভয় মুখ বন্ধ পাঠরেখাঙ্কিত কাচের নল। নিচের দিকে থাকে ভারী ভালভ। এটি উপরে উল্লিখিত দ্রবণে খাড়াভাবে ভাসতে থাকে। দ্রবণের উপরিতল যে পাঠরেখা স্পর্শ করে তা উক্ত দ্রবণে চিনি শতকরা পরিমাণ নির্দেশ করে যা ব্রিক্স এককে উল্লেখ করা হয়। ব্রিক্স বা ঘনাঙ্ক বলতে প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য যথা- ফলের রস, সিরাপ, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি প্রভৃতিতে বিভিন্ন দ্রবীভূত পদার্থের মোট পরিমাণ বা টোটাল সলুবল সলিডস যে এককের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে বুঝায়। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিষ্টি ফলের রস বা চিনি প্রধান ফলজাত দ্রব্যে ব্রিক্স বলতে প্রধানত চিনির শতকরা পরিমাণকেই বুঝায়। এক একটি হাইড্রোমিটারে নির্দিষ্ট ঘনাঙ্ক বা ব্রিক্স পর্যায়ে পাঠ রেখা অঙ্কিত থাকে। যেমন $০^0$ - $৩০^0$ ব্রিক্স, $৩১^0$ - $৬০^0$ ব্রিক্স। $৩০^0$ এর পরিবর্তে $১০^0$ ঘনাঙ্ক পর্যায়েরও হাইড্রোমিটার পাওয়া যায়।

২৫. রিফ্রাক্টোমিটার : এ যন্ত্রের সাহায্যেও ফলের রস, সিরাপ স্কোয়াশ প্রভৃতিতে চিনির শতকরা পরিমাণ বা ব্রিক্স নির্ণয় করা হয়। এ যন্ত্রের এক প্রান্তে চোখ লাগিয়ে দেখার জন্য একটি আইপিস বা লেন্স থাকে। এ লেন্স দিয়ে যন্ত্রের ভিতরে দেখলে একটি রেখাঙ্কিত স্কেল দেখা যায়। রিফ্রাক্টোমিটারের অপর প্রান্তে একটি ঢাকনাযুক্ত কাচের নমুনা প্লেট থাকে। এ প্লেটের উপর এক ফোটা ফলের রস রেখে ঢাকনা চেপে দিয়ে দেখলে উক্ত ফলের রসের ব্রিক্স এর মান স্কেল রিডিং হতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্রিক্স হাইড্রোমিটারের মতো এটিকে রসের দ্রবণে ভাসানোর প্রয়োজন হয় না। যন্ত্রের ভিতর যে স্কেলটি দেখা যায় তাতে $০^0$ থেকে $১০০^0$ ব্রিক্স পর্যন্ত কাটা দাগ থাকে। স্কেলের রং থাকে হালকা হলুদ বা নীলাভ।

২৬. স্যালোমিটার : লবণ জারাণো দ্রবণের লবণের পরিমাণ পরিমাপের জন্য স্যালোমিটার ব্যবহার করা হয়। ফল ও সবজি লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করার জন্য লবণের দ্রবণের ঘনত্ব নির্ণয়ে এ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রে $০^0$-$১০^0$ পাঠ রেখাাঙ্কিত থাকে। যন্ত্রটি যদি পুরোপুরি সম্পৃক্ত লবণের দ্রবণে ডুবানো হয় তাহলে $১০০^0$ স্কেল প্রদর্শন করে। কিন্তু বিশুদ্ধ লবণহীন দ্রবণে ডুবালে $০^0$ দেখায়। সাধারণ তাপমাত্রায়, পানিতে শতকরা ২৫ ভাগ লবণের দ্রবণ সম্পৃক্ত পর্যায়ে অর্থাৎ $১০০^0$ তে পৌঁছায় বলে স্যালোমিটারের প্রতি ৪টি ঘরের পাঠ লবণের ১% ঘনত্ব বুঝায়। অর্থাৎ কোনো লবণ দ্রবণে এই যন্ত্রটি ডুবালে যদি ৮০ মাত্রা দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে ঐ দ্রবণে লবণের পরিমাণ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ।

২৭. পিলফারপ্রুফ ক্যাপ সিলিং মেশিন : এ যন্ত্রের সাহায্যে প্যাঁচ মুখ বোতলের ঢাকনা এরূপ বায়ুরুদ্ধভাবে বন্ধ করা যায় যে ঢাকনার সর্বনিম্ন গোলাকার অংশ না কেটে তা খোলা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ছিপিকে সংক্ষেপে পি.পি. ক্যাপ বলে।

২৮. ক্রাউন কর্কিং মেশিন : এ যন্ত্র দ্বারা প্যাঁচবিহীন টুপির মতো ঢাকনা বোতলের মুখে চাপ প্রয়োগ দ্বারা বায়ুরুদ্ধভাবে লাগানো হয়। কোকা-কোলা জাতীয় পানীয় এবং সোডা ওয়াটারের বোতলের ঢাকনা প্রধানত এভাবে বন্ধ করা হয়ে থাকে।

২৯. কয়লা চুলা, স্টোভ, গ্যাস ও স্টিম কেটল : সুবিধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ সকল চুল্লি বা অন্যান্য যন্ত্র উত্তাপ উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩০. ক্যান সিলার বা সিমার : এ যন্ত্রের সাহায্যে টিন বা ক্যানের ঢাকনা বায়ুরুদ্ধভাবে বন্ধ করা যায়। একে ক্যান সিমিং যন্ত্রও বলা হয়।

৩১. ব্যাগ সিলার : অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল ও পলিথিন ব্যাগ এ যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজে বায়ুরুদ্ধভাবে বন্ধ করা যায়। এটি বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রে।

৩২. বোতল ও ক্যান : ফল ও সবজিজাত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলোকে বিভিন্ন ধরনের বোতল বা ক্যানে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। স্কোয়াস, কার্ডিয়াল, সিরাপ ইত্যাদি পানীয় প্রধানত সরুমুখ লম্বা বোতলে সস, কেচাপ ইত্যাদি দ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম আয়তনের অনুরূপ বোতলে এবং জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনি, মোরব্বা ইত্যাদি চওড়া মুখওয়ালা বোতলে সংরক্ষণ করা হয়। ফলের টুকরা সিরাপে ও সবজির টুকরা ব্রাইন দ্রবণে সংরক্ষণের জন্য টিনজাত করা হয়। অবশ্য জ্যাম, জেলি, মারমালেড অনেক সময় ক্যান বা টিনে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

৩৩. ভ্যাকুয়াম গেজ : এটি একটি বায়ুশূন্যতা মাপক যন্ত্র। এর সাহায্যে টিন বা ক্যানের ভিতরের বায়ুশূন্যতার মান নিরূপণ করা যায়। এজন্য একে ক্যান ভ্যাকুয়াম টেস্টিং গেজও বলে।

৩৪. নাইলন মশারির কাপড় : এই কাপড় দ্বারা রস, শাঁস বা মন্ড ছাঁকা হয়ে থাকে। এর এক প্রান্তে শক্ত কোনো কিছুর সাথে দৃঢ়ভাবে বাঁধা হয়। অপর প্রান্ত বা হাতে টেনে ধরে ডান হাতে চেলে ফলের রস, শাঁস বা মণ্ড ছাঁকা হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির গাঠনিক উপাদান নির্বাচন :

১. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতিতে কোন কাঠ ব্যবহার করা যাবে না কারণ কাঠ খাদ্যকে দূষিত করে।

২. কাটিং বোর্ড কাঠের না হয়ে প্লাস্টিকের হতে হবে।

৩. লোহা ও ঢালাই লোহা খুব উপযোগী নয় কারণ এতে মরিচা পড়ে।

৪. গ্যালভানাইজড করা লোহাও ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ এর জিংক বা দস্তা খাদ্য দূষিত করে।

৫. কপারের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এটা ভিটামিন সি ধ্বংস ও চর্বিকে জারিত করে ফেলে।

৬. খাদ্যের সান্নিধ্যে আসে এমন যন্ত্রপাতি মেশিনারি তৈরিতে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে স্টেইনলেস স্টিল। এটি খুব ভালোভাবে ফিনিশিং করা যায় সহজে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায়। বেশির ভাগ খাদ্য উপাদান দ্বারা এটি প্রভাবিত হয় না। তবে এটা তাপ সুপরিবাহী নহে এবং যেক্ষেত্রে লবণ দ্রবণ এর সান্নিধ্যে আসে সেক্ষেত্রে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরি স্টেনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয়।

৭. অ্যালুমিনিয়াম তাপ সুপরিবাহী এবং ক্ষার ও ফলের এসিড দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ জন্য বিশেষ ধরনের অ্যালুমিনিয়াম বা এনোডাইডজড অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয় যা ক্ষয় ও মরিচারোধী।

৮. বেল্ট যার উপর দিয়ে খাদ্য স্থানান্তরিত হয় তা অবশ্যই পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. পাইপ এমন ডিজাইনের হবে যাতে ভিতরের দিকে কোনো অমসৃণ সংযোগ বিন্দু থাকবে না, কারণ এতে খাদ্যসামগ্রী জমা হতে পারে। পাইপ কাচের হলে সবচেয়ে ভাল।

১০. পাইপ যেন খোলা ও পরিষ্কার করা যায়।

## ২.৬ প্রক্রিয়াজাতকরণে রং ও ফ্লেভারের ভূমিকা

কৃত্রিম রং :

এ জাতীয় রং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়। এর প্রাচুর্য এবং সহজ প্রাপ্যতার কারণে খাদ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচের সারণিতে কৃত্রিম রঙের একটি তালিকা দেয়া হলো-

সারণি : কৃত্রিম রঙের তালিকা

| ক্রমিক নং | রং | সাধারণ নাম |
|---|---|---|
| ১। | লাল | ক) কারময়সিন<br>খ) ফাস্ট রেড<br>গ)এ্যামান্থ<br>ঘ) ইরিথ্রোসিন |
| ২। | হলুদ | ক) টারটারজিন<br>খ) সানসেট ইয়োলো |
| ৩। | নীল | ক) ইনডিগো কারমাইন<br>খ) ব্রিলিয়েন্ট ব্লু |
| ৪। | সবুজ | ক) গ্রীন, এস, ফাস্ট<br>খ) গ্রীন, এফসিএফ |

উৎস : খাদ্য সংরক্ষণ -মোঃ আবু আব্দুল্লাহ

এই রংগুলোকে কোলটার রং বলে। এদের সমন্বয়ে আরও বিভিন্ন ধরনের মিশ্রি রং যেমন-কমলা, বেগুনি ইত্যাদি তৈরি করা হয়ে। খাদ্যদ্রব্যে এগুলোর ব্যবহার কোনো ক্রমেই কেজিপ্রতি ০.২ গ্রামের অধিক হবে না। এর চেয়ে বেশি ব্যবহার করা আইনত অপরাধ।

ফ্লেভার বা খাবার গন্ধ :

এগ্রোবেসড জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতির সময় উৎপন্ন দ্রব্যের স্বাদ এবং গন্ধ বা ঘ্রাণ আকর্ষণীয় করার জন্য যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে ফ্লেভারিং পদার্থ বলে। যেমন- বিভিন্ন ধরনের মসলা, এসেনসিয়াল অয়েল ও প্রাকৃতিক গাছগাছড়ার নির্যাস ছাড়াও বহু ধরনের কৃত্রিম সুগন্ধি দ্রব্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর রাসায়নিক গঠন জটিল। তরল পানীয়, কনফেকশনারি দ্রব্য, আইসক্রিম, চকোলেট, ক্যান্ডি, বিস্কুটের ক্ষেত্রে কৃত্রিম ফ্লেভারও ব্যবহার করা হয়। ফ্লেভার সাধারণত কেজিপ্রতি ৩০০ মি.লি গ্রামের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। লেবু, আনারস, কমলা, আপেল, আম, কলা, গোলাপ, ভ্যানিলা. স্ট্রবেরি ইত্যাদি ফ্লেভারও এগ্রোবেসড শিল্পে ব্যবহৃত করা হয়।

ফ্লেভার এনহেন্সার :

কিছু কিছু পদার্থ আছে যেগুলোর নিজস্ব কোনো গন্ধ বা এসেন্স নেই। কিন্তু গুলোর উপস্থিতি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ফ্লেভার উন্নত বা বর্ধিত করতে পারে। যেমন- মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। এটি মাংস, সামুদ্রিক খাবার ও শাক সবজির বর্ধিত করে। চাইনিজ খাবারে টেস্টিং সল্ট নামে এই মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট এবং সয়াসস ব্যবহার করা হয়। ম্যালটোল নামক ফ্লেভার এনহেন্সার চিনির মিষ্টতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি চকোলেট, আইসক্রিম, কফি, চা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

## প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ফ্লেভারের সুবিধা ও অসুবিধা

### প্রাকৃতিক ফ্লেভারের সুবিধা

১। এটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়।
২। এটি ক্ষতিকারক নয়।
৩। এটি আইনত বৈধ।

### প্রাকৃতিক ফ্লেভারের অসুবিধা

১। এর গন্ধের তীব্রতা কম থাকায় ঘন করলে পরিমাণে কম হয়ে যায় এবং দাম পড়ে বেশি।
২। প্রসেসিং-এর সময় গন্ধের পরিবর্তন হয়।
৩। সৃষ্টির সময় প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে।

### কৃত্রিম ফ্লেভারের সুবিধা

১। দামে সস্তা ও বহুলাংশে স্থিতিশীল।
২। স্থায়ী ও অনেক দিন ভালো থাকে।
৩। প্রসেসিং অবস্থার উপযোগী করে তৈরি করা হয়।
৪। অতিমাত্রায় ঘন।
৫। যে কোনো অবস্থায় এটি ব্যবহার করা যায়।
৬। সহজলভ্য।
৭। ঋতুভিত্তিক স্বতন্ত্রতা।
৮। মান এবং গন্ধ উৎপাদনের স্থিরতা।

### অসুবিধা

১। সব সময় গ্রহণযোগ্য হয় না।
২। গন্ধ চিহ্নিত করা কঠিন।
৩। শক্তিশালী গন্ধযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত বিধায় শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

## সংরক্ষিত ফল ও সবজিতে সমস্যা ও প্রতিকার

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করার পর বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যে সকল কারণে সংরক্ষিত ফল ও সবজিতে সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ :

১। ফল ও সবজি সঠিক নির্বাচন।
২। ফল ও সবজিতে সঠিত মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার।
৩। প্রক্রিয়াজাতকরণের নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলা।
৪। প্রক্রিয়াজাতকরণের তৈজসপত্র জীবাণুমুক্তকরণ।
৫। প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষ কর্মী।

সংরক্ষণের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো যদি সঠিকভাবে না করা যায় তবে সংরক্ষিত খাদ্যে ভুলত্রুটি বা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

## অনুশীলনী-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জীবাণু থেকে ফল ও সবজিকে দূরে সরিয়ে সংরক্ষণ করাকে কী বলে?
২। সংরক্ষণ কাকে বলে।
৩। সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য কী কী?
৪। প্রক্রিয়াজাতকরণ কাকে বলে?
৫। প্রক্রিয়াজাতকরণের বৈশিষ্ট্য কী কী?
৬। আমের উল্লেখযোগ্য উৎপাদন অঞ্চল কোথায়? এবং এর প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কী কী?
৭। আলুর উল্লেখযোগ্য উৎপাদন এলাকা কোথায়?
৮। ফল ও সবজির জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া কী কী?
৯। কোন নীতির উপর ভিত্তি করে হিমায়ন সংরক্ষণ প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে?
১০। ফল ও সবজির পারিপার্শ্বিক আর্দ্রতা বাড়িয়ে সংরক্ষণ করার যন্ত্রের নাম কী?
১১। ফল ও সবজিতে শ্বসন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গ্যাসের নাম কী?
১২। বায়ুমণ্ডলে $O_2$ এবং $CO_2$ এর শতকরা পরিমাপ কত?
১৩। ব্লাঞ্চিং প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
১৪। কী কী পদ্ধতিতে ফল ও সবজিকে জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা যার?
১৫। H.T.S.T বলতে কি বোঝায়?
১৬। পাস্তুরাইজেশন কাকে বলে?
১৭। স্টেরিলাইজেশন এবং পাস্তুরাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য কী?
১৮। K.M.S. কী?
১৯। কোন দেশ হতে ফল ও সবজির প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়।
২০। আমাদের দেশের ফলও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলো কী কী?
২১। এগ্রোবেসড শিল্পে সাধারণত কিসের তৈরি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার হয়?
২২। খাদ্য উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি ছুরির নাম লিখ?
২৩। কোরার ও পাঞ্চার বলতে কী বোঝায়?
২৪। বাস্কেট প্রেস দিয়ে কী করা যায়?
২৫। মিক্স মাস্টার কী?
২৬। মিনসার ও পালপার কি কাজে ব্যবহার হয়?
২৭। গ্লাস কার বয় দেখতে কেমন?
২৮। জেল মিটার ও রিফ্রাক্টোমিটার দিয়ে কি করা যায়?
২৯। পিলফারপ্রুফ ক্যাপ সিলিং মেশিন দিয়ে কী করা হয়?
৩০। অ্যালাডাইজড অ্যালুমিনিয়াম কেস ব্যবহার হয়?
৩১। কয়েকটি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রঙের নাম লিখ।
৩২। খাদ্য দ্রব্যে খাবার রং কতটুকু দেয়া আইনত অপরাধ।
৩৩। ফ্লেডার ও ফ্লেভার এনহেন্সার কী?
৩৪। খাবারে কী পরিমাণ ফ্লেভার ফেলা অনুচিত?
৩৫। মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট ও সয়াসস দিয়ে কী করা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

২। সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লেখ।

৩। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভাবনা বর্ণনা কর।

৪। সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মূলনীতিগুলোর নাম লেখ।

৫। তাপমাত্রা কমিয়ে এবং আর্দ্রতা বাড়িয়ে কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়?

৬। তাপ প্রয়োগে কীভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় লেখ।

৭। কী কী রাসায়নিক দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহার হয়।

৮। প্রক্রিয়াজাতকরণের ছকটি লেখ।

৯। ফল ও সবজি থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যগুলোর নাম লেখ?

১০। গার্হস্থ্য পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানে যে সকল প্রতিষ্ঠান জড়িত তাদের নাম লেখ।

১২। খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পে ব্যবহৃত ১০টি যন্ত্রের নাম লেখ।

১৩। রোজ টাইপ জুস এক্সট্রাক্টর এর কাজ বর্ণনা কর।

১৪। রিফ্রাক্টোমিটার দিয়ে কিভাবে চিনির পরিমাপ করা হয়?

১৫। কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক ফ্লেভারের সুবিধা অসুবিধা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে ফল ও সবজির গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা সম্ভাবনা আলোচনা কর।

২। ফল ও সবজি সংরক্ষণের মূলনীতিগুলো কী কী? বর্ণনা কর।

৩। প্রক্রিয়াজাতকরণের মূলনীতির ছক লেখ এবং তা বর্ণনা কর।

৪। বাণিজ্যিক ও গার্হস্থ্য পর্যায়ে ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় আলোচনা কর।

৫। প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ ১০টি যন্ত্রপাতির নাম ও কাজ বর্ণনা কর।

৬। প্রাকৃতিক রং, ফ্লেভার ও ফ্লেভার এনহেন্সার কী? এগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

## অধ্যায়-৩
# ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

ফল ও সবজিকে প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়। এ সকল খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ, আকৃতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতিও বিভিন্ন হয়ে থাকে। আমরা যে সকল প্রক্রিয়াজাত খাবার পেয়ে থাকি তা নিম্নের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে থাকে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো –

১. শুষ্ককরণ ও ফ্রিজিং পদ্ধতি
২. চিনির সিরা ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ পদ্ধতি
৩. পানীয় হিসাবে ফলের রস সংরক্ষণ
৪. জ্যাম, জেলি ও মার্মালেড
৫. মোরব্বা ও ক্যান্ডি
৬. আচার ও চাটনি
৭. টিনজাত করণ
৮. ভিনেগারে সংরক্ষণ

### ৩.১ সংরক্ষণে ব্যবহার্য চিনির সিরা ও লবণের দ্রবণ প্রস্তুত প্রণালি

সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় চিনির সিরা ও লবণের দ্রবণের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। আম বা চালকুমড়ার মোরব্বা বানানোর সময় আমরা দেখি যে, ফলের টুকরাগুলোতে অসংখ্য ছিদ্র করে পানি ঝরিয়ে চিনির সিরায় ডুবিয়ে রাখা হয়। প্রয়োজনে সেই সিরায় আরও অতিরিক্ত চিনি যোগ করা হয়। অপরদিকে আনারসের টুকরার গায়ে লবণ মাখালে প্রচুর পানি বের হতে দেখা যায়।

পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি মাধ্যমে (আম ও চিনির সিরা অথবা আনারসের টুকরা ও লবণ) দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণের তারতম্য থাকার জন্য উভয় দিক থেকে পানি ও দ্রব্যের বিপরীতমুখী গমনাগমন ঘটতে থাকে একে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বলে। অভিস্রবণের সময় পানি বা দ্রাবক পাতলা দ্রবণ হতে গাঢ় দ্রবণের দিকে ধাবিত হয়। এ জন্যই সিরা থেকে চিনি আমের কোষ কলায় প্রবেশ করে এবং বিপরীতে আম থেকে পানি বাইরে বেরিয়ে এসে চিনির সিরার ঘনত্ব হ্রাস করে। অনুরূপভাবে আনারসের টুকরার ভিতর লবণ প্রবেশ করে এবং ভিতর থেকে পানি বেরিয়ে এসে লবণের ঘনত্বকে হ্রাস করে। এভাবে উভয় মাধ্যমে সমতা বিরাজ করে।

ফল সংরক্ষণের জন্য লবণের দ্রবণ :

যেহেতু ফল মিষ্টি তাই চিনির সিরায় সংরক্ষণ করা হয়। লবণ ব্যবহারে ফল ও সবজিতে অবস্থিত জীবাণুর কোষ পানিশূন্য হয়ে যায় এবং এর কার্যক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রাইন দ্রবণ : দুই ভাগ লবণের জলীয় দ্রবণকে ব্রাইন দ্রবণ বলে। সবজি যাতে বাতাসের সংস্পর্শে এসে বিবর্ণ হয়ে না যায় সেজন্য ২% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। ১ লিটার পরিষ্কার পানিতে ২০ গ্রাম খাবার লবণ মিশিয়ে এই ব্রাইন দ্রবণ তৈরি করা যায়। সবজি জাত দ্রব্য ক্যানিং বা টিনজাতকরণ করতে

এ ব্রাইন দ্রবণ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া কাঁচা ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনমতো বিভিন্ন ঘনত্বের ব্রাইন দ্রবণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

## লবণ জারানো

আচার ও চটনি তৈরি করার জন্য অনেক সময় কাঁচা ফল ও সবজি পাতলা লবণ পানিতে ডুবিয়ে গরম করে নেয়া হয়। একেই লবণ জারানো বলে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে দুই ভাগ লবণ পানিতে ফল বা সবজি একদিন ডুবিয়ে রাখার পর প্রতিদিন লবণ মিশিয়ে ঐ দ্রবণের ঘনত্ব দুই ভাগ করে বাড়ানো হয়। এভাবে চার দিন পর লবণের ঘনত্ব ৮% বৃদ্ধি করা হয়। এখন এই দ্রবণ হতে ফল বা সবজি তুলে নিয়ে ৮% লবণ পানির একটি নতুন দ্রবণে রাখা হয়। এভাবে রাখলে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই ফল ও সবজি নরম হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক দিনই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে ফল ও সবজির টুকরা যেন প্রয়োজনের বেশি নরম না হয় এবং ছত্রাক না ধরে। উপযুক্ত নরম হলেই আচার বা চটনি তৈরি করতে হয়। ছত্রাক জন্মানোর লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি কেজি ফল বা সবজির জন্য ২০০ মি. গ্রা. পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট (KMS) অল্প পানিতে দ্রবীভূত করে ফলের উপর ছিটিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। স্যালোমিটার যন্ত্র দ্বারা ফল ও সবজির লবণাক্ততা পরিমাপ করা যায়।

## চিনির সিরা

চিনির সংরক্ষণ ধর্ম দ্রবণের ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। কোন খাদ্য দ্রব্যে চিনির পরিমাণ ৬৫% বা এর অধিক এবং অম্লের পরিমাণ ০.৬% এ উন্নীত করা যায় তবে তা দীর্ঘকালীন সংরক্ষণ যোগ্যতা লাভ করে। চিনির ঘন দ্রবণ ফল ও সবজির অণুজীবের কোষের অভ্যন্তরের জলীয় অংশ বের করে নিয়ে আসে। এভাবে অভিস্রবণের মাধ্যমে অণুজীবের জলীয় অংশ বের হয়ে অণুজীব মারা যায়। স্কোয়াশ, মোরব্বা, জ্যাম, জেলি প্রভৃতি দ্রব্য চিনি দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। চিনির সিরা তৈরিতে সমপরিমাণ চিনি ও সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল ফুটে উঠলে সামান্য দুধে পানি মিশিয়ে তা ফুটন্ত রসে ছিটিয়ে পাশ থেকে গাদ তুলে ফেলতে হয়। গাদ তোলা হয়ে গেলেই মৃদু জ্বাল দিয়ে অল্প নাড়াচাড়া করলেই এটি পাতলা আঠার মতো হবে। আবার জ্বালে রাখলে মোটা আঠার মতো এবং জ্বাল আরো ঘন হলে আঙুলে রোয়া রোয়া মনে হবে। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের সিরা তৈরি হয়। এই চিনির সিরা পানির সাথে মিশ্রিত করে দ্রবণের ঘনত্ব বাড়ানো কমানো হয়। এক্ষেত্রে একবারে সব চিনি ব্যবহার না করে ধীরে ধীরে চিনির পরিমাণ বাড়ানো হয় যাতে চিনির ঘনত্ব সমগ্র ফলের টুকরাতে সমানভাবে থাকে, তা না হলে স্বাদে গন্ধে, বর্ণের দিক দিয়ে খাদ্যদ্রব্য নিম্নমানের হয়। চিনির দ্রবণের ঘনত্ব বা টোটাল সলুবল সলিডস রিফ্রাক্টোমিটার যন্ত্র (চিত্র) দ্বারা পরিমাপ করা যায়।

চিত্র : রিফ্রাক্টোমিটার

### ৩.২ ফল ও সবজি টিনজাতকরণ

ফল ও সবজিকে জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার পাত্রের মধ্যে বায়ুশূন্য অবস্থায় লবণ বা চিনির দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। এরূপ ধাতব পাতের মধ্যে রেখে ফল বা সবজিকে সংরক্ষণ করাকে টিনজাতকরণ বা Canning বলে।

ক্যানিং হচ্ছে খাদ্য বা ফল ও সবজি সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সম্পূর্ণভাবে বায়ুরোধী করে সিল করা ধাতব পাত্রের মধ্যের খাদ্যে উচ্চতাপ প্রয়োগ করা হয়। যে কোনো ধরনের পচন বা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে খাদ্যকে রক্ষা করার জন্য এমন করা হয়। খাদ্য যদি সঠিকভাবে টিনজাত করা হয় তবে পাত্রের ঢাকনা না খুললে খাদ্য ২-৩ বছর ভালো থাকে। যেসব খাদ্যে টিনজাত করা হয় তা হলো বিভিন্ন ধরনের ফল ও সেগুলোর রস, শাকসবজি, মাছ ও মাংস। টিনজাত করার প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেয়া হলো–

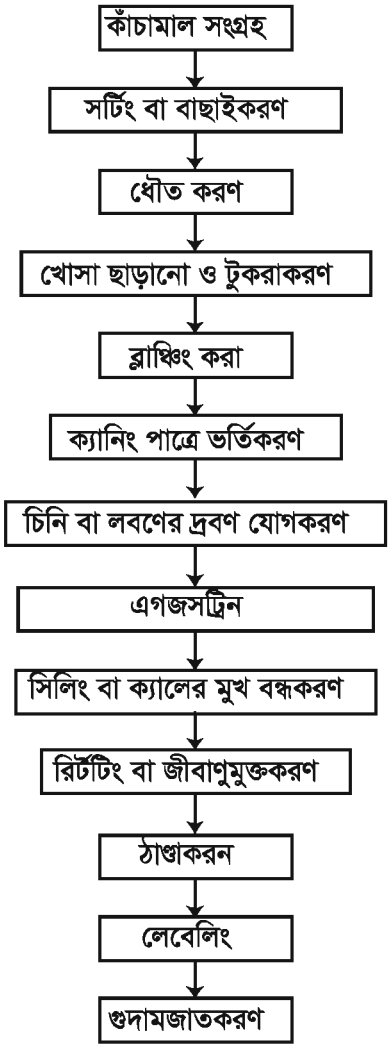


চিত্র : ক্যানিং বা বোতলজাতকরনের প্রবাহ চিত্র

২০২০

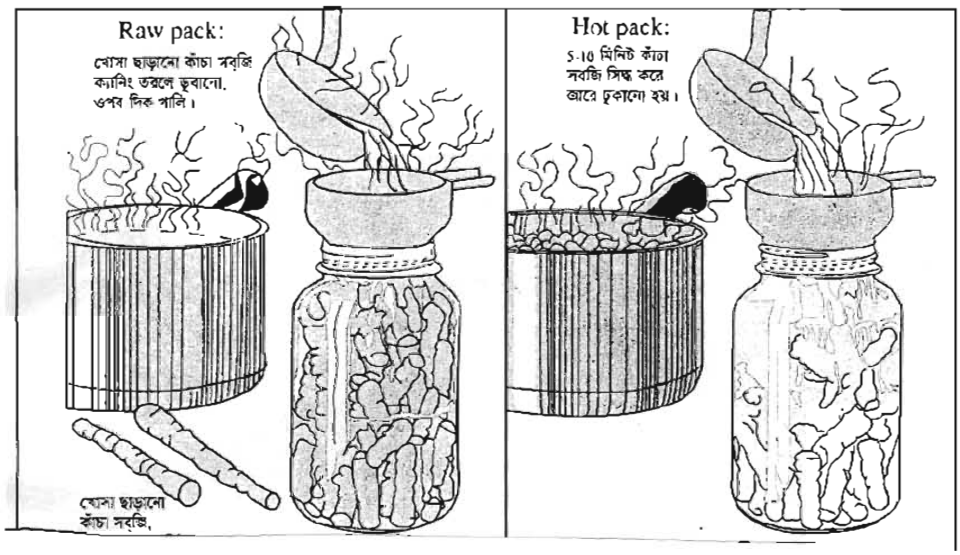


চিত্র : খোসা ছাড়ানো কাঁচা সবজি বা সিদ্ধ সবজিসহ কৌটা ভর্তিকরণ

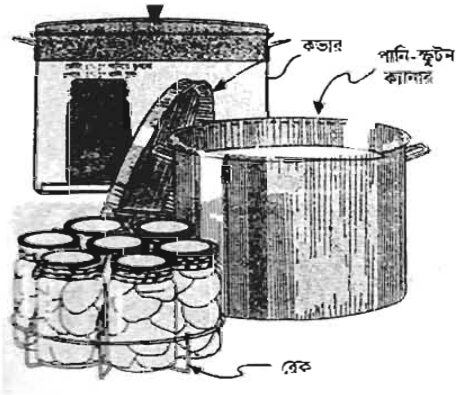


চিত্র : পানি-স্ফুটন পদ্ধতিতে খাদ্যভর্তি কৌটা উত্তপ্ত করে জীবাণুমুক্তকরণ

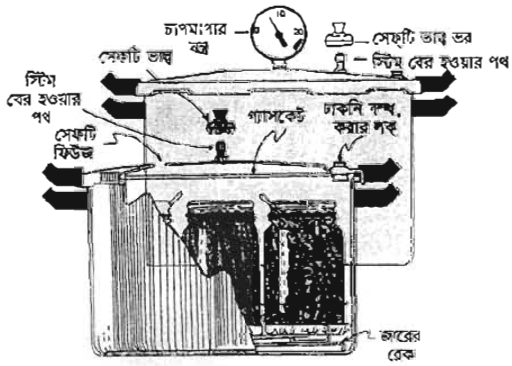


চিত্র : প্রেসার ক্যানিং বা চাপ কৌটাজাতকরণ

## ৩.৩ সংরক্ষিত ফল ও সবজিতে সমস্যা ও প্রতিকার

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করার পর বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যে সকল কারণে সংরক্ষিত ফল ও সবজিতে সমস্যা দেখা দেয় তা নিম্নরূপঃ

১। ফল ও সবজি সঠিক নির্বাচন

২। ফল ও সবজিতে সঠিক মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার।

৩। প্রক্রিয়াজাতকরণের নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলা।

৪। প্রক্রিয়াজাতকরণের তৈজসপত্র জীবাণুমুক্তকরণ।

৫। প্রক্রিয়াজাতকরণের দক্ষ কর্মী।

সংরক্ষণের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো যদি সঠিকভাবে না করা যায় তবে সংরক্ষিত খাদ্যে ভুলত্রুটি বা সমস্যা দেখা দিবে। কোনো প্রকার সমস্যাযুক্ত দূষিত খাদ্য সরকারি জনস্বাস্থ্য নীতি অনুসারে ব্যবহারকারী বা ভোক্তার নিকট বিক্রয় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অতএব এ সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত ফল ও সবজিতে যে সব সমস্যা সচরাচর অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা যায় সেগুলা নিম্নরূপঃ

ফলের রস তৈরিতে সমস্যাবলি :

(১) পাতিলেবু বা অন্যান্য লেবুর রস প্রক্রিয়াজাতকরণের কিছু দিন পর ধূসর রঙ ধারণ করতে পারে।
প্রতিকার : রসকে সূর্যালোকে রেখে এ সমস্যা থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়।

(২) অপরিষ্কার বোতলে রস সংরক্ষণ করা হলে যা সংরক্ষক (সাইট্রিক এসিড) কম মাত্রায় ব্যবহার করা হলে রস ফার্মেন্টেড বা গাঁজিয়ে উঠতে পারে।
প্রতিকার : জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার বোতল ব্যবহার এবং সঠিক মাত্রায় সংরক্ষক ব্যবহার করা।

(৩) সংরক্ষণের সময় রসের সহিত বেশি গরম সিরাপ মিশ্রিত করা হলে রস ছানা কাটার মতো হবে বা রস বসে যাবে।
প্রতিকার : সিরাপ ঠাণ্ডা বা সঠিক তাপমাত্রায় মিশ্রিত করতে হবে।

(৪) অনেক সময় সংরক্ষিত রসে চিনির তলানি পড়ে।
প্রতিকার : চিনির ঘনত্ব সিরাপে বেশি না হওয়া অথবা ফলের রসে অম্লত্ব সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করে এ সমস্যা দূর করা যায়।

জ্যাম, জেলি ও মারমালেড তৈরিতে সমস্যাঃ

(১) ছত্রাকের আক্রমণঃ সঠিক ঘনত্বে (৬৫%) জেলি তৈরি করার পর ও অনেক সময় ছত্রাকের আক্রমণ দেখা যায়। সংরক্ষণ পাত্রের প্যাকিং ও বায়ুরুদ্ধতা ঠিকমতো না করার কারণে এরূপ হতে পারে।
প্রতিকার : জেলি তৈরির পর বোতলে সংরক্ষণ করে উপরে এক স্তর গরম মোম তরলাবস্থায় ঢেলে দিতে হয়। তারপর বোতলের মুখ ঢেকে বায়ুরুদ্ধ করা হয়। এতে করে ছত্রাকের আক্রমণ হতে রেহাই পাওয়া যায়।

(২) কাচের জার ফেটে যাওয়া : কাচের জারে গরম জেলি ঢালার সাথে সাথে গরমে কাচের প্রসারণ ঘটে ফলে বোতল ফেটে যায়।
প্রতিকার : গরম জেলি ঢালার পূর্বে বোতল বা কাচের জারকে গরম করে নেওয়া উচিত।

(৩) জ্যাম বা জেলি সঠিক সেট না হওয়াঃ ঠিক মতো জ্বাল দেওয়ার পরও অনেক সময় জেলী সেট হয় না এর কারণ হচ্ছে -

(ক) যদি চিনির পরিমাণ বেশি হয় তবে জেলি সিরাপের মতো তরল হয়ে যায়।

খ) চিনি কম হলে এবং বেশি জ্বাল দিলে জেলী শক্ত হয়ে যায়।

গ) এসিড বেশি হয়ে গেলে জেলী ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া ধরনের হয়।
প্রতিকার : জেলীর বুনট নির্ভর করে পেকটিন, চিনি ও এসিডের উপর। এগুলোর পরিমাণের মাত্রা সঠিক হতে হবে এবং সঠিক তাপমাত্রা ও সঠিক সময় পর্যন্ত (স্ফুটনাঙ্ক) জ্বাল দিতে হবে।

(৪) জ্যাম ও মারমালেডে ফলের টুকরা ভেসে ওঠা : অনেক সময় জ্যামে ফলের টুকরা মিশ্রিত করা হয়। মারমালেডে ফলের খোসার কুঁচি মিশ্রিত থাকে। খুব উত্তপ্ত অবস্থায় এগুলো মিশ্রিত করা হলে উপরে ভেসে ওঠে।

৫। ভিনেগার ঘোলা হওয়া : আচার বা পিকলকে অনেক সময় ভিনেগারের দ্রবণে রাখা হয়। এতে করে আচারের সংরক্ষণ গুণ ও স্বাদ অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু জারানোর জন্য লবণের দ্রবণের ঘনত্ব কম বেশি হলে ভিনেগার ঘোলা হয়ে যায়।

প্রতিকার : ক) সঠিক পরিমাণ লবণ ব্যবহার করা
খ) জারানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর ভিনেগার প্রয়োগ
গ) উপযুক্ত গুণ ও মান সম্পূর্ণ ভিনেগার প্রয়োগ।

কেচাপের বিভিন্ন সমস্যা :

কেচাপে নানা রকম সমস্যা দেখা যায়। তার মধ্যে দুটো সমস্যা প্রধান। যেমন-

১। দলা বাঁধা : অনেক সময় কেচাপ সুন্দরভাবে তৈরি হলেও পরে তা দলা বেঁধে যায়। কেচাপ তৈরির সময় যদি টমেটোর সূক্ষ্ম আঁশ থেকে যায় তবে এরূপ হয়।
প্রতিকার : কেচাপ তৈরির শেষ পর্যায় মিহি ছাঁকনি দ্বারা ছেঁকে নিলে এ সমস্যা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। কালো দাগ পড়া : অনেক সময় কেচাপের বোতলের ছিপির নিচে বোতলের গলার কাছে কালো দাগ পড়ে। তৈরির সময় যদি লোহার সংস্পর্শে আসে তবে কেচাপে এ সমস্যা দেখা যায়। একে ব্ল্যাক নেক বলে।
প্রতিকার : লোহার তৈরি তৈজসপত্র ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

ক্যানে সংরক্ষণের সমস্যা

টিনের ক্যানে বা কাচের জারে ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল খাদ্যে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা যায়। ক্যান খোলার পর তা বুঝা যায়। টিনের ক্যানে যে সমস্যা দেখা যায় তা নিম্নরূপ-

১। ক্যান ফুলে যাওয়া : অনেক সময় ক্যান একদিকে বা দুই দিকে ফুলে যায়। জীবাণুজনিত কারণে অনেক সময় ক্যানের ভিতর $CO_2$ ও $O_2$ গ্যাস সৃষ্টি হয়ে ক্যান ফুলে ওঠে।
প্রতিকার : ক্যান প্রক্রিয়াজাতকরণের নিয়ম সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

২। কাল দাগ : ক্যানের মধ্যে মাঝে মাঝে খাদ্যদ্রব্যে কাল দাগ পড়ে। চিনির সিরা ও ক্যানের ধাতুর বিক্রিয়ার ফলে এরূপ হয়।
প্রতিকার : এনামেলের আস্তর দেওয়া ক্যান বা পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

৩। ব্যাকটেরিয়া : ব্যাকটেরিয়া ক্যানের খাদ্যদ্রব্য আক্রমণ করে স্বাদ, রস, আকৃতি, অবয়ব নষ্ট করে। ফলে খাদ্য টক হয়ে যায়।
প্রতিকার : প্রক্রিয়াজাতকরণের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে মানতে হবে।

কাচের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণ সমস্যা

১। কাচের জার উচ্চ তাপমাত্রায় ফেটে যায়।
প্রতিকার : কাচের পাত্র গরম করে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

২। বোতলের ছিপির ভিতর দিয়ে পানি বা বাতাস প্রবেশ।
প্রতিকার : বোতলের মুখে বায়ুরোধী সিল ব্যবহার করতে হবে।

৩। পরিবহন ও বিতরণের সময় কাচ পাত্র বিনষ্ট হওয়া।
প্রতিকার : পরিবহনের সময় প্যাডযুক্ত কাঠের বা হার্ডবোর্ডের প্যাকিং বাক্স ব্যবহার করে এ সমস্যা দূর করা যায়।

## ৩.৪ ভিনেগারে সংরক্ষণ

বিশুদ্ধ এসিটিক এসিড বা ইথানয়ক এসিডের ($CH_3COOH$) ৪% - ৬% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে। ১২% - ২৫% ঘনত্বের ইথানল বা ইথাইল অ্যালকোহল ব্যাকটেরিয়াম এ্যাসিটি নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জারিত করে লঘু ঘনত্বের ৪% - ৬% এসিটিক এসিড বা ভিনেগার প্রস্তুত করা হয়। কেচাপ, সস, চাটনি, আচার, সালাদ তৈরিতে ভিনেগার মিশ্রণে খাদ্যের স্বাদ বেড়ে যায়, খাদ্য নরম হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। ভিনেগারকে সিরকাও বলে।

### আদর্শ ভিনেগারের বৈশিষ্ট্য

১। ভিনেগারে সাধারণত ৪ - ১০ এসিটিক এসিড থাকবে।
২। অন্যান্য এসিড, রঙিন দ্রব্য, খনিজ লবণ ও সিসা, তামা ও ক্যারামেল ছাড়া অন্য কোনো রঙ থাকবে না।
৩। এতে ক্ষতিকর মাত্রায় আর্সেনিক থাকবে না।

ভিনেগার দুইভাবে তৈরি করা যায়। যথা –
ক) ফার্মেন্টেড ভিনেগার ও
খ) কৃত্রিম ভিনেগার

### ফার্মেন্টেড ভিনেগার

ফল ও সবজির রস সংগ্রহ করে যে ভিনেগার তৈরি করা হয় তাকে ফার্মেন্টেড ভিনেগার বলে। দুটি পর্যায়ে ফল ও সবজির রস ফার্মেন্টেশন বা চোলাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিনেগারে রূপান্তরিত হয়। যথা-
ক) অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন ও
খ) এসিটিক ফার্মেন্টেশন

### অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফল ও সবজির রসের চিনি অ্যালকোহলে রূপান্তরিত হয় তাকে অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন বলে। এই প্রক্রিয়ার জন্য রসের সাথে ঈস্টের গুঁড়া মিশিয়ে দিতে হয়। ঈস্ট রসের চিনিতে বিশ্লেষিত করে অ্যালকোহল ও $CO_2$ গ্যাসে পরিণত করে। ঈস্ট মেশানোর ফলে প্রচুর ফেনা সৃষ্টি হলে পাত্রে ঢালতে হয়। ২-৩ সপ্তাহ পর ফেনা উৎপাদন বন্ধ হলে বুঝতে হবে সব চিনি ফার্মেন্টেশন হয়ে অ্যালকোহলে পরিণত হয়েছে। পরে তা ঢেকে রাখতে হয়।

**এসিটিক ফার্মেন্টেশন :**

উপরে প্রাপ্ত ঢেকে রাখা রসের সাথে কিছু মাদার ভিনেগার মিশাতে হয়। তারপর পাত্রের মুখ দুটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়ে আটকে দিতে হয়। যাতে করে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবেশ করতে পারে। বাতাসের সংস্পর্শে ফার্মেন্টেশন বৃদ্ধি পায়। পাত্রের অন্তর্গত তরল পদার্থের উপর ভিনেগার ব্যাকটেরিয়ার আস্তরণ সৃষ্টি হয়। ৮-১০ সপ্তাহ পরে এটি ভিনেগারে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর ৭১-৭৭$^0$ C তাপমাত্রার ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। অতপর স্বচ্ছ অংশ ছেঁকে নিয়ে ভিনেগার বাজারজাত করা হয়।

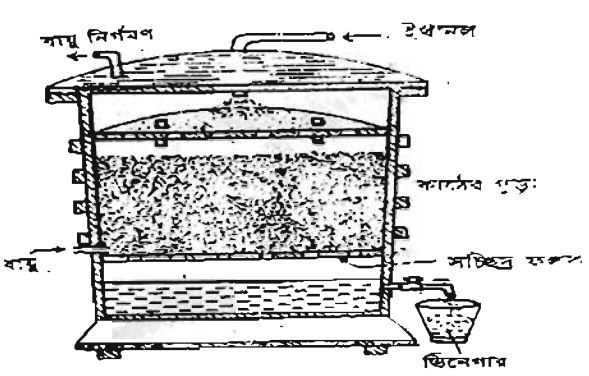


চিত্র: কুইক ভিনেগার তৈরি

**কুইক ভিনেগার :** ইথাইল অ্যালকোহলকে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে বায়ু দ্বারা জারিত করে ভিনেগারের শিল্প উৎপাদন করা হয় একে কুইক ভিনেগার বলে।

**গৃহজাত ভিনেগার**

এটি পরিত্যক্ত ফল হতে সহজেই তৈরি করা যায়। বিভিন্ন ফল যেমন- পেয়ারা, আম, আনারস, জাম, কলা, খেজুরের রস, কমলালেবু, আলু ইত্যাদির পরিত্যক্ত অংশ একটি কাচের বৈয়ামে ভরে পাতলা কাপড় দ্বারা ঢেকে কম তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে। ৩-৪ দিন পর উক্ত ফলের টুকরার রস ছেঁকে ফেনা ফেলে দিতে হবে। পরে ফেনা ওঠা বন্ধ হলে বোতলটি ৬ মাস রেখে দিতে হবে। বোতলের উপরের স্বচ্ছ ও বাদামি ভিনেগার জমে। সতর্কতার সহিত নিচের গাদ বা তলানী ফেলে উক্ত ভিনেগার সংগ্রহ করতে হবে।

**কৃত্রিম ভিনেগার**

বাজারে যে সকল ভিনেগারের বোতল পাওয়া যায় এগুলো সবই কৃত্রিম বা সিন্থেটিক। এগুলো ফল ও সবজি হতে তৈরি হয় না। এই ভিনেগার দুইরকম -সাদা ও লাল।

**ক) সাদা ও বর্ণহীন ভিনেগার :** এক লিটার বিশুদ্ধ পরিষ্কার পানি ভালো করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। বাজার হতে আনা ৫০-৬০ মি.লি. গ্লোসিয়াল এসিটিক এসিড মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে পরিষ্কার বোতলে ভর্তি করে মুখ এঁটে লেবেল দিতে হয়।

**খ) লাল ভিনেগার :** এক লিটার বিশুদ্ধ পরিষ্কার পানি ভালো করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে। তারপর ৫০ গ্রাম চিনি অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইয়ে ভেজে লাল রং করে নিতে হবে। কড়াই নামিয়ে তাতে বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পোড়া চিনি গুলে ছেঁকে নিতে হয়। চিনি পোড়া রঙকে ক্যারামেল ফুড কালার বলে। ঠাণ্ডা করা ১ লিটার পানির সাথে ৬০ মি.লি. বিশুদ্ধ এসিটিক ও লালচে পোড়া চিনির দ্রবণ মিশিয়ে বেশ ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। কেমিস্টের দোকান থেকে ১ বোতল গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড কিনে রাখলে বাড়িতে বসে কয়েক বছর যত ইচ্ছে ভিনেগার তৈরি ও ব্যবহার করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার ভিনেগার : বিভিন্ন ফলের চিনি থেকে তৈরি ভিনেগার নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। সাইডার ভিনেগার : আপেলের রস থেকে তৈরি হয়।

২। আঙ্গুরের ভিনেগার : আঙ্গুরের রস ফার্মেন্টেশন করে ভিনেগার তৈরি হয়।

৩। স্পিরিট ভিনেগার : তরল ইথাইল অ্যালকোহলকে জলীয় ফার্মেন্টেশন করে এই ভিনেগার তৈরি হয়।

৪। মল্ট ভিনেগার : অঙ্কুরিত বার্লি বা অন্য কোনো দানা শস্য হতে তৈরি করা হয়।

৩.৫ প্রক্রিয়াজাতকরণে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার :

ফল ও সবজির দ্রুত পাকার প্রক্রিয়া ও পচনক্রিয়া রোধ করার জন্য বেশ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংরক্ষিত ফল ও সবজির জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া যথা- শ্বসন, প্রস্বেদন ও পচন ক্রিয়াকে রোধ করা বা স্থিমিত রাখা। তবে স্বাস্থ্যহানির কারণে এ সকল রাসায়নিক পদার্থ যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা উচিত। এদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন ও নিয়মকানুন রয়েছে। যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজত কর্মকাণ্ডে সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) রাসায়নিক পদার্থ (জৈব অজৈব সংরক্ষক)

খ) খাবার রং বা ফুড কালার

গ) এসেন্স বা খাবার গন্ধ বা ফ্লেভার

রাসায়নিক পদার্থ : যে সকল রাসায়নিক পদার্থ প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্পে ব্যবহার হয় তা হচ্ছে-

ক) ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Ca(OH)_2$]

খ) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Na(OH)_2$]

গ) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড [$CaCl_2$]

গ) সিলিকা জেল

কাজ : সংরক্ষিত ফল ও সবজির শ্বসনের হার কমিয়ে রাখে।

২। ক) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ($KMNO_4$)

খ) ব্রোমিন দ্রবণ

গ) ২.৪-ডি

ঘ) সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ

ঙ) জিবারেলিক এসিড।

কাজ : ফল পাকার জন্য দায়ী নির্গত ইথাইলিন গ্যাস (হরমোন) শোষণ করে ফল ও সবজি সংরক্ষণকাল দীর্ঘ করে। অর্থাৎ ফল ও সবজি পাকার প্রক্রিয়া রোধ করে।

৩। প্যারাফিন ওয়াক্স: ফলের চতুর্দিকে মোম বা প্যারাফিনের প্রলেপ দিয়ে ফলের প্রস্বেদন ক্রিয়া কমিয়ে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা হয়।

৪। ক) ইথাইল ব্রোমাইড ও

খ) মিথাইল ব্রোমাইড

কাজ : এ রাসায়নিক পদার্থগুলো বিষবাষ্প হিসেবে ব্যবহার হয়। এগুলোর দ্বারা সংরক্ষিত ফল ও সবজিকে পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়।

৫। ম্যালিক হাইড্রাজাইড : এই রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সংরক্ষিত আলু ও পেঁয়াজের ভ্রূণ গজানো রহিত করা হয়।

৬। ক) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$)
খ) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ($CaNO_3$)

কাজ : ফলের ভিতর দাগ পড়া, শাঁস পচে যাওয়া, স্বাদ তিতা হয়ে যাওয়া সমস্যা দূরীকরণের জন্য এ সকল রাসায়নিক দ্রবণ করে ক্যালসিয়াম প্রয়োগ করা হয়।

৭। ক) সাইট্রিক এসিড
খ) এসিটিক এসিড বা ভিনেগার
গ) টারটারিক এসিড ও
ঘ) বেনজয়িক এসিড ও তার লবণ

কাজ : ফল ও সবজি সংরক্ষণে সংরক্ষণ হিসেবে কাজ করে। সংরক্ষক হিসেবে বেনজয়িক এসিডের কার্যক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। অম্লীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন- ফলের রস, বেভারেজ, টমেটো, কেচাপ, আচার ইত্যাদিতে বেনজয়িক এসিড বেশি ব্যবহৃত হয়। সংরক্ষক হিসেবে বেনজয়িক এসিডের লবণ এই এসিড হতে বেশি কার্যকর।

৮। ক) পটাসিয়াম মেটাবাই সালফাইট ও
খ) সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইট

কাজ : এই রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপাদন করে সবজিতে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে সালফিউরিং বা সালফিটেশন বলে। এতে করে ফল ও সবজিতে ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করা যায়। এর ফলে ফল ও সবজির রঙ কালো হয় না বরং আরও উজ্জ্বল হয়। ফলের রস ও পানীয় সংরক্ষণ করতে ৩৫০-১০০০ পিপিএম ও শাঁসের ক্ষেত্রে ১৫০০ পিপিএম $SO_2$ এর দরকার হয়।

৯। ক) চিনি
খ) লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রেট)
গ) ভোজ্য তেল (সরিষার তেল)
ঘ) মধু ও
ঙ) গ্লুকোজ

কাজ : এগুলো সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। লবণ ও চিনি খাদ্যদ্রব্য হতে পানি টেনে নেয় এবং ডিহাইড্রেশনের কাজ করে। ফলে জীবাণুর বাচার জন্য প্রয়োজনীয় পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে এবং জীবাণু মারা যায়। লবণ এনজাইমের ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সরিষার তেল ব্যাকটেরিয়া জীবাণুসমূহকে প্রতিরোধ করে।

১০। ক) হাইড্রোক্লোরিক এসিড
খ) কস্টিক সোডা ও
গ) কস্টিক পটাশ

কাজ : এগুলো ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বিভিন্ন দ্রবণ তৈরিতে ব্যবহার করে।

৩.৬ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে পুষ্টিমানের পরিবর্তন ও প্রতিকার :

রান্নার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্যকে নরম, সুস্বাদু, সুপাচ্য ও জীবাণুমুক্ত করা। রান্নার পূর্বে কিছু কাজ করা দরকার যেমন খাদবস্তুকে কাটা, ধোয়া, পরিষ্কার করা ইত্যাদি এবং এর পরেই সিদ্ধ করে, ভেজে কিংবা ফুটিয়ে খাদ্যটিকে রান্না করা হয়। কিন্তু খাদ্যকে রান্নার জন্য প্রস্তুত করার সময় এর কিছু পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যায় আর বাকি যতটুকু থাকে তার মধ্যে রান্নার সময় হারিয়ে যায় আরও কিছু অংশ। খাদ্যের পুষ্টি উপাদান যেন কম নষ্ট হয় সে জন্য কিছু উপায় রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১। পানি : খাদ্যবস্তু ধোয়ার সময় পানিতে দ্রবণীয় কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়, যেমন 'বি' এবং 'সি'। চালের উপাদান থায়ামিন চাল ধোয়ার পানিতে এবং ভাতের মাড় ফেলার সাথে চলে যায়।

২। উত্তাপ : খাদ্যে উত্তাপ দিলে কিছু সেনসিটিভ উপাদান উড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ভিটামিন এ, সি। তাছাড়া আকৃতিসহ রং নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রোটিং জমাট বেঁধে যায়।

৩। আলো ও অক্সিজেন : বাতাসের সংস্পর্শে ভিটামিন সি নষ্ট হয়। তাছাড়া ফল ও সবজি কেটে রাখলে তা কালো হয়ে যায় অক্সিজেনের প্রভাবে। দুধ ও শাকসবজির ভিটামিন বি আলোতে নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন খাদ্যবস্তু বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। কোন পদ্ধতি অবলম্বনে অপচয় কম হবে, খাদ্য মূল্যের সংরক্ষণ কিছুটা হলেও করা যাবে তা আলোচনা করা হলো।

১। শাকসবজি ও ফল ধুয়ে কাটতে হবে। তবে খোসার নিচেই পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে, তাই খোসা সমেত কাটলে ভালো। রান্নার পর খোসা ফেলে দেয়া যায়। আলু অবশ্যই খোসা সমেত সিদ্ধ করা উচিত।

২। রান্নার সময় খাবার ঢেকে রান্না করলে পুষ্টি উপাদান খাবারে থেকে যায় এবং উদ্বায়ী পুষ্টি উপাদান গুলো নষ্ট কম হয়ে থাকে। উচ্চ তাপে, অল্প সময়ে, তরকারির টুকরা ডুবে এমন পানি দিয়ে রান্না করলে রং, গন্ধ, আকৃতি তুলনামূলক ঠিক থাকে। অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ করলে রং, গন্ধ সবই নষ্ট হয়ে যায়।

৩। ভাতের মাড় ফেলে দেয়া উচিত নয়। কারণ মাড়ে প্রচুর শর্করা ও ভিটামিন থাকে। তাই এমন পরিমাণ পানি দেয়া উচিত যেন মাড় ফেলতে না হয়।

৪। মাংস ও কলিজা সিদ্ধ পানি কখনো ফেলে দিতে হয় না, কারণ এতে এগুলোর নির্যাস ও খনিজ উপাদান পানির সাথে চলে যায়।

৫। খাদ্য কেনার পর পরই তা সংরক্ষণ করা উচিত। মাছ, মাংস তাড়াতাড়ি ধুয়ে, পরিষ্কার করে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রেখে দিতে হবে। শাক-সবজিও ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে।

নিম্নের সারণিতে ফল ও সবজি সংগ্রহ এবং রান্নার পর পুষ্টির অপচয় কিভাবে হয়, তা দেখানো হলো :

| ক্রমিক নং | ভিটামিন | ফ্রিজিং (%) | শুকানো (%) | রান্নার পর (%) | রান্না ও ধোয়া (%) | পুনরায় তাপ দেয়া (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ভিটামিন এ | ৫ | ৫০ | ২৫ | | ১০ |
| ২ | আলফা ক্যারোটিন | ৫ | ৫০ | ২৫ | ৩৫ | ১০ |
| ৩ | বিটা ক্যারোটিন | ৫ | ৫০ | ২৫ | ৩৫ | ১০ |
| ৪ | লাইকোপিন | ৫ | ৫০ | ২৫ | ৩৫ | ১০ |
| ৫ | ভিটামিন সি | ৩০ | ৮০ | ৫০ | ৭৫ | ৫০ |
| ৬ | থায়ামিন | ৫ | ৩০ | ৫৫ | ৭০ | ৪০ |
| ৭ | রিবোফ্লাভিন | ০ | ১০ | ২৫ | ৪৫ | ৫ |
| ৮ | নিয়াসিন | ০ | ১০ | ৪০ | ৫৫ | ৫ |
| ৯ | ভিটামিন বি$_{৬}$ | ০ | ১০ | ৫০ | ৬৫ | ৪৫ |
| ১০ | ফলিক এসিড | ৫ | ৫০ | ৭০ | ৭৫ | ৩০ |
| ১১ | ভিটামিন বি$_{১২}$ | ০ | ০ | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ |
| ১২ | ক্যালসিয়াম | ৫ | ০ | ২০ | ২৫ | ০ |
| ১৩ | লৌহ | ০ | ০ | ৩৫ | ৪০ | ০ |
| ১৪ | ম্যাগনেসিয়াম | ০ | ০ | ২৫ | ৪০ | ০ |
| ১৫ | ফসফরাস | ০ | ০ | ২৫ | ৪০ | ০ |
| ১৬ | পটাশিয়াম | ১০ | ০ | ২৫ | ৩৫ | ০ |
| ১৭ | সোডিয়াম | ০ | ০ | ২৫ | ৫৫ | ০ |
| ১৮ | জিঙ্ক | ০ | ০ | ২৫ | ২৫ | ০ |
| ১৯ | কপার | ১০ | ০ | ৪০ | ৪০ | ০ |

উৎস : USDA (2003)

খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যেমন আমিষ, শ্বেতসার ও চর্বির এর তেমন কোন পরিবর্তন হয় না।

৩.৭ প্রক্রিয়াজাতকরণে ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠাকরণ এবং উপজাত ব্যবহার :

প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

ক) স্থান নির্বাচন :

১। চাহিদা আছে এরূপ কোনো বড় বাজারের নিকট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন হওয়া উচিত।

২। আলো বাতাসপূর্ণ, স্বাস্থ্যপ্রদ ও পরিচ্ছন্ন স্থান নির্বাচন করা উচিত।

৩। কাঁচামাল সহজে ও সুলভে পাওয়া যায় এরূপ স্থান নির্বাচন করা উচিত।

৪। নিকটেই আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থ অপসারণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

খ) যাতায়াত ব্যবস্থা :

কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য দূরবর্তী স্থানে চালান দেওয়ার জন্য সড়কপথ, নদীপথ, রেলপথ সম্পন্ন স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত।

গ) শ্রমিক সরবরাহ :

প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অভিজ্ঞ দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাবে এরূপ স্থানে শিল্প স্থাপন করা উচিত।

ঘ) পানি সরবরাহ :

১। একটি ছোট ফ্যাক্টরিতে প্রতিদিন ১০-১২ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

২। বাহির হতে যথেষ্ট পানি সরবরাহ না পাওয়া গেলে বিকল্প ব্যবস্থা যেমন- টিউবওয়েল বা শ্যালো পাম্প স্থাপন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঙ) ঘরবাড়ি নির্মাণ, নকশা প্রণয়ন এবং প্রসেসিং স্থান নির্বাচন :

১। ফল বাগানের নিকট এ ধরনের শিল্প স্থাপন করা উত্তম।

২। ছোট আকারের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য কমপক্ষে ১৫০ বর্গমিটার জায়গা প্রয়োজন।

৩। মেঝে একটু উঁচু কিন্তু ঢালু করে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করতে হবে। ঘরের ছাদ টিন বা অ্যাসবেসটস হলে ভালো হয়।

৪। শিল্প প্রাঙ্গণ খোলামেলা ও আলো বাতাস চলাচল উপযোগী হতে হবে।

৫। দরজা জানালা বা সব ধরনের প্রবেশপথ কীটপতঙ্গ ও ইঁদুর নিরোধক হতে হবে প্রয়োজনে তারের জাল লাগাতে হবে।

৬। যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আকৃতি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ব্যবহারের পর তা পরিষ্কার করতে সহজ হয়।

৭। প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে ব্যবহৃত ঘরের দেয়াল মসৃণ ও ফাটলবিহীন হতে হবে।

৮। প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টের বিভিন্ন পাত্র, টেবিল, সরঞ্জাম ও তৈজসপত্র পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯। বর্জ্য পানি, তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ সুষ্ঠু নিষ্কাশন ও অপসারণের কার্যকর নালা বা নর্দমার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিল্প স্থাপনের কারণে আশেপাশের পরিবেশ বিপর্যয় যেন না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০। কার্যরত কর্মচারী ও শ্রমিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বেসিন ও টয়লেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১১। সবার জন্য ফার্স্টএইড ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১২। প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও ক্লিনিং-এর কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের নির্দিষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেমন-গ্লোভস, টুপি, গামবুট ইত্যাদি।

১৩। প্রতিটি কক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক নিগর্মন পাখা (এগজস্ট) থাকতে হবে।

১৪। খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসে এরূপ পাইপ ফিটিংস ও যন্ত্রপাতি অবশ্যই স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি হতে হবে। এগুলোর পরিদর্শন ও পরিষ্কার করার জন্য সংযোগস্থল এমন হতে হবে যাতে সহজেই খেলা যায় এবং লাগানো যায়।

চ) প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি :

প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নিম্নরূপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

১। ফল ও সবজিকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী করে তোলার যন্ত্রপাতি।

২। ফলের রস নিষ্কাশন ও শাঁসের মণ্ড তৈরির যন্ত্রপাতি।

৩। বোতল বা টিনের পাত্র বা ক্যান ধৌতকরণ যন্ত্রপাতি।

৪। তরল খাদ্যদ্রব্য ক্যানে ভর্তি করার যন্ত্রপাতি।।

৫। খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করা বা রান্না করার যন্ত্রপাতি।

৬। তৈরি খাদ্যদ্রব্য বোতল বা ক্যানে ঢুকানোর যন্ত্রপাতি।

৭। বোতল বা ক্যানের মুখ বন্ধ করা ও সীল করার যন্ত্রপাতি।

৮। বোতল বা ক্যানে লেবেল আঁটা, প্যাকিং করার যন্ত্রপাতি।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে করণীয় কাজ

বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যাবলির মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যাবলি সম্পাদনের সময় সবচেয়ে বেশি সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ খাদ্য সরাসরি মানুষের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে এবং দেহাভ্যন্তরে তার প্রভাব তাড়াতাড়ি প্রদর্শন করে।

খাদ্য মানুষ তার উপকারের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করে এবং উদ্দেশ্যানুসারে খাদ্য কাজ তখনই করবে যখন তা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে তৈরি ও পরিবেশন করা হবে। কাজেই খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মূল কাজ শুরুর আগে প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা বা পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত করতে হবে। এটি খুবই জরুরি একটি বিষয়।

এর সঙ্গে ঝামেলামুক্ত ও সুশৃঙ্খল উৎপাদন অবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। মূল কাজ শুরুর আগে যেসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ক) উৎপাদন কক্ষে যাতে মশা মাছি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) যেসব আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে তা কমপক্ষে আগের দিনেই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে রাখতে হবে।

গ) বোতল, ক্যাপ আগে থেকেই স্টেরিলাইজেশন করে তা শুষ্ক করে রাখতে হবে।

ঘ) আচার বা জেলীর বোতল ধৌত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়, সিরাপ ছাঁকার কাপড় অবশ্যই পরিষ্কার থাকবে।

ঙ) হ্যান্ড গ্লোভস ও অ্যাপ্রোন পরিষ্কার থাকবে।

চ) নারী শ্রমিকরা বাড়িতে থেকে পরে আসা কাপড় পরিবর্তন করে ফ্যাক্টরির জন্য নির্ধারিত পরিষ্কার কাপড় পরিধান করবে এবং নারী-পুরুষ সব শ্রমিকের মাথার চুল কাপড় বা টুপি দিয়ে ঢাকা থাকবে।

ছ) কর্মরত সবার হাত ও পায়ের নখ ছোট থাকবে এবং হাত-পা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।

জ) উৎপাদন এলাকায় জুতা ব্যবহার করা যাবে না।

ঝ) উৎপাদনের আগের দিনই সবার জানা থাকা দরকার যে, আগামী দিন কী উৎপাদন করতে হবে এবং তার জন্যে উৎপাদন কর্মকর্তার একটি পরিষ্কার প্ল্যান থাকবে।

ঞ) চুলায় ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করার সময় সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।

ট) ল্যাবরেটরিতে সবার প্রবেশ ঠিক নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শুধু সেখানে কাজ করবেন এবং কেমিক্যাল পরিমাণ ও খাদ্যে যোগ করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ কেমিক্যালের সামান্য পার্থক্যের কারণে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যের গুণগত মানের অনেক পার্থক্য হতে পারে। এমনকি বিপজ্জনকও হতে পারে।

ঠ) টয়লেট ব্যবহারের পর হাত-পা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যাবলি শেষ হলে করণীয় কাজ

ক) সমস্ত কক্ষ পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।

খ) যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রগুলোর সকল অংশ পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনে ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে।

গ) ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে।
ঘ) প্রক্রিয়াজাতকৃত চূড়ান্ত খাদ্যসামগ্রী ঢেকে রাখতে হবে।
ঙ) ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরাগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে জেট পাউডার বা সাবান সহযোগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে উপজাত ব্যবহার

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে রস, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলী, আচার, চাটনি, কেচাপ, শুকনো ফল ও সবজি ইত্যাদির খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। এ সকল খাদ্যদ্রব্য তৈরি করার পর বেশ কিছু ফল ও সবজি উপজাত দ্রব্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। এ সকল উপজাত দ্রব্যাদি নিম্নরূপ হতে পারে।

১। লেবু জাতীয় ফলের খোসা, ছোবড়া ও বীজ।
২। আমের আঁটি ও খোসা।
৩। কাঁঠাল ফলের মোটা বাকল ও বীজ।
৪। পেয়ারার বিচি ও খোসা।
৫। কলার খোসা ও গাছের কাণ্ড।
৬। তরমুজের খোসা ও বিচি।
৭। নারিকেলের আইচা বা মালা, ছোবড়া ও কচি ডাবের খোসা।
৮। আনারসের খোসা ও পাতা।

সবজি হতে উপজাত দ্রব্য

১। টমেটোর খোসা ও বীজ।
২। ভুট্টার ছোবড়া ও ফুল।
৩। মটরশুঁটির খোসা ও পাতা।
৪। পুঁইশাক, লাউ, কুমড়া ও মিষ্টি আলুর অব্যবহৃত অংশ।

এছাড়াও ব্যবহৃত চা পাতা, তুলার বীজ ও অন্যান্য অব্যবহৃত ফল ও সবজির উপজাত ব্যবহার করে ছোট আকারের কুটির শিল্প গড়া যায়। যা প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পাশেই স্থাপন করা লাভজনক। এতে করে উৎপাদন খরচ অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়। এগুলো বিক্রি বা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করাও সম্ভব। এ সকল উপজাত হতে যে শিল্প গড়া যায় তা নিম্নরূপঃ

১। প্রসাধনী তেল (লেবুজাতীয় ফলের খোসা ও বিভিন্ন ফলের বিচি হতে)
২। গো-খাদ্য (ভুট্টা, কলাগাছ, লেবু জাতীয় ফল)
৩। মোলাসেস (বিভিন্ন ফলের অব্যবহৃত অংশ হতে)।
৪। গুঁড়াজাত খাবার (আমের আঁটি ও কাঁঠালের বিচি হতে)
৫। কাগজ শিল্প (কলাগাছ, আখের খোসা থেকে মণ্ড)
৬। কুটির শিল্প (নারিকেল, আনারসের পাতা)

৭। জৈব সার (অব্যবহৃত ফল ও সবজির অংশ থেকে)
৮। ভেজিটেবল ডাই বা রঙ (পেঁয়াজের খোসা, ডালিমের খোসা ও কাঁঠাল গাছের কাঠ কাটা গুঁড়া)
৯। মশার কয়েল (নারিকেল আইচা বা মালা থেকে)।

৩.৮ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পানির গুণাগুণ

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সবচেয়ে বেশি যে উপাদানটি ব্যবহৃত হয় তা হলো পানি। বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পানির অপর নাম জীবন, দূষিত পানি হতে পারে মৃত্যুর কারণ।

সুপেয় পানির বৈশিষ্ট্য

১। পানির ক্লারিটি, টারবিডিটি (Clarity-Turbidity) ১০ P.P.M অপেক্ষা স্বচ্ছ হবে।
২। সম্পূর্ণ বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হবে।
৩। কোনো অপ্রতিকর ঘ্রাণ আসবে না।
৪। পানিতে কী পরিমাণ $CaCO_3$ (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) আছে তার উপর নির্ভর করে পানির খরতা জানা যাবে।

| $CaCO_3$ (PPM) | অবস্থা |
|---|---|
| ৫০ এর কম | মৃদু পানি |
| ৫০ - ১০০ | মৃদু খর |
| ১০০ - ২০০ | খর |
| ২০০ এর বেশি | বেশি খর |

৫। পানিতে দ্রবীভূত অন্যান্য ধাতু ও খনিজ লবণ নিম্নের সীমা অতিক্রম করবে না।

| নাম | শেষ সীমা (PPM) |
|---|---|
| আর্সেনিক | ০.০৫ |
| সেলেনিয়াম | ০.০৫ |
| ক্লোরিন | ১ |
| সীসা | ০.১ |
| কপার | ০.৩ |
| জিংক | ১৫ |
| আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ | ০.৩ |
| ম্যাগনেসিয়াম | ২৫ |
| ক্লোরাইড | ২৫০ |

৬। পানিতে কোনো অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি থাকবে না।

খরতার ভিত্তিতে পানি দুই প্রকার। যথা (ক) খর পানি (খ) মৃদু পানি।

খর পানি : যে পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ও ফেরাস আয়রনের বাই কার্বনেট, সালফেট ও ক্লোরাইড জাতীয় লবণ দ্রবীভূত থাকে তাকে খর পানি বলে। খরতা দুই প্রকার। যথা- অস্থায়ী খর ও স্থায়ী খর। পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের বাই কার্বনেট দ্রবীভূত থাকলে পানির যে খরতা দেখা যায় তা অস্থায়ী খরতা এবং পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির ক্লোরাইড বা সালফেট দ্রবীভূত থাকলে তা পানির স্থায়ী খরতা হয়। খর পানি সাবানের সাথে সহজে ফেনা সৃষ্টি করে না।

মৃদু পানি : মৃদু পানি সাবানের সাথে প্রচুর ফেনা সৃষ্টি করে। যে পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন প্রভৃতির ক্লোরাইড, সালফেট বা বাইকার্বনেট থাকে না তাকে মৃদু পানি বলে।

অস্থায়ী খরতা দূরীকরণের উপায়

ক) ফুটিয়ে : পানিকে ভালোভাবে ফুটিয়ে অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।

খ) ক্লার্ক প্রণালি : এ পদ্ধতিতে পানির সাথে পরিমাণমতো চুন বা চুনের পানি যোগ করে অধঃক্ষেপ ছেঁকে নিলেই মৃদু পানি পাওয়া যায়।

স্থায়ী খর পানি দূরীকরণের উপায় :

ক) সোডা প্রণালি : এক্ষেত্রে পানিকে সোডিয়াম কার্বনেট সহযোগে ফুটানো হয় তারপর পরিস্রাবণ করলে মৃদু পানি পাওয়া যায়।

খ) পারমুটিট প্রণালি : এটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়। খর পানিতে পারমুটিট অর্থাৎ সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অর্থোসিলিকেট যৌগ যোগ করা হলে উক্ত যৌগের সোডিয়াম লবণ তৈরি করে এবং খর পানির ক্যালসিয়াম লবণ অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম পারমুটিট হিসেবে তলানি পড়ে যায়। ফলে খর পানি মৃদু পানিতে পরিণত হয়।

পানি শোষণ বা বিশুদ্ধকরণ

পানি বিভিন্ন উপায়ে শোধন করা যায়। যথা-

ক) ফিলট্রেশন বা ছাকন প্রক্রিয়া

খ) ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়া

গ) আগুনে ফুটানো

(ক) ফিলট্রেশন প্রক্রিয়া : এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে ফিল্টার বেডের মধ্য দিয়ে পানিতে প্রবাহিত করে তা থেকে ভাসমান অপদ্রব্য দূর করা হয়। অতঃপর ঐ পরিষ্কার পানিকে মিলিপোর ফিল্টার বা সিন্টার্ড ফিল্টার এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এ জাতীয় ফিল্টারের ছিদ্র এতই সূক্ষ্ম থাকে যে, এর ভিতর দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে না। বোতলে যে পানি কিনতে পাওয়া যায় তা এই প্রক্রিয়ায় শোধন কর হয়। ক্লোরিন পানিতে দেবার পর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পরে পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। রাতের বেলা ক্লোরিন ব্যবহার সর্বোত্তম। ০.৫ মি. গ্রা. এর একটা ক্লোরিন ট্যাবলেট ২০ লিটার পানিকে জীবাণুমুক্ত করতে পারে। এ ছাড়া আয়োডিন, পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ও ফিটকিরি দ্বারাও পানি বিশুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

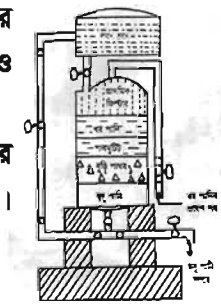

চিত্র : পারমুটিট প্রণালী

(খ) ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়া : পানিকে প্রথমে ফিল্টার বেডের মাধ্যমে পরিষ্কার করার পর ক্লোরিন গ্যাস, ব্লিচিং পাউডার অথবা হ্যালোজেন ট্যাবলেট মিশিয়ে শোধন করা হয়। ক্লোরিন পানির ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে জীবাণুমুক্ত করে।

২০২০

ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারের নিয়ম

প্রথমে ব্লিচিং পাউডার একটি বালতিতে অল্প পানিতে গুলে পেস্টের মতো করে নিতে হয়। তারপর কিছু পানি দিয়ে পাতলা করে ৫-১০ মিনিট থিতিয়ে উপর থেকে পরিষ্কার পানি ট্যাংকে ঢেলে দিতে হয়।

(গ) আগুনে ফুটানো : পানিকে ১০ মিনিট ভলোভাবে উত্তপ্তজালে ফুটালে পানির সমস্ত জীবাণু ও স্পোর মারা যায় এবং পানি মৃদু পানিতে পরিণত হয়। যাদের ঘরে ফিল্টার নেই তারা অন্তত পানি ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারে।

৩.৯ বর্জ্য পদার্থ দূরীকরণে সতর্কতা

যে কোনো শিল্পের বর্জ্য পদার্থ দূরীকরণ একটি প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। বর্জ্য পদার্থ শিল্প এলাকা হতে নিরাপদভাবে অপসারণ করা না হলে যে কোনো রকম দূষিত পদার্থ খাদ্যদ্রব্যে সংযোগ হতে পারে। এতে করে জীবনহানি বা মারাত্মক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। বর্জ্য পদার্থ দুই ধরনের হতে পারে-

১। কঠিন বর্জ্য পদার্থ

২। তরল বর্জ্য পদার্থ

নিম্নলিখিত উপায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কারখানার আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থসমূহ দূর করা যেতে পারে। যেমন–

ক) আবর্জনা অপসারণ

খ) আবর্জনা শোধন ও

গ) বর্জ্য রূপান্তরকরণ।

আবর্জনা অপসারণ : খাদ্যশিল্পের বিভিন্ন ধরনের কঠিন বর্জ্য পদার্থ দূরে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাটির নিচে বা নিচু জায়গা ভরাট করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর প্রধান অসুবিধা পরিবেশ দূষণ, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিল্প এলাকা বিশেষ করে টঙ্গীর তুরাগ নদের পনি দেখলে সহজেই বঝা যায় শিল্পবর্জ কী ভয়ানক দূষণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

শোধন : এক্ষেত্রে কঠিন বর্জ্য পদার্থ উচ্চ তাপমাত্রায় পুড়িয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা যায়। বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের মতো পানি সমৃদ্ধ জৈবিক বস্তুসমূহ শোধনের উপযোগী ছোট প্লান্ট দেশে-বিদেশে কিনতে পাওয়া যায়। তা দ্বারা শোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

রূপান্তরকরণ : কঠিন বর্জ্য পদার্থ সার বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ তৈরিতে উপকরণ হিসেবে রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। তরল বর্জ্য পদার্থ নিম্ন উপায়ে দূরীকরণ করা যায়। যথা -

১। বর্জ্য পদার্থের সহিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ব্যবহার উপযোগী করে প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায়।

২। জৈবিক প্রক্রিয়ায় বর্জ্য পদার্থ দূরীকরণ। যেমন-

ক) পানিতে দ্রবীভূত করে।

খ) সেচ কাজে ব্যবহার করে।

গ) জলাশয়ে প্রবেশ করে

ঘ) পরিস্রাবণ করে ব্যবহার

ঙ) পানি থিতিয়ে ব্যবহার।

সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে বর্জ্য পদার্থ যেন অতিরিক্ত বিষাক্ত হয়ে পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ না হয়। অতিরিক্ত ক্ষতিকর বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নিরপেক্ষ করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা উচিত।

## অনুশীলনী-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কাকে বলে?
২। ব্রাইন দ্রবণ কাকে বলে?
৩। সবজিকে কেন ২% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়?
৪। ১ লিটার পানিতে কী পরিমাণ লবণ দিলে ২% ব্রাইন দ্রবণ হবে?
৫। লবণ জারানো বলতে কী বুঝায়?
৬। ছত্রাকের আশঙ্কা দেখা দিলে লবণ জারানো পানিতে কী দিতে হয়?
৭। ফলও সবজির লবণাক্ততা পরিমাপ করার যন্ত্রের নাম কী?
৮। চিনির সিরার গাঁদ কীভাবে দূর করতে হয়?
৯। চিনির দ্রবণের ঘনত্ব বা TSS কোন যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয?
১০। ক্যানিং বলতে কী বুঝায়?
১১। ক্যানিং করা খাদ্য ঢাকনা না খুললে কত বছর ভালো থাকে?
১২। রির্টটিং বলতে কী বুঝায়?
১৩। অনেক সময় সংরক্ষিত ফলের রসে চিনির তলানি পড়ার কারণ কী?
১৪। ঠিকমতো জ্বাল দেওয়ার পরও অনেক সময় জেলি সেট হয় না এর কারণ কী?
১৫। মোরব্বার টুকরা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ কী?
১৬। আচার নরম ও পিচ্ছিল কেন হয়?
১৭। কেচাপ কেন দলা বাঁধে?
১৮। ব্ল্যাক নেক কী?
১৯। ক্যান ফুলে যাওয়ার কারণ কী?
২০। কোন কোন খাদ্যের সাথে ভিনেগার মিশালে খাদ্যের স্বাদ বাড়ে?
২১। ভিনেগার কী?
২২। ফার্মেন্ডেড ভিনেগার কী?
২৩। গৃহজাত ভিনেগার কী দিয়ে তৈরি করে?
২৪। চিনি পোড়া রং কে কী কালার বলে?
২৫। আপেলের রস হতে তৈরি ভিনেগারকে কী বলে?
২৬। প্রক্রিয়াজাত শিল্পে যে সকল রাসায়নিক ব্যবহার হয় এগুলো কত প্রকার ও কী কী?
২৭। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থগুলো ফল ও সবজির শ্বসনের হার কমিয়ে রাখে?
২৮। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ ফল ও সবজি পাকা রোধ করে?
২৯। সংরক্ষক হিসেবে কোন রাসায়নিকের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?
৩০। সালফিউরিং বা সালফিটেশন কাকে বলে?
৩১। ফলের রস ও পানীয় সংরক্ষণ করতে কতটুকু $SO_2$ লাগে?
৩২। একটি ছোট ফ্যাক্টরিতে দৈনিক কী পরিমাণ পানি প্রয়োজন হয়?
৩৩। ছোট আকারের শিল্পের জন্য কতটুকু জায়গা প্রয়োজন?
৩৪। খর পানি কাকে বলে?
৩৫। পারমুটিট প্রণালিতে যে যৌগ দ্বারা পানির খরতা দূর করা হয় তার নাম কী?
৩৬। পানি বিশুদ্ধকরণ উপায় ৩টি কী কী?
৩৭। শিল্পকারখানা হতে বর্জ্য পদার্থ দূর করার ধাপ ৩টি কী কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল ও সবজির প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো কী কী?
২। সংরক্ষণের জন্য কীভাবে লবণের দ্রবণ তৈরি করে?
৩। সংরক্ষণের জন্য সবজির টুকরাগুলো কীভাবে লবণে জারানো হয়?
৪। ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বে চিনির সিরা তৈরি পদ্ধতি লেখ।
৫। ফলের রস তৈরিতে কী কী সমস্যা ও এর প্রতিকার কিভাবে করতে হয়?
৬। মোরব্বা ও ক্যান্ডির সমস্যা ও প্রতিকার লেখ।
৭। পিকল বা আচারের ৩টি সমস্যা ও প্রতিকার লেখ।
৮। ভিনেগার কী? আদর্শ ভিনেগারের বৈশিষ্ট্য কী কী?
৯। ফার্মেন্টেড ভিনেগার তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১০। কৃত্রিম ভিনেগার কীভাবে তৈরি করে?
১১। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার হয় তা কত প্রকার ও কী কী?
১২। ফলও সবজির শ্বসন রোধ ও পাকার প্রক্রিয়া রোধের জন্য দায়ী রাসায়নিকের নাম লেখ।
১৩। প্রক্রিয়াজাত শিল্পের উপজাত হতে কী কী কুটির শিল্প গড়া যায় তার নাম লেখ।
১৪। সুপেয় পানির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।
১৫। স্থায়ী ও অস্থায়ী খরতা দূরীকরণের উপায় কী?
১৬। পানি বিশুদ্ধকরণের ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
১৭। বর্জ্য পদার্থ রূপান্তরকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতিগুলো কী কী? সংরক্ষণের জন্য চিনির সিরা ও লবণের দ্রবণ প্রস্তুত প্রণালি লেখ।
২। ফল ও সবজির ক্যানিং বলতে কী বুঝায়? ক্যানিং পদ্ধতির flow chart টি লেখ।
৩। জ্যাম, জেলি, আচার ও ক্যানিং-এর যে সমস্যা দেখা যায় তার প্রতিকার লেখ।
৪। ভিনেগার কী? ফার্মেন্টেট ও কৃত্রিম ভিনেগার তৈরি প্রণালি বর্ণনা কর।
৫। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে যে সকল রাসায়নিক ব্যবহার হয় তাদের কাজ লেখ।
৬। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের স্থান নির্বাচন, যাতায়াত, ঘরবাড়ি, নকশা ও প্রসেসিং স্থান নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন।
৭। প্রক্রিয়াজাতকরণের কার্যাবলি বাস্তবায়নের সময় ও শেষে করণীয় কাজ বর্ণনা কর।
৮। ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত শিল্পে উপজাতগুলো কী কী এবং এগুলো কীভাবে ব্যবহার হবে?
৯। পানির খরতা দূরীকরণ ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
১০। বর্জ্য পদার্থ দূরীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

## অধ্যায়-৪
# আম ও কাঁঠালের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য

আমের পরিচিতি

আমের বৈজ্ঞানিক নাম (Magnifier indica) এটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় একটি ফল, ইংরেজিতে Mango পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক বেশি পরিমাণে আম পাওয়া যায় ও সেগুলো বহুল ব্যবহৃত হয় এবং আমে উল্লেখযোগ্য পুষ্টি উপকরণ থাকায় আমকে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়। আমাদের দেশে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সবচেয়ে বেশি আম উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে বিভিন্ন বর্ণ, স্বাদ, ঘ্রাণ, আকার ও আকৃতির আম পাওয়া যায়। গুণগত ও পরিমাণগত দিক বিবেচনায় রাজশাহী জেলা আম চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। রাজশাহী জেলা ঘেঁষে অবস্থিত ভারতের মালদহ জেলা ভারতে আম উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

আম মালয়েশিয়া ও ভারতে সবচেয়ে আগে থেকে আবাদ করা হতো বলে ধারণা করা হয়। ভারতে আম চাষ শুরু হয়েছে প্রায় চার হাজার বছর আগে। উনিশ শতকে ব্যবসায়ীরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে আমকে সুপরিচিত করে তোলে। আরব বণিকগণ আম নিয়ে যান পারস্য ও মিশরে। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন- ভারত, বাংলাদেশ, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রচুর পরিমাণে আমের আবাদ হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের আম পাওয়া যায়। গোলাকার , উপবৃত্তাকার, বৃক্কসদৃশ্য ইত্যাদি আকারের আম পাওয়া যায়। প্রকারভেদে আমের স্বাদ ঘ্রাণ, ও পাল্পের ঘনত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যেসব আম উৎপন্ন হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ল্যাংড়া, ফজলি, আম্রপালি, সূর্যপুরী, আশ্বিনা, গোপালভোগ, মিসরিভোগ ও বিভিন্ন ধরনের দেশি জাতের আম।

কাঁঠালের পরিচিতি :

কাঠাঁলের বৈজ্ঞানিক নাম Artocarpus Heterophyllus. ইংরেজিতে Jackfruit. আকার , পুষ্টিমান, দাম ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে কাঁঠাল পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। কাঁঠাল গাছ লম্বায় ৩০-৭০ ফুট হতে পারে এবং মূলকাণ্ড থাকে শাখান্বিত।

কাঁঠালের প্রকার বা জাত কয়েক ধরনের হতে পারে। কোনোটির মাংস পুরু, বীজ ছোট ও স্বাদ উন্নত, আবার কোনোটির মাংস পাতলা , ঘ্রাণ তীব্র এবং মিষ্টতা অধিক। ফলের ওজন ৫০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাঁঠালের কোষ কিছুটা শক্ত জাতকে খাঁজা, গালা এবং কিছু নরম জাতকে রসা জাত বলে। কাঁঠালের বিচি/বীজ থেকে ক্যান্সার রোগের ঔষধ উদ্ভাবন হয়েছে বলে জানা গেছে। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর এবং ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় তুলনামূলকভাবে দেশের সবচেয়ে বেশি কাঁঠাল জন্মে।

চিত্র : ফলসহ আম গাছ

চিত্র : ফলসহ কাঁঠাল গাছ

কাঁঠালের আবাদ সর্বপ্রথম কোন দেশে হয়েছিল তা এখনও অজানা। তবে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাঁঠাল সাফল্যজনকভাবে আবাদ হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো ভারত, মালয়েশিয়া, চীন, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ব্রাজিল। কাঁঠাল গাছের বয়স যখন তিন বছর হয় তখন থেকে গাছে কাঁঠাল আসা শুরু হয়। শুরুতে প্রতিগাছে প্রায় ১০টি কাঁঠাল হতে পারে। গাছ থেকে কাঁঠাল সংগ্রহ নির্ভর করে কাঁঠাল কিভাবে ব্যবহৃত হবে তার উপর।

সবজি বা আচারে ব্যবহৃত কাঁঠাল হবে কাঁচা। ফল হিসেবে ব্যবহার করলে কাঁঠালের ভক্ষণীয় অংশ হবে হলুদ বা হলুদাভ পাকা। এশিয়াতে কাঁঠাল পাকার উপযুক্ত সময় হচ্ছে মার্চ থেকে জুন বা জুলাই। ফুল আসার ৩-৮ মাসের মধ্যে কাঁঠাল পরিপক্ব হয়। আমাদের দেশে একটি গাছে বছরে গড়ে ১৫০টি বড় কাঁঠাল ধরে থাকে। কোনো কোনো গাছে ২৫০-৫০০ টি পরিপক্ব কাঁঠাল জন্মাতে পারে, তবে এক্ষেত্রে কাঁঠালের আকার ছোট হয়ে থাকে। পাকা কাঁঠাল এমনি রেখে দিলে দ্রুত পচে যেতে থাকে। হিমাগারে ৫২-৫০° ফা. তাপমাত্রা ও ৮৫-৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৩-৬ সপ্তাহ কাঁঠাল সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

৪.১ আম ও কাঁঠালের পুষ্টিমান ও প্রস্তুতকৃত খাদ্য :

আমের পুষ্টিগুণ : আম অতি পুষ্টিকর একটি ফল। অন্যান্য ফলের তুলনায় আমে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। ১০০ গ্রাম ভক্ষণীয় আমে প্রায় ১৯৯০ মাইক্রোগ্রাম বিটা-ক্যারোটিন (ভিটামিন 'এ' এর পূর্বসুরী) বিদ্যমান। পাকার সময়ের উপর আমের ক্যারেটিনের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। মৌসুমে আম খেলে তা যকৃতে ভিটামিন 'এ' হিসেবে জমা থাকে এবং এর স্থায়িত্বকাল এক বছর পর্যন্ত হতে পারে।

কাঁচা অথবা পাকা উভয় আমে প্রচুর ভিটামিন 'সি' আছে। ১০০ গ্রাম আমের ভক্ষণীয় অংশে ১৬ মি. গ্রাম ভিটামিন 'সি' বিদ্যমান। কাঁচা আমের তুলনায় পাকা আমে বেশি ক্যালরি উৎপন্ন হয়। পাকা আম পটাশিয়ামের জন্যও একটি উৎকৃষ্ট উৎস। আমে বিটা-ক্যারেটিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় দেহের সাধারণ বৃদ্ধি, প্রজনন ও দৃষ্টিশক্তির জন্য এর ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস এবং হৃদরোগের ক্ষেত্রে আম ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এবং রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে। ভিটামিন 'এ' এবং 'সি' এন্টিঅক্সিডেন্ট। আম কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যান্সার প্রতিরোধেও কাজ করে থাকে। তবে যাদের জন্য পটাশিয়াম ক্ষতিকর যেমন কিডনি রোগী তাদেরকে আম খেতে নিষেধ করা হয়।

**সারণি: প্রতি ১০০ গ্রাম আমের পুষ্টিমান**

| পুষ্টি উপাদান | পাকা আম | কাঁচা আম |
|---|---|---|
| প্রোটিন (গ্রাম) | ০.৬ | ০.৭ |
| ফ্যাট (গ্রাম) | ০.৪ | ০.১ |
| খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.৪ | ০.৪ |
| আঁশ (গ্রাম) | ০.৭ | ১.২ |
| কার্বহাইড্রেট (গ্রাম) | ১৬.৯ | ১০.১ |
| শক্তি (কিলোক্যালরি) | ৭৪ | ৪৪ |
| ভিটামিন 'সি' (মি.গ্রাম) | ১৬ | ৩ |
| মোট ক্যারোটিন (মি.গ্রাম) | ২২১০ | ৯০ |
| বিটা ক্যারোটিন (মি.গ্রাম) | ১৯৯০ | - |
| পটাশিয়াম (মি.গ্রাম) | ২০৫ | ৮৩ |
| সোডিয়াম (মি. গ্রাম) | ২৬ | ৪৩ |
| ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম) | ১৪ | ১০ |
| লৌহ (মি.গ্রাম) | ১.৩ | ০.৩৩ |
| ফসফরাস (মি.গ্রাম) | ১৬ | ১৯ |

উৎস : ফলপ্রক্রিয়াজাতকরণ–

আমের ব্যবহার : আম অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি খাওয়া হয়, বিশেষ করে পাকা আম । প্রক্রিয়াজাতকৃত আমের জগতে কাঁচা আমের আচার সব চেয়ে বড় স্থান দখল করে আছে। আমের জুস বা ড্রিংকের ব্যবহারও কম নয়। ব্যবসায়িক বা শিল্পভিত্তিক অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত আম সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- স্কোয়াশ, চাটনি, জ্যাম, জেলী, আমসত্ত্ব, ক্যানডি ইত্যাদি।

কাঁঠালের পুষ্টিগুণ :

কাঁঠালে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন-এ, বি ও সি এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে। দামের তুলনায় এত বেশি পুষ্টি উপাদান আর কোন ফলে পাওয়া যায় না। কাঁঠাল কাঁচা অবস্থায় তরকারি এবং পাকলে ফল হিসেবে খাওয়া হয়। এর বিচি হতে ময়দা, বিস্কুট, কেক, পাউরুটি ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব । কাঁঠালের কোষ, বোথা ও মোথায় পেকটিন থাকার কারণে উন্নত মানের জ্যাম, জেলি ও আচার তৈরি করা সম্ভব। কাঁঠালের বিচি পুড়িয়ে বা ভেজে গুঁড়ো করে তরকারি ও ডালের সাথে খাওয়া যায়। এর ফলের রস হতে আমসত্ত্বের ন্যায় মুখরোচক কাঁঠালস্বত্ব তৈরি করা যায়। কাঁঠালের পুষ্টিমান নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি: কাঁঠালের পুষ্টিমান (আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম)

| ক্রমিক নং | উপাদান | পাকা কাঁঠাল | কাঁচা কাঁঠাল | বীচি |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমিষ (গ্রাম) | ১.৮ | ২.৬ | ৬.৬ |
| ২ | শ্বেতসার (গ্রাম) | ৯.৯ | ৯.৪ | ২৫.৮ |
| ৩ | চর্বি (গ্রাম) | ০.১ | ০.৩ | ০.৪ |
| ৪ | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ১.১ | ০.৯ | ১.২ |
| ৫ | ভিটামিন বি$_১$ (গ্রাম) | ০.১১ | ০.০৫ | ০.২৫ |
| ৬ | ভিটামিন বি$_২$ (গ্রাম) | ০.১৫ | ০.০৪ | ০.১১ |
| ৭ | ভিটামিন সি (মি.গ্রাম) | ২১ | ১৪ | ১১ |
| ৮ | ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম) | ২৬ | ৩০ | ৫০ |
| ৯ | লৌহ (মাই.গ্রাম) | ০.৫ | ১.৭ | ১.৫ |
| ১০ | ক্যারোটিন (মাই. গ্রাম) | ৪৭০০ | ০ | ১০ |
| ১১ | ক্যালরি (কি. ক্যাল) | ৪৮ | ৫৯ | ১৩৩ |

| ফলের নাম | প্রস্তুতকৃত পণ্য |
|---|---|
| আম | আমের স্কোয়াশ |
| | আমের জ্যাম |
| | আমের জেলী |
| | আমের জুস |
| | আমের সিরাপ |
| | আমের নেকটার |
| | স্যাম্পো বার |
| | আমসত্ত্ব |
| | আমচুর |
| | আমের আচার |
| | আমের চাটনি |
| | আমের পাউডার |
| | আম দুধ পানীয় |
| | আমের মোরব্বা |
| কাঁঠাল | বিভক্তীত কাঁঠাল |
| | কাঁঠালের ফ্রিজার্ভ |
| | কাঁঠালসত্ত্ব |
| | কাঁঠালের স্কোয়াশ |
| | কাঁঠালের জুস |
| | কাঁঠালের জেলী |
| | কাঁচা কাঁঠালের আচার |
| কাঁঠালের বীচি | ময়দা |
| | বিস্কুট |
| | কেক |
| | পাউরুটি |
| | বিচি ভাজা |
| | বিচি দিয়ে তরকারি |
| | বিচির ভর্তা দিয়ে তরকারি। |

## ৪.২ আমের জুস, স্কোয়াশ ও অন্যান্য পানীয় :

### ক) আমের স্কোয়াশ

স্কোয়াশ পানীয় হিসেবে বহুল প্রচলিত। মেহমান আপ্যায়নের জন্য গরমের দিনে স্কোয়াশের জুড়ি নেই। ১০ কেজি স্কোয়াশের জন্য নিম্নলিখিত উপাদানের প্রয়োজন হয়-

চিত্র : কাঁঠালের বিচি

| ক্রমিক নং | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | পাকা আমের পাল্প | ৪.৫ কেজি |
| ২. | সাইট্রিক এসিড | ১১৫ গ্রাম |
| ৩. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ৬ গ্রাম |
| ৪. | চিনি | ৩ কেজি |
| ৫. | পানি | ২-৩ লিটার |

প্রস্তুত প্রণালি :

১) পাকা আমের বহিরাবরণ ও আঁটি কেটে ফেলে দিতে হয়।
২) মাংসল অংশ ছোট টুকরা করে কেটে নিতে হয়।
৩) মেশিনে ব্লেন্ড করে নিতে হয়।
৪) ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হয়।
৫) চিনি, সাইট্রিক এসিড, রস বা পাল্প ও পানি পৃথকভাবে মেপে একত্রে মেশাতে হয়।
৬) চুলায় দিয়ে চিনি বা গলা পর্যন্ত নেড়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হয়।
৭) ছেঁকে ঠান্ডা করতে হয়।
৮) সোডিয়াম বেনজয়েট মেপে গরম পানিতে গুলিয়ে নিতে হয়।
৯) ঠান্ডা চিনির দ্রবণে আমের পাল্পরিত রস মিশাতে হয়।
১০) রসের সাথে সোডিয়াম বেনজয়েট নাড়িয়ে মিশাতে হয়।

১১) জীবাণুমুক্ত করার জন্য পূর্বেই বোতল প্রায় ১৫ সেকেন্ড ফুটন্ত পানিতে ফুটিয়ে নিয়ে শুকিয়ে ফেলতে হয়।
১২) প্রস্তুতকৃত স্কোয়াশ বোতলে ভরে রাখতে হয়।
১৩) তৈরির তারিখ সম্বলিত লেবেল লাগাতে হয়।
১৪) ঠাণ্ড, শুষ্ক ও আলোকবিহীন কক্ষে গুদামজাত করতে হয়।
১৫) বায়ুরোধী করে সিল করতে হয়।

স্কোয়াশ তৈরির সাবধানতা

১) স্কোয়াশ তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, উপকরণ এবং প্রস্তুতকারীর হাত ও কাপড়-চোপড় অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। উৎপাদান কক্ষে বাচ্চাদের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
২) স্কোয়াশে কোন গ্যাস বা বুঁদবুঁদ তৈরি হয়েছে কিনা তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
৩) সংরক্ষণ রুমের তাপমাত্রা অবশ্যই কম হওয়া দরকার।
৪) উৎপাদন কক্ষে ও সংরক্ষণ কক্ষে কখনই মশা মাছি প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

খ) আমের নেকটার: ফলের রসের সাথে পানি, চিনি, সাইট্রিক এসিড ও প্রিজারভেটিব মিশিয়ে নেকটার বা জুস তৈরি করে দীর্ঘদিন সংরক্ষন করা যায়। সাধারণত নেকটারে টিএসএস-এর পরিমাণ জুসের চেয়ে বেশি থাকে। খাওয়ার সময় নেকটার অথবা জুসে পানি মিশানোর প্রয়োজন পড়ে না।

আমের নেকটার তৈরি :

প্রয়োজনীয় উপকরণ : আমের রস-১ কেজি, সাদা চিনি-৫০০ গ্রাম, সাইট্রিক এসিড-৯ গ্রাম, কে.এম.এস-৫০০ মি.গ্রাম পানি-৪.৮ লি. ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালি :

১) ত্রুটিমুক্ত পাকা আম পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে হাত দিয়ে চেপে রস নিংড়িয়ে নিতে হয়।
২) মোটা চালুনিতে রস ছেঁকে আমের আঁশ ফেলে দিয়ে আলাদা পাত্রে রাখতে হয়।
৩) চিনি, পানি, সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে সিরাপ প্রস্তুত করে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়।
৪) আমের রসে সিরাপ ঢেলে হাতা বা চামচ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে দিতে হয়। সিরাপ মিশ্রিত রস আবারও ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হয়।
৫) এবার তৈরিকৃত নেকটার গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলে ১ ইঞ্চি খালি রেখে ভরে ফেলা হয় এবং বোতলের ছিপি হালকা করে এঁটে দিতে হয়।

গ) আমের জুস

উপকরণ : আমের রস-১ লিটার, সাদা চিনি-৮২০ গ্রাম, সাইট্রিক এসিড-১৬ গ্রাম, কেএমএস-৬৬ মি.গ্রাম, পানি-৪.৮ লিটার ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালি : জুসের প্রস্তুত প্রণালি হুবহু নেকটারের প্রস্তুত প্রণালির মতো। পার্থক্য শুধু জুসের টিএসএস এর পরিমাণ নেকটারের চেয়ে কম থাকে এবং জুস খাবার সময় কোন পানি যোগ করার প্রয়োজন হয় না।

ঘ) চিনির সিরায় আম সংরক্ষণ : পাকা আম, কাঁঠাল ও আনারস নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে চিনির সিরায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

উপকরণসমূহ: ফলের টুকরা ৮০০ গ্রাম, চিনি-৫৩৮ গ্রাম, সাইট্রিক এসিড-৮ গ্রাম, কেএমএস-৫০০ মি.গ্রাম. পানি ১ লিটার ইত্যাদি।

সংরক্ষণ পদ্ধতি : প্রথমে পাকা আমগুলো পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে আনুমানিক ২×২×২ সেমি. আকারে টুকরো করতে হয়। পরিমাণমতো চিনি নিয়ে ৩৫° ব্রিক্স দ্রবণ তৈরি করতে হয়। ৫৩৮ গ্রাম চিনির সাথে ১ কেজি বা লিটার পানি মিশালে ৩৫° ব্রিক্স চিনির দ্রবণ তৈরি হয়। পাতলা কাপড় দিয়ে চিনির দ্রবণ ছেঁকে ১০ মিনিট ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। এবার পরিমাণমতো সাইট্রিক এসিড ও কেএমএম চিনির দ্রবণে যোগ করতে হয়। ফলের টুকরাগুলোকে জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলে ভরে চিনির দ্রবণ যোগ করতে হয়। যাতে ফলের উপরে চিনির দ্রবণের আবরণ থাকে। হালকা করে ছিপি এঁটে বোতলগুলো ফুটন্ত পানিতে রেখে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। বোতলগুলো ফুটন্ত পানি থেকে সরিয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় ছিপি এঁটে দিতে হয় এবং উল্টো করে রাখতে হয়। ঠাণ্ডা হয়ে এলে ছিপি ও বোতলের সংযোগস্থলে মোম গলিয়ে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করতে হয়। বোতলগুলো শুষ্ক ও ঠাণ্ডা জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। একই পদ্ধতিতে কাঁঠাল ও আনারস চিনির সিরায় সংরক্ষণ করা যায়।

## ৪.৩ আম ও কাঁঠালের জ্যাম, জেলি ও মার্মালেড :

আমাদের দেশে যে সকল ফল হতে উন্নত মানের জ্যাম তৈরি করা যায় তম্মধ্যে আম অন্যতম। জ্যামে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থের টিএসএস -এর পরিমাণ অবশ্যই ৬৮% হতে হবে। ভালো মানের জ্যাম পেতে হলে আম উন্নত মানের পাকা ও আকর্ষণীয় রংবিশিষ্ট হতে হবে। ব্যবহৃত চিনি ও পেকটিনের ক্ষমতা সন্তোষজনক হতে হবে।

### ক) আমের জ্যাম

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| আমের টুকরা | ৮০০ গ্রাম |
| চিনি | ৮০০ গ্রাম |
| পেকটিন | ১৫ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিড | ০৬ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজোয়েট | ০১ গ্রাম/পরিমাণমতো |
| মোম | |

প্রস্তুত প্রণালি

ক) প্রথমে অর্ধেক পরিমাণ চিনি এবং সম্পূর্ণ পেকটিন একসাথে ভালোভাবে মেশানো হয়।

খ) অবশিষ্ট চিনি এবং সমস্ত পাল্প একসাথে মিশিয়ে একটি পাত্রে নিয়ে তাপ দেয়া হয়। গরম হওয়াকালীন সময়ে ঐ মিশ্রণে চিনি-পেকটিনের মিশ্রণ যোগ হরা হয়।

গ) গরম করা অবস্থায় বারবার টিএসএস পরীক্ষা করে দেখা হয়। টিএসএস ৬০% এর মধ্যে আসলে সাইট্রিক এসিড যোগ করা হয়।

চ) প্রস্তুতকৃত জ্যাম গরম অবস্থাতেই বোতলের ভর্তি করা করা হয়।

ছ) জ্যাম বোতলে ভর্তি করার সময় বোতলের মুখ আধা ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা রাখলে ভালো হয়।

জ) জ্যাম জমে গেলে ও ঠাণ্ডা হলে বোতলের ফাঁকা মুখে মোম গুলিয়ে যোগ করা হয়।

ঝ) শেষে বোতলের মুখে ঢাকনা লাগানো হয়।

ঞ) বোতলের গায়ে লেবেল লাগিয়ে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক কক্ষে গুদামজাত করা হয়।

খ) আমের জেলি : আমের জেলি তৈরির পদ্ধতি অনেকটা জ্যামের মতোই বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়াজাত অর্ধ কঠিন খাদ্য, তবে এখানে পাল্পের পরিবর্তে ফলের রস ব্যবহার করা হয়। জেলিতে মিশ্রণের টিএসএস ৬৫ হতে হয়। রিফ্রাক্টোমিটারে রিডিং ৬৫০ হলেই জেলি নামিয়ে নিতে হয়। আমের জেলি তৈরিতে কাঁচা আমও ব্যবহার করা যায়। এতে চিনির পরিমাণ একটু বেশি হয়। লেবুর সসের পরির্বতে ভিনেগার বা সাইট্রিক এসিড ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) কাঁঠালের জ্যাম

| উপরকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| কাঁঠালের পাল্প | ১ কেজি |
| চিনি | ১ কেজি |
| সাইট্রিক এসিড | ১১-১২ গ্রাম |
| পেকটিন | ১৬ গ্রাম |
| কেএমএস | ১ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

ক) পাকা কাঁঠালের কোয়া থেকে বীজ অপসারণের পর কোয়ার সাথে অল্প পানি যোগ করে ব্লেন্ডিং করে ছেঁকে পাল্প সংগ্রহ করা হয়।

খ) প্রত্যেকটা উপাদান আলাদা-আলাদাভাবে মেপে নেয়া হয়।

গ) পেকটিন ও ৩০০ গ্রাম চিনি শুকনা অস্থায় ভালোভাবে মিশিয়ে তারপর প্রায় ৫০০ মি.লি. পানি যোগ করে জ্বাল দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে রেখে দেয়া হয়।

ঘ) অবশিষ্ট চিনি ও পাল্প চুলার নিয়ে জ্বাল দেয় হয়। জ্বাল দেয়ার সময় অনবরত নাড়তে হয়।

চ) মিশ্রণের টিএসএস ৬৭.৫% হলে চুলা থেকে নামিয়ে নেয়া এবং সামন্য পানিতে কেএমএস গুলিয়ে এতে যোগ করা হয়।

ছ) উত্তপ্ত মিশ্রণ জীবাণুমুক্ত শুষ্ক বোতলে সাথে সাথে ঢালা হয়।

জ) জ্যাম ঠাণ্ডা হলে অথবা গরম অবস্থায় জ্যামের উপরিভাগে পরিষ্কার মোম গুলিয়ে যোগ করা হয়।

ঝ) মোম ঠাণ্ডায় জমে গেলে বোতলে উপরিভাগে শুকনা ন্যাকড়া দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ক্যাপ লাগানোত হয়।

ঞ) বোতলের বাইরে দিক ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে এবং তারপর শুকিয়ে লেবেল লাগানো হয়।

ট) প্রস্তুতকৃত জ্যাম ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও কম আলোবিশিষ্ট কক্ষে গুদামজাত করা হয।

ঘ) কাঁঠালের জেলি :

কাঁঠালের জ্যাম ও জেলির উৎপাদন কৌশল প্রায় একই রকম। জেলির ক্ষেত্রে কাঁঠালের কোয়া থেকে প্রাপ্ত পাল্পকে পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার রসটুকু নেয়া হয়। তাপ প্রয়োগের সময় জেলি তৈরি সম্পন্ন হলে জেলির টিএসএস হবে ৬৫-৭০%।

কাঁঠালের জেলি টেরির উপকরণ নিম্নরূপ :

| ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১ | কাঁঠাল পাল্প | ১ কেজি |
| ২ | চিনি | ১ কেজি |
| ৩ | সাইট্রিক এসিড | ১১ গ্রাম |
| ৪ | পেকটিন | ১০ গ্রাম |
| ৫ | কে.এম.এস | ০.৭ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. কাঁঠাল ভেঙে কোয়া সংগ্রহ করে থেকে বীজ অপসারণ করা হয়।
২. বীজ ছাড়া কোয়া হাত দিয়ে চটকিয়ে অল্প পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে ছেঁকে রস নিতে হয়।
৩. রস জ্বাল দিয়ে হয়।
৪. সব উপকরণ আলাদাভাবে মেপে নিতে হবে।
৫. চিনির সাথে পেকটিন মিশাতে হবে।
৬. এত পাস্তুরিত রস মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
৭. টিএসএস ৬৫% হলে জ্বাল বন্ধ করে দিতে হবে।
৮. কেএমএস কুসুম গরম পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে।
৯. কেএমএস ও সাইট্রিক এসিড মিশাতে হবে।
১০. জীবানুমুক্ত জারে ভরে রাখতে হবে।
১১. জেলির উপরি ভাগে মোমের প্রলেপ দেয়া হয়।

(ঙ) কাঁঠালের প্রিজার্ভ :

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| কাঁঠাল পাল্প | ১ কেজি |
| চিনি | ১ কেজি |
| পানি | পরিমাণমতো |

প্রস্তুত প্রণালি

১. শক্ত পাকা কোয়াবিশিষ্ট কাঁঠাল নির্বাচন করা হয়।
২. কাঁঠাল ভেঙে কোয়া সংগ্রহ করে থেকে বীজ অপসারণ করা হয়।
৩. কোয়া লম্বালম্বি করে ৩-৪ টুকরায় কাটা হয় ও পানিতে ধোয়া হয়।
৪. সমপরিমাণ পানি ও চিনির মিশ্রণ ফুটিয়ে নেয়া হয় এবং কোয়া প্রস্তুতকৃত সিরাপে সারারাত ডুবিয়ে রাখা হয়।
৫. বোতল ফুটন্ত পানিতে ৩০ মিনিট রেখে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করা হয়।

৬. বোতল উল্টিয়ে পানিতে রেখে সিল সম্পূর্ণভাবে বায়ুরোধী হয়েছে কি-না পরীক্ষা করা যেতে পারে।
৭. সিরাপের স্বাদ বাড়াতে অল্প পরিমাণ সাইট্রিক এসিড যোগ করা যেতে পারে।

(চ) কাঁঠালের স্কোয়াশ

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| কাঁঠালের পাল্প | ২৫০ গ্রাম |
| চিনি | ৪২০ গ্রাম |
| পানি | ৩১৮.৫ মি. লি. |
| সাইট্রিক এসিড | ১১ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ০.৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি

ক. পাকা কাঁঠালের কোয়া সংগ্রহ করে তা থেকে বীজ অপসারণ করা হয়।

খ. বীজবিহীন কোয়া সামান্য পানি সহযোগে ব্লেন্ডিং করে ছেঁকে নেয়া হয়।

গ. পরিমাপ অনুযায়ী প্রত্যেকটা উপকরণ মেপে নেয়া হয় ও ঠাণ্ডা হতে দেয়া হয়।

ঘ. পাল্প চুলায় নিয়ে কিছুক্ষণ অর্থাৎ ৩০ মিনিট ফুটিয়ে নেয়া হয় ও ঠাণ্ডা হতে দেয়া হয় ।

ঙ. চিনি ও পানি এক সাথে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে চিনি গুলিয়ে নেয়া হয় এবং চিনি গলার পর সাইট্রিক এসিড যোগ করে মেশানো হয়।

চ. প্রস্তুতকৃত সিরাপ ঠাণ্ডা হতে দেয়া হয়। তাপমাত্রা অনেকটা কমে গেলে সিরাপ ও পাস্তুরিত পাল্প ভালোভাবে মেশানো হয় ও এতে সোডিয়াম বেনজয়েট সামান্য পানিতে গুলিয়ে যোগ করা হয়।

ছ. এরপর প্রস্তুতকৃত স্কোয়াশ জীবাণুমুক্ত শুষ্ক বোতলের পুরোপুরি ভরে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করা হয়।

জ. বোতলের বাইরের দিক ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে ভালোভাবে মুছে নেয়া হয় ও শুকিয়ে লেবেল লাগনো হয়।

ঝ. সবশেষে স্কোয়াশ শুষ্ক ও ঠাণ্ডা কক্ষে গুদামজাত করা হয়।

মার্মালেড : এর প্রস্তুত প্রণালি জেলির মতোই। ফলের টুকরা বা ফলের খোসা মিশ্রিত জেলিকেই মার্মালেড বলে। কমলালেবুর মার্মালেডের ফলে পাকা ত্বকের চিকনভাবে কাটা ফালি (২ সে.মি. লম্বা ও ১ সে.মি. পুরু) জেলীর সাথে মিশ্রিত করে দেয়া হয়। এতে জেলী খাওয়ার নতুন স্বাদ তৈরি হয়। কমলা লেবুর ত্বকের তিতা উপাদান দূর করার জন্য এটি ব্যবহারের পূর্বে ফুটন্ত পানিতে ১০-২০ মিনিট জাল দিয়ে নিতে হয়। আমের মার্মালেডে আমের ত্বক ৫-১০ মিনিট জাল দিলেই চলবে। কাঁঠালের ত্বকের নিচের শক্ত অংশ বাদ দিয়ে চিকন চিকন ফালি করে ৪-৫ মিনিট জাল দিয়ে পরে জেলীর সাথে মিশিয়ে দিয়ে মার্মালেড বানানো যাবে।

৪.৪ আমের মোরব্বা ও ক্যান্ডি

কাঁচা আমের মোরব্বা : আমের মোরব্বা অত্যন্ত সুস্বাদু মজাদার মিষ্টি জাতীয় খাদ্য। কাঁচা আম মাত্র বাত্তি হয়েছে বা আমের আঁটি মাত্র শক্ত হয়েছে এরূপ আম মোরব্বা করার জন্য উপযুক্ত। মোরব্বা তৈরির উপকরণ নিম্নে দেয়া হলো –

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| খোসা ও আঁটি ছাড়ানো কাঁচা আম | ১ কেজি |
| চিনি | ১ কেজি |
| আদা | ৫ গ্রাম |
| এলাচ | ৫ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিড | ৫ গ্রাম |
| আইসিং সুগার | ১৫০ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : আমের মোরব্বা তৈরির উপকরণগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণের সংগ্রহ করতে হবে। দোষমুক্ত পুষ্ট ও সবেমাত্র বাত্তি হয়েছে এরূপ পরিপক্ব কাঁচা আম সংগ্রহ করতে হয়। পরিষ্কার পানি দিয়ে আমগুলো ধুয়ে নিতে হয় এবং বোঁটা ছাড়িয়ে নিতে হয়। স্টেইনলেস স্টিলের ছুরির সাহায্যে আমের উপরের খোসা এমনভাবে ছাড়াতে হয় যেন সবুজ আঁশ না থাকে। খোসা ছাড়ানো আমাগুলোকে দুইভাগ করে ভিতরের আঁটি ফেলে দিতে হয়। শতকরা ৩ ভাগ লবণ দ্রবণে (৩ ভাগ লবণ+৯৭ ভাগ পানি) আমের টুকরাগুলো ৩-৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে যেন তিতা ভাবটা কেটে যায়। তারপর পরিষ্কার পানি দিয়ে আমগুলো ধুতে হয়। খেজুরের কাঁটা বা কাটা চামচ দিয়ে আমগুলো ছিদ্র করতে হয় যাতে আমের ভিতরের অংশে চিনির সিরাপ টুকতে পারে। এরপর আমের টুকরাগুলো ভিজিয়ে রাখতে হয়। তখন ঘরের তাপমাত্রা ২৫$^{0}$ C হলে ভালো হয়। ভিজানো আমের টুকরাগুলো পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে ছিদ্রযুক্ত পাত্রে রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। ফুটন্ত পানিতে আমের টুকরাগুলো ২-৩ মিনিট ব্লাঞ্চিং করতে হয় অর্থাৎ এমনভাবে জ্বাল দিতে হয় যেন আমের টুকরাগুলো সাদা রং ধারণ করে। শতকরা ৩০ ভাগ চিনির দ্রবণে (৩০ গ্রাম চিনি+ ৭০ মিলি লিটার পানি) আমের টুকরাগুলো চুলায় জ্বাল দিতে হয় এবং চুলা থেকে নামিয়ে এক রাত রেখে দিতে হয়। পরদিন সাইট্রিক এসিড, আদা ও এলাচ দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। সিরাপ ঘন হয়ে এলে পরীক্ষা করতে হয়। রিফ্রাক্টোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে সিরাপের টিএসএস শতকরা ৭০ ভাগ এলে চুলা হতে দ্রবণ নামিয়ে বাতাসে ঠাণ্ডা করতে হবে। চুলার জ্বাল দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন

নিচের অংশ পুড়ে না যায়। আমের মোরব্বাগুলো সিরাপ থেকে আলাদা করে টিস্যু পেপার বা পাতলা কাপড়ের সাহয্যে সিরাপ মুছে ট্রেতে আইসিং সুগার দিয়ে মোরব্বা মাখিয়ে নিতে হয়।

চিত্র : আইসিং চিনি মাখিয়ে মোরব্বা বোতলে ভরা

চিত্র : আমের ক্যান্ডি

## ক্যান্ডি

ক্যান্ডিও একধরনের মোরব্বা। এটি সিরা ছাড়া শুকানো অবস্থায় সংরক্ষিত হয়। এজন্য ক্যান্ডিতে মোরব্বার চেয়ে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে। অর্থাৎ ৭৫% থাকে। এ চিনি কনার আকারে যাতে বের হতে না পারে সেজন্য চিনির সিরা তৈরিতে আখের চিনি ও গ্লুকোজ ৩.১ অনুপাতে ব্যবহার করা হয়। গ্লুকোজের বদলে কর্ন সিরাপও ব্যবহার করা যায়। এসব পাওয়া না গেলে ০.১% এসিটিক এসিড যোগ করতে হয়। আনারস, কমলালেবু, আদা, আম ইত্যাদি হতে প্রচুর ক্যান্ডি তৈরি করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালি : পুরোপুরি পাকেনি অথচ বেশ পুষ্ট হয়েছে ও বোঁটার নিকট হলুদ রং ধরেছে এরূপ আম বেছে নিতে হবে। মোরব্বার মতো আম ছিলে ধুয়ে ও আঁটি ফেলে শাঁস লম্বা করে কেটে ফলের গায়ে ছিদ্র করতে হবে। এরপর ৩০° ব্রিক্স এর রসের আমগুলো ১০-১৫ মিনিট ধরে জাল দিয়ে ২৪ ঘন্টা কাল ঐ সিরাপে ফলের টুকরা রেখে দিতে হবে। এরপর প্রতিদিন নতুন চিনি মিশিয়ে ৫০° ব্রিক্স করে সিরাপ ঘনত্ব বাড়ানো, ৫ মিনিট জ্বাল দেয়া এবং এরপর ২৪ ঘন্টা রেখে দেয়া। এ প্রক্রিয়ায় ৬০° ব্রিক্স ঘনত্ব পর্যন্ত এ কাজগুলো করে যেতে হবে। এরপর একদিন পরপর ঐ একই প্রক্রিয়ায় ৫০° ব্রিক্স করে সিরার ঘনত্ব বাড়িয়ে ৭৫° ব্রিক্স পর্যন্ত নিতে হবে। শেষ ২৪ ঘন্টা পার হলে চিনির সিরা থেকে আমের টুকরা উঠিয়ে ফুটন্ত পানিতে কয়েক সেকেন্ড ডুবিয়ে নিয়ে পরিষ্কার কাগজের উপর বিছিয়ে দিতে হবে এবং একটি ট্রেতে নিয়ে ১৪-১৫ ঘন্টা শুকাতে হবে। অথবা ড্রায়ারের ৬০-৬৫° সে. তাপে ৮ ঘন্টা শুকালে ক্যান্ডি প্রস্তুত সেলোফেন শিটে মুড়ে কাগজের তৈরি কার্টনে ভরে রাখতে হবে। ক্যান্ডিতে চিনি বেশি বিধায় বাতাস থেকে যেন আর্দ্রতা শোষণ করতে না পারে সেজন্য বায়ুরোধী বা আর্দ্রতা নিরোধক পাত্রে রাখতে হবে।

## ৪.৫ আমের আচার ও চাটনী

(ক) আমের আচার : ঝাল ও মিষ্টি: আমের আচার আচারের জগতে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সব ধরনের লোকের জন্য আমের আচার একটি অতি লোভনীয় ও উপাদেয় খাবার। ব্যবসাভিত্তিক আচার তৈরির সাথে ছোট-বড় অনেক কোম্পানি জড়িত। ঘরোয়া পরিবেশে

আচার তৈরি করে অনেকে আয় বর্ধনমূলক ব্যবসা করছে। সাধারণত কাচের বোতলে আচার ভরে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশি প্রক্রিয়াজাতকারী কোম্পানিগুলো দই ধরনের আমের আচার তৈরি করে থাকে। ঝাল ও মিষ্টি। এগুলোর উৎপাদন কৌশল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

আচার তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র : ক) সসপ্যান বা ডেকচি, খ) কাঠের বড় নাড়ানি, গ) গামলা বালতি, ট্রে, ছোট চামচ , মগ ও জগ ঘ) পরিষ্কার প্লাস্টিকের ড্রাম, ঙ) বোতল ও ক্যাপ, চ) সিলিং মেশিন, ছ) পরিষ্কার করার জন্য কাপড়ের ছোট ছোট টুকরা ও জ) লেবেল ইত্যাদি।

আমের ঝাল আচার

| উপকরণ | পরিমাণ | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| আমের টুকরা | ৫ কেজি | মৌরী | ২২ গ্রাম |
| চিনি | ৪৪ গ্রাম | মেথি | ৭ গ্রাম |
| রসুন | ৩১ গ্রাম | কালজিরা | ৪ গ্রাম |
| আদা | ১৩ গ্রাম | সারিষা | ৪৮ গ্রাম |
| জিরা | ১৩গ্রাম | শুকনা মরিচ (গুঁড়া) | ৮৮ গ্রাম |
| ধনে | ১৩ গ্রাম | হলুদ (গুঁড়া) | ২২ গ্রাম |
| জেন | ১৩ গ্রাম | সরিষার তেল | ২ লিটার |
| | | অ্যাসিটিক এসিড/ ডিনেগার / লবণ | ৪৮ মিলিলিটার |

প্রস্তুত প্রণালি

ক. লবণের দ্রবণে ডুবানো আমের টুকরাগুলো অথবা শুকনা লবণমিশ্রিত পানি ঝরা আমের টুকরাগুলো পানিতে একবার ধুয়ে আবার পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়। ডোবানোর ফলে আমের টুকরার ভেতরের লবণ আস্তে আস্তে বের হয়ে আসতে বেশ কিছু সময় লাগতে পারে। জিহ্বায় নিয়ে মাঝে মাঝে টুকরাগুলোর লবনাক্ততা পরীক্ষা করা হয়। যখন সামান্য লবণ মনে হবে তখন পানি থেকে টুকরাগুলো তুলে পানি ঝরায়ে নিতে হয় এবং দরকার অনুযায়ী মেপে নেয়া হয়।

খ. অন্যসব উপকরণ পৃথক পৃথকভাবে মাপা হয় ।

গ. মশলাগুলো চুলাতে হালকাভাবে ভেজে গুঁড়া করা হয় (কালিজিরা ছাড়া)।

ঘ. সরিষার তেল চুলায় নিয়ে ফুটানো হয়।

ঙ. তেল ফুটলে আদা ও রসুনবাটা যোগ করে নাড়তে হয় (অর্ধভাজা পর্যন্ত)।

চ. আমের টুকরাগুলো যোগ করে নেড়ে মেশানো হয়।

ছ. আবার যখন তেল ফুটতে শুরু করবে তখন কালিজিরা ও জিরা ছাড়া সকল মশলা যোগ করে নাড়া হয়।

জ. এভাবে প্রায় এক থেকে দু'ঘণ্টা জ্বাল দেওয়া লাগতে পারে।

ঝ. শেষ পর্যায়ে চিনি যোগ করা হয়।

ঞ. চিনি গলে যাবার পর জিরা ও কালিজিরা যোগ করা হয়।

ট. যখন আচারের গন্ধ বের হতে থাকবে তখন চুলা নিভিয়ে দেওয়া হয় অথবা আচার চুলা থেকে নামিয়ে নেয়া হয়।

ঠ. এরপর অ্যাসিটিক এসিড যোগ করা হয়।

ড. শুষ্ক পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলে আচার ভরা হয়।

ঢ. বোতলের মুখে ক্যাপ লাগিয়ে সিল করা হয়।

ণ. বোতলের গায়ে লেগে থাকা আচার কাপড় দিয়ে মুছে নেয়া হয়।

ত. তৈরির তারিখ সম্বলিত লেবেল লাগিয়ে শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও আলোবিহীন ঘরে আচার গুদামজাত করা হয়।

ঝাল আচার বোতলে ভরার নিয়ম হলো, আচার বানানো শেষ হবার পর উপর থেকে তেল তুলে নিয়ে আলাদা পাত্রে রাখা হয়।

আমের আচার বোতলে গলা পর্যন্ত ভালোভাবে ভরে তার উপর পৃথক করে রাখা তেল পরিমাণমতো যোগ করা হয়। যাতে আচার তেলে ডুবে থাকে।

আমের মিষ্টি আচার

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| আমের টুকরা | ৫ কেজি |
| চিনি | ৪-৫ কেজি |
| রসুন | ৩৭ গ্রাম |
| আদা | ৭৫ গ্রাম |
| পিয়াজ | ৭৫ গ্রাম |
| অ্যাসিটিক এসিড | ৫২.৫ মিলিলিটার |
| সাইট্রিক এসিড | ২.৫ গ্রাম |
| কে.এম.এস | ২.৫ গ্রাম |
| ম্যাংগো ফ্লেভার | ৫.৪ মিলিলিটার (ঐচ্ছিক) |
| মোম | পরিমাণমতো |
| লবণ | পরিমাণমতো |
| মরিচের গুঁড়া | সামান্য |
| (পোস্তাদানা, দারুচিনি ও জয়ত্রী ) | পরিমাণমতো |

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র : ঝাল আচারের মতোই।

প্রস্তুত প্রণালি

ক. লবণ মেশানো আমের টুকরাগুলোকে পানি দিয়ে এমনভাবে ধোয়া হয় যাতে অল্প লবণাক্ততা থাকে। তারপর পানি ঝরিয়ে টুকরাগুলো মেপে নেওয়া হয়।

খ. অন্যান্য উপকরণগুলো আলাদা আলাদা মেপে নেওয়া হয়।

গ. রসুন আদা ও পিঁয়াজ খোসা ছাড়িয়ে বেটে নেওয়া হয়।

ঘ. চিনি পরিষ্কার করে আমের টুকরার সাথে মিশিয়ে চুলায় দেওয়া হয়।

ঙ. চিনি গলে গেলে মরিচের গুঁড়া, রসুন, আদা ও পিঁয়াজবাটা যোগ করে নেড়ে মেশানো হয়।

চ. যখন চিনি কিছুটা আঁশ আঁশ হবে তখন চুলা থেকে আচার নামিয়ে ফেলা হয়।

ছ. অ্যাসেটিক এসিড , সাইট্রিক এসিড, কেএমএস ও ফ্লেভার যোগ করে মেশানো হয়।

জ. শুষ্ক পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলে আচার ঢালা হয়।

ঝ. মোম গুলিয়ে আচারের উপরিভাগে যোগ করা হয়।

ঞ. বোতলের মুখে ক্যাপ লাগিয়ে বোতলের বাইরের দিকটা ন্যাকড়া দিয়ে ভালোভাবে মুছে নেওয়া হয়।

ট. শুষ্ক ঠাণ্ডা ও আলোবিহীন ঘরে আচার গুদামজাত করা হয়।

ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানগুলোর কাজ :

ক. অ্যাসিটিক এসিড বা ভিনেগার- আচারে সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

খ. কে.এম.এস: পূর্ণরূপ হচ্ছে পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইট। এটি একটি শক্তিশালী সংরক্ষক।

গ. চিনি : মিষ্টির পরিমাণ বাড়ায় এবং মিষ্টি আচারে এটি প্রধান সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

ঘ. মশলা : আচারের স্বাদ ও ঘ্রাণ নির্ভর করে কী ধরনের এবং কী অনুপাতে মশলা ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর। মসলা সংরক্ষণ হিসেবেও কাজ করে।

ঙ. লবণ: স্বাদ বৃদ্ধি করে এবং সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

চ. মোম : বায়ুস্থিত অণুজীবকে খাদ্যের সংস্পর্শে আসতে বাধা প্রদান করে।

(গ) কাঁচা আমের চাটনি :

ভিনেগার , লবণ, মসলা ও তেল সহযোগে সংরক্ষিত ফল ও সবজিকে আচার, চাটনি ও কাসুন্দি বলা হয়ে থাকে। যদিও এ তিনটির মধ্যকার ব্যবধান সুস্পষ্ট নয়। সাধারনত অপক্ব বা অর্ধপক্ব ও টক ফল দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়। আমের চাটনি তৈরিতে কাঁচা আমের শুকানো ফালি ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এই ফালি নানাবিধ টক তরকারি রান্নায় ব্যবহার করা যায়। সিরকা বা ভিনেগার, লবণ ও মসলা সংরক্ষিত দ্রব্যকে কেবল পচনের হাত থেকে রক্ষা করে না। এগুলো চাটনির মুখরোচক স্বাদের জন্যও দায়ী । চিনি যোগ করে এগুলোকে মিষ্টি ভাবাপন্ন করা যায়। পুষ্টি মূল্যের দিক দিয়ে চাটনি জাতীয় খাদ্য তেমন গুরুত্ব বহন করে না কিন্তু সামান্য পরিমাণে যোগ করে অন্যান্য খাদ্যের সাথে স্বাদ বৃদ্ধিতে এগুলো তুলনাহীন । অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের তুলনায় চাটনি তৈরি করা অনেক সহজ কাজ ও কম ব্যয়বহুল। যে কেউ এগুলো ঘরে বসে তৈরি করতে পারে। নিম্নে কাঁচা আমের চাটনি তৈরির প্রণালি বর্ণনা করা হলো।

কাঁচা আমের চাটনি : চাটনি অর্ধকঠিন জাতীয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্য। চাটনি বিভিন্ন ফল ও সবজি ভিনেগার চিনি বিভিন্ন মসলা ও লবণ সহযোগে তৈরি হয়। বিভিন্ন ধরনের চাটনি, দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে–

১) মিষ্টি চাটনি

২) ঝাল চাটনি ও

৩) টক-ঝাল-মিষ্টি চাটনিই প্রধান

কাঁচা আমের চাটনি জন্য নিম্নলিখিত উপকরণসমূহ প্রয়োজন হবে-

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| কাঁচা আম | ১ কেজি |
| হলুদ | ৫ গ্রাম |
| মরিচ | ৫ গ্রাম |
| আদা | ১০ গ্রাম |
| চিনি | ৩০০ গ্রাম |
| লবণ | ১৫ গ্রাম |
| সরিষা | ৫ গ্রাম |
| পাঁচফোড়ন | ৫ গ্রাম |
| মেথি গুঁড়া | ৫ গ্রাম |
| ভিনেগার | ১৫০ মিলি লিটার |
| সরিষা তেল | ১২৫ মিলি লিটার |
| রসুন বাটা | ১৫ মিলি লিটার |
| সোডিয়াম বেনজয়েট ও কেএমএস | (০.৫ গ্রাম+ ০.৫ গ্রাম) = ১গ্রাম প্রতি কেজিতে |

প্রস্তুত প্রণালি : সর্ব প্রথমে কাঁচা আমের চাটনি তৈরির সবগুলো উপকরণ নির্দিষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করতে হয়। তারপর বাজার হতে পুষ্ট, পরিপক্ক ও দোষমুক্ত কাঁচা আম বাছাই করে নিতে হয়। আমের বোঁটা ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পানিতে কাঁচা আমগুলো ধুয়ে নিতে হয়। আমের খোসা বা বাকল ও বিচিসহ আঁটি ফেলে দিয়ে প্রতিটি আমকে আট টুকরা করে প্রায় সমানভাবে কাটতে হয়। আমের টুকরাগুলোকে ২৫০ মি.লি. পানিতে সিদ্ধ করে ছেঁকে নিতে হবে। সিদ্ধ কাঁচা আমের টুকরাগুলো কাঠের চামচের সাহায্যে পিষে মণ্ড তৈরি করতে হয়। ভিনেগারে আদা বাটা, মরিচের গুঁড়া, রসুন বাটা ও মেথি গুঁড়া মিশিয়ে নিতে হয়। চুলাতে সসপেন বা কড়াই বসিয়ে সরিষার তেল গরম করে আস্ত সরিষা ছেড়ে দিতে হয়। গরম তেলে সরিষা ফেটে যাওয়ার পর ভিনেগার মিশ্রিত মশলা কড়াই বা সসপেন এ ঢেলে বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। কাঁচা আমের চাটনি যখন অর্ধকঠিন বা জ্যামের মতো হবে। তখন চুলা হতে নামিয়ে প্রতি কেজিতে ১ গ্রাম (০.৫ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট +০.৫ গ্রাম পটাশিয়াম মেটাবাই সালফেট বা কেএমএস) সংরক্ষণ দ্রব্য মিশাতে হয়। চাটনি রাখার জন্য কাঁচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফুটন্ত গরম পানিতে ৫মিনি. ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয় এবং পানি ঝরিয়ে ফেলতে হয়।

চিত্র : কাঁচা আমের চাটনি

২০২০

জীবাণুমুক্ত বোতলে চাটনি ভরে বায়ুশূন্যভাবে বোতলের ছিপি আটকিয়ে দিতে হয়। শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার জায়গায় বোতলগুলো রেখে ঠাণ্ডা করার পর প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত লেবেলিং করতে হবে।

৪.৬ আম ও কাঁঠালের সত্ত্ব বা লেদার (Mango Lether)

যেসব ফল থেকে পাল্প পাওয়া যায় সে সব ফলের সত্ত্ব বা লেদার তৈরি করা যেতে পারে। আম থেকে আমসত্ব তৈরি আমাদের দেশে একটি সুপরিচিতি পদ্ধতি। অন্যান্য ফল থেকে যেমন- কাঁঠাল, পেয়ারা , বেল, তাল, আনারস ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। লেদার তৈরির পদ্ধতি খুবই সহজ ও নিরাপদ। ফলের পাল্প শুকানো হয় রোদে, সোলার ড্রায়ারে বা কৃত্রিম ড্রায়ারে। আমসত্ব বা আমের লেদার তৈরি পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো-

আমের লেদার তৈরির উপরকণসমূহ নিম্নরূপ

| উপকরণসমূহ | পরিমাণ |
|---|---|
| পাকা আমের পাল্প | ৩ কেজি |
| চিনি | ৩০ গ্রাম |
| কেএমএস | ২ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিড বা সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |
| সরিষার তেল | ২০ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে পরিপক্ব, দোষমুক্ত, পরিপুষ্ট ও অক্ষত পাকা আম নির্দিষ্ট পরিমাণে পাল্প তৈরির জন্য সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ব, কালচে, পোকাধরা, শিলপড়া ইত্যাদি আমগুলো বাছাই করে বাদ দিতে হয়। পরিষ্কার পানিতে আমগুলো ধুয়ে নিতে হয় যেন কোন ধুলা বালি কিংবা অন্য কোন ক্ষতিকর বস্তু বা জীবাণু না থাকে হাতের সাহায্যে অথবা স্টেইনলেস স্টিলের ছুরির সাহায্যে আমের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়।

আম টুকরা করে কেটে আঁটি বাদ দিয়ে ব্লেন্ডারে রস বা পাল্প তৈরি করা যায়। ব্লেন্ডারে রস তৈরি জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বেশি ভালো হয়। অথবা হাতে চিপেও রস বা পাল্প বের করা যায়। বাঁশের চালুনির সাহায্যে পাল্প ছেকে নিতে হবে যাতে আমের আঁশ না থাকে। আমসত্ত্বের রঙ বেশি দিন ভালো রাখার জন্য মধ্যম তাপে (৯০$^0$ C) তিন মিনিট আমের রস বা পাল্প উত্তপ্ত করতে হয়। জ্বাল দেওয়া আমের রস বাতাসে ঠাণ্ডা করতে হয়। আমের রস যদি মিষ্টি হয় তবে সাইট্রিক এসিড আর যদি টক হয় তবে চিনি যোগ করতে হয়। তারপর হালকা তাপে পাঁচ মিনিট রস বা পাল্প জ্বাল দিতে হয়। আমসত্ত্বের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও উজ্জ্বল টাটকা রঙের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে পটাশিয়াম মেটাবাই-সালফেট মিশাতে হয়। পরিষ্কার বাঁশের ডালায় অথবা স্টেইনলেস ট্রে বা শিটে সরিষার তেল ছোট পরিষ্কার ন্যাকড়া বা কাপড়ের সাহয্যে অথবা হাতের সাহায্যে মাখাতে হয়। এর পর ট্রে বা ডালায় আমের ঘন রস ঢালতে হয়। কাঠের চওড়া ও পাতলা চামচের সাহায্যে রসগুলো ডালা বা ট্রেতে ১ সে.মি. পুরু করে রস ঘন রস ঢালতে হয়। কাঠের চওড়া ও পাতলা চামচের সাহায্যে রসগুলো ডালা বা ট্রেতে ১ সে.মি পুরু করে রস বিছিয়ে নিতে হয়। বাঁশের ডালা ও স্টিলের ট্রেগুলো সরাসরি সূর্যালোকে অথবা সোলার ড্রায়ারে শুকানো হয়। সোলার ড্রায়ার শুকালে আমসত্বের গুণগত মান বেশি ভালো হয়।

সূর্যের আলোতে শুকাতে ৮-১০ দিন সময় লাগে। এইভাবে এক স্তর আমের রস সূর্যালোকে আরেক স্তর আমের রসের প্রলেপ দিতে হয় এবং পর্যায়ক্রমে আমের রসের স্তর দিয়ে ১ সে.মি. পুরু করে শুকাতে হয়।

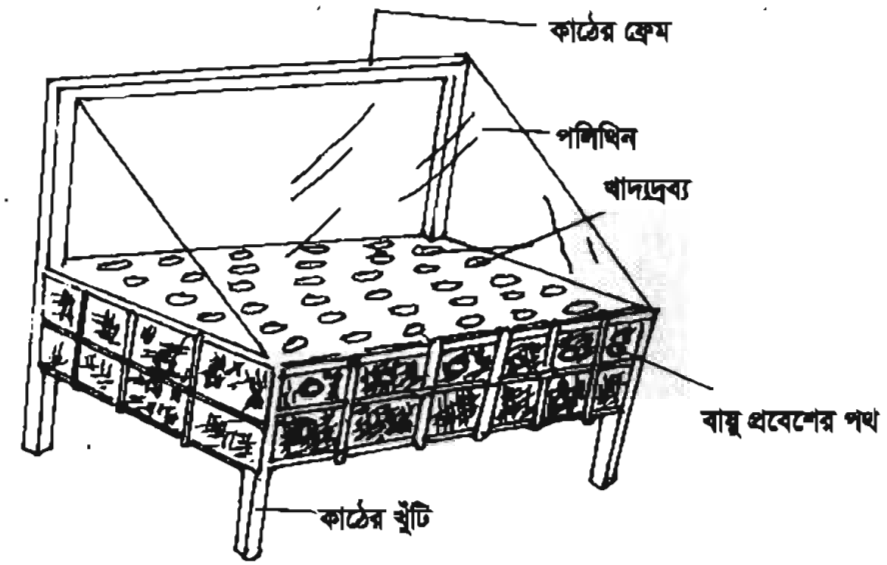


৮-১০ দিন ভালো করে শুকানোর পর আমসত্ত্বের ট্রে থেকে আমসত্ত্ব তুলে দুই পিঠে তেল মেখে নির্দিষ্ট সাইজে কেটে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত পলি প্রোপাইলিন ব্যাগে বাজারজাত করতে হয়।

কাঁঠালসত্ত্ব বা কাঁঠালের লেদার : পাকা কাঁঠালের বীজবিহীন কোয়া কিছু পানি সহযোগে ব্লেন্ডিং মেশিনে ব্লেন্ডিং করে পাল্প তৈরি করা হয়। উক্ত পাল্প ব্যবহার করে আমসত্ত্বের মতো একই পরিমান বিভিন্ন উপাদান যোগ করে ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে কাঁঠালসত্ত্ব তৈরি করা যেতে পারে। তবে এখানে ৫-১০ গ্রাম সাইট্রিক এসিড যোগ করা হয়ে থাকে।

কাঁঠালসত্ত্ব

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| কাঁঠালের পাল্প | ১ কেজি |
| চিনি | ২৫০ গ্রাম |
| স্টার্চ | ২৫-৩০ গ্রাম |
| কেএমএস | ০.৬ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি

ক. পাকা কাঁঠালের বীজবিহীন কোয়া সামান্য পানি যোগে ব্লেন্ডিং করে ছেঁকে আঁশজাতীয় পদার্থ দূর করা হয়।

খ. পাল্প ও চিনি একসাথে মিশিয়ে ফুটিয়ে নেয়া হয়।

গ. কিছুক্ষণ পর স্টার্চ সামান্য পানিতে গুলিয়ে পাল্পে যোগ করে মেশানো হয়।

ঘ. চুলা বন্ধ করে কেএমএস দ্রবণ (পানিতে) মিশ্রণে যোগ করা হয়।

ঙ) ট্রেতে গরম মিশ্রণ পাতলা করে বিছানো হয় ও ঠাণ্ডা হলে ড্রায়ারে ঢুকানো হয়। ড্রায়ারের তাপমাত্রা ৫০-৬০ সে. বজায় রাখা হয়। শুষ্ককরণ সম্পন্ন হতে পায় ১০-১২ ঘণ্টা সময় লাগে।

চ. শুকানো শেষে ঠাণ্ডা করে মোড়কে ভরা হয়।

# অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আমকে কেন ফলের রাজা বলে?
২. বাংলাদেশের ও ভারতের কোন জেলা দুটিতে ভালো আম উৎপাদন হয়?
৩. বাংলাদেশে কোন কোন জাতের আম উৎপন্ন হয়ে থাকে?
৪. আম ও কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
৫. কোন কোন দেশে কাঁঠালের চাষ হয়ে থাকে?
৬. হিমাগারে কাঁঠাল কতদিন রাখা যায়?
৭. আমে কতটুকু বিটা-ক্যারোটিন থাকে?
৮. বিটা-ক্যারোটিন শরীরে গিয়ে কোন ভিটামিনে রূপান্তরিত হয়?
৯. মৌসুমে পাকা আম খেলে তা কোথায় জমে এবং কতদিন থাকে?
১০. কাদের কে আম খেতে নিষেধ করা হয়?.
১১. কাঁঠালের বিচি হতে কী কী খাবার তৈরি করা সম্ভব?
১২. আমের নেকটার ও জুসের মধ্যে পার্থক্য কী?
১৩. চিনির সিরায় কী কী ফল ও সংরক্ষণ করা যায়?
১৪. চিনির সিরার ব্রিক্স বা TSS এর মাত্রা কত ডিগ্রি হবে?
১৫. আমের জ্যামে TSS বা ব্রিক্স এর মাত্রা কত রাখা উচিত?
১৬. আমের জেলিতে কাঁচা আম ব্যবহার করলে কী বেশি দিতে হয়?
১৭. জেলির TSS কত হলে চুলা হতে নামিয়ে নিতে হয়?
১৮. কাঁঠালের স্কোয়াশে যে সিরাপ যোগ করা হয় তা কী দিয়ে তৈরি হয়?
১৯. মার্মালেড কী?
২০. আমের মোরব্বার TSS কত হতে হয়?
২১. আম ছিলে ও কেটে শুকানোর পূর্বে কী করতে হয়?
২২. ঝাল আম আচারের কাচের বোতলে তেল ভরার নিয়ম কী?
২৩. এসিটিক এসিড বা ভিনেগার আচারে কী হিসেবে কাজ করে?
২৪. লবণ ও চিনি আচারে কী হিসেবে কীভাবে ব্যবহার হয়?
২৫. আচার তৈরিতে আমের টুকরাগুলো কীভাবে ব্যবহার হয়?
২৬. আমসত্ত্বের মতো অন্যান্য কোন ফল হতে তা তৈরি করে?
২৭. আমসত্ত্বের রঙ বেশি দিন ভালো রাখার জন্য কী করতে হয়?
২৮. আমসত্ত্ব তৈরিতে কয়বার আমের রসে শুকাতে হয়?
২৯. আমসত্ত্ব ও কাঁঠাল সত্ত্বের উপকরণের মধ্যে পার্থক্য কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফল হিসেবে আমের পরিচিতি দাও।
২. কাঁঠালের পরিচিতি দাও।
৩. কাঁচা পাকা আমের পুষ্টিজ্ঞানের বর্ণনা কর।
৪. আম ও কাঁঠাল হতে উৎপাদিত খাদ্যের নাম লেখ।
৫. আমের স্কোয়াশ তৈরির সাবধানতা কী কী?
৬. আমের নেকটার কীভাবে তৈরি করে?
৭. কাঁঠালের প্রিজার্ভ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৮. মার্মালেড বলতে কী বোঝায়?
৯. ক্যান্ডি কী?
১০. আমের মিষ্টি আচারে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর কাজ কী?
১১. কাঁঠালের লেদার কীভাবে তৈরি হয়?

রচামূলক প্রশ্ন

১. আম ও কাঁঠালের পরিচিতি দাও।
২. আম ও কাঁঠালের পুষ্টিমান ও ব্যবহার লেখ
৩. আমের স্কোয়াশ, নেকটার ও জুস তৈরির উপাদান ও প্রণালি ও বর্ণনা কর।
৪. আম ও কাঁঠালের জ্যাম, জেলি ও স্কোয়াশ তৈরির উপকরণ ও প্রণালি বর্ণনা কর।
৫. আমের মোরব্বা কাঁঠালের প্রিজার্ভ এবং আমের অসমোটিক শুকানো পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া লেখ।
৬. আমের ঝাল আচার, মিষ্টি আচার, আমের চাটনির উপকরণ ও তৈরির প্রণালি লেখ।
৭. আম ও কাঁঠালের আমস্বত্ত্ব বা লেদার তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

# অধ্যায়-৫
# কলা হতে উৎপাদিত খাদ্য

কলার বৈজ্ঞানিক নাম-Musa Sapientum, ইংরেজিতে-Banana. বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে কলা উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনোভাবে এর ব্যবহার তেমন লক্ষ্য করা যায় না। প্রক্রিয়াজাতকরণ কলাকৌশল ও বাজার চাহিদার অনুপস্থিতি এর জন্য দায়ী। বাজারের চাহিদার উপর ভিত্তি করে যদি উপযুক্ত কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় তবে দেখা যাবে কলা প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায়িক সাফল্যসহ এগোতে পারে।

## ৫.১ কলার পরিচিতি ও পুষ্টিমান

পরিচিতি : কলা এদেশের একটি প্রধান ফল। এটিই একমাত্র ফল যা বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় এবং সকলে খাওয়ার সুযোগ পায়। নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকার ব্যাপকভাবে কলার চাষ হয়। কলা ক্যালরি, খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ এবং কেবল পুষ্টিকরই নয় এর ফলনও অন্যান্য ফল ও সবজি হতে অনেক বেশি। ধান, গম ও মিষ্টি আলু হতে যেখানে হেক্টরপ্রতি যথাক্রমে ১১.২, ৬.৬ ও ৯.৮ লক্ষ কিলো ক্যালরি খাদ্য শক্তি উৎপাদন হয়। সেখানে কলা হতে মাত্র ৫০ লক্ষ কিলো ক্যালরি পাওয়া যায়। কলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে, সারা বছর কলার ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে কলা দুইপর্যায়ে ব্যবহার করা হয়। কাচা অবস্থায় ও পাকা অবস্থায়। কাঁচা কলা সবজি হিসেবে এবং পাকা কলা ফল হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা হয়। প্রক্রিয়াজাতকৃত কলা খুব কমই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চিপস ও মিক্সড ফ্রুট জ্যাম তৈরিতে অনেকে ব্যবহার করে থাকেন।

ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু পণ্য কলা থেকে তৈরি করা যেতে পারে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলার ঝাল ও মিষ্টি চিপস (তেলে ভাজা), মিষ্টি কলার চিপস (ড্রায়ারে শুকানো), কলার জ্যাম , ক্যান্ডি ও স্কোয়াশ। চিপস্ ও ক্যান্ডি পলিথিন মোড়কে এবং জ্যাম ও স্কোয়াশ কাচের বোতলে বাজারজাত করা যেতে পারে।

কলার পুষ্টিমান : পরীক্ষায় প্রাপ্ত কলার পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামের জন্য)

| পাকা কলা পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| পানি | ৬২.৭ গ্রাম | লৌহ | ০.৯ মি.গ্রাম |
| প্রোটিন | ০.৭ গ্রাম | থায়ামিন | ০.১০ মি গ্রাম |
| কার্বহাইড্রেট | ২৫ গ্রাম | রিবোফ্লাভিন | ০.০৫ মি . গ্রাম |
| ফ্যাট | ০.৮ গ্রাম | ভিটামিন সি | ২৪ মি . গ্রাম |
| বিটা-ক্যারোটিন | ৭৮ মাইক্রোগ্রাম | শক্তি | ১০৯ কি. ক্যালরি |
| ক্যালসিয়াম | ১৩ মি. গ্রাম | | |

| কাচা কলা পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| পানি | ৭৮.৭ গ্রাম | লৌহ | ০.৬ মি. গ্রাম |
| প্রোটিন | ২.৬ গ্রাম | থায়ামিন | ০.০৯ মি. গ্রাম |
| কার্বহাইড্রেট | ১৭.৩ গ্রাম | রিবোফ্লাভিন | ০.০৬ মি. গ্রাম |
| চর্বি | ০.৪ গ্রাম | বিটা- ক্যারোটিন | ৩০ মাইক্রোগ্রাম |
| ক্যালসিয়াম | ০ গ্রাম | শক্তি | ৮৩ কি. ক্যালরি |

চিত্র : কলাগাছের কাঁদিসহ কলার ছবি

৫.২ কলার চিপস্ প্রস্তুতকরণ

(ক) কলার মিষ্টি চিপস্ : কিছু কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান কলার চিপস উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দুই ধরনের কলার চিপস হতে পারে- ঝাল ও মিষ্টি। লক্ষ্য করা গেছে যে কলার মিষ্টি চিপস-এর বাজারনির্ভর উৎপাদন সন্তোষজনক হতে পারে। তবে সঠিক মোড়ক ও মোড়কীকরণ পদ্ধতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

উপকরণ : সব কলা চিপস তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে। কাঁচকলা ও সাগরকলা ভালো চিপস্ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| কলা (খোসাছাড়া) | ১ কেজি |
| চিনি | ৫০০ গ্রাম |
| পানি | ৫০০ মি.লি. |
| সয়াবিন তেল | পরিমাণমতো |
| কেএমএস (দ্রবণ) | ০.৩% |

যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র : যেসব যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র কলার মিষ্টি চিপস তৈরিতে প্রয়োজন সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক) চিপস স্লাইসার বা চাকু বা বঁটি ; খ) কড়াই; গ) গামলা; ঘ) সিলিন্ডার বা মাপচোঙ; ঙ) নিক্তি; চ) ছিদ্রযুক্ত নাড়ানি; ছ) পলিথিন সিলিং মেশিন; জ) ট্রে ও ঝ) পলিথিন প্যাকেট ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালি : কলার মিষ্টি চিপস্ তৈরিতে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসৃত হতে পারে-

১. কলা সংগ্রহ : ভালোমানের কাঁচকলা বা সাগরকলা সংগ্রহ করা হয়।

২. খোসা ছাড়ানো: পরিষ্কার পানি দিয়ে কলা ধুয়ে খোসা ছাড়ানো হয়।

৩. স্লাইসিং : ৩ মিলিমিটার পরিমাণ পুরু করে কলাগুলো স্লাইস করা হয়।

৪. সালফাইটিং : ০.৩% কেএমএস অর্থাৎ ১ লিটার পানির মধ্যে ৩ গ্রাম কেএমএস দ্রবীভূত করে সেই দ্রবণে স্লাইসগুলো ১৫-৩০ মিনিট পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়।

৫. তেলে ভাজা : কেএমএস দ্রবণ থেকে স্লাইসগুলো তুলে পানি ঝরানো হয় ও উচ্চ তাপমাত্রার তেলে (১৫০° সে.) ভাজা হয়।

৬. সিরাপে ডুবানো : ৫০% শক্তির চিনির দ্রবণে ভাজা স্লাইসগুলো ৬-১২ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখা হয়।

৭. পুনরায় তেলে ভাজা : সিরাপ থেকে স্লাইসগুলো তুলে রস ঝরিয়ে পুনরায় তেলে ভাজা হয় ও ট্রেতে বিছিয়ে রাখা হয়।

৮. মোড়কে ভরা : চিপস্ ঠাণ্ডা হলে ওজন করে ছোট ছোট পলিথিন প্যাকেটে ভরে সিল করা হয়।

কলার মিষ্টি চিপস্ তৈরির প্রবাহচিত্র :

কলার মিষ্টি চিপস্ তৈরির flow chart :

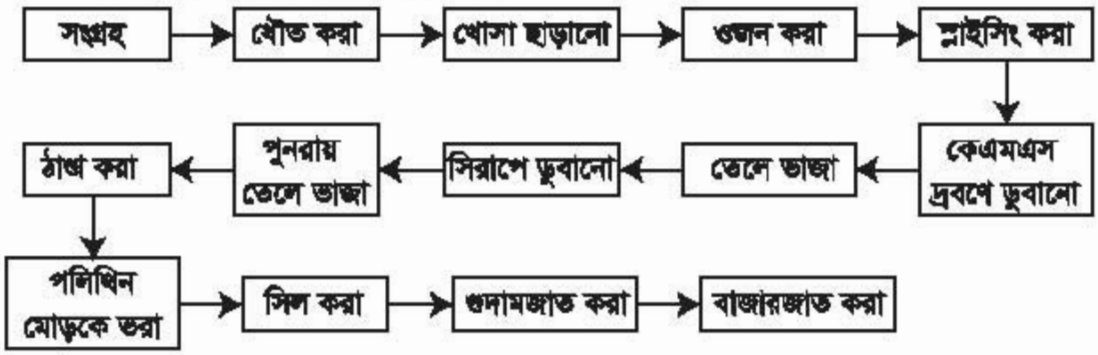


(খ) কলার ঝাল চিপস্

| উপকরণ | পরিমান |
|---|---|
| কলা (খোসাছাড়ানো) | ১ কেজি |
| তেল (ভাজার জন্য) | ১ লিটার |
| এসিটিক এসিড | ১০০ মি.লি |
| বিট লবণ (গুড়া) | ৪ গ্রাম |
| টেস্টিং সল্ট | ২ গ্রাম |
| গরম মসলা (গুঁড়া) | ৩ গ্রাম |

চিত্র : কাচ কলার চিপস্ তৈরি

প্রস্তুত প্রণালি :

ক. পরিপক্ব কলা নির্বাচনা করা হয়।

খ. কলা পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে খোসা ছাড়ানো হয় এবং প্রায় আধা ঘণ্টা এসিটিক এসিড মিশ্রিত পানির দ্রবণে (ভিনেগার) ডুবিয়ে রাখা হয়।

গ. খোসা ছাড়ানো কলাগুলো ভিনেগার থেকে তুলে স্লাইসারের সাহায্যে পাতলা করে কাটা হয় এবং ফুটন্ত তেলে (সয়াবিন অথবা পাম) বাদামি করে ভাজা হয়।

ঘ. ভাজা টুকরাগুলোর সাথে বিটলবণ, টেস্টিং সল্ট ও গরম মসলা গুঁড়া মেশানো হয়।

ঙ. চিপ্‌স ঠাণ্ডা পলিথিন প্যাকেটে ভরে সিল করা হয়।

(গ) বিশুষ্ক কলার চিপস্ : এক্ষেত্রে পাকা কলা নির্বাচনা করা হয়, তবে কলা বেশি পাকা হবে না। খুব পাতলা করে কলার স্লাইস করা হয়। তারজালি নির্মিত ট্রেতে স্লাইসগুলো বিছানো হয় এবং ড্রায়ারে টুকানো হয়। মচমচে হওয়া পর্যন্ত ড্রায়ারে শুকানো হয়।

(ঘ) কলার চিপস্ সংরক্ষণ : কলার চিপস্ তৈরি করে ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। প্রয়োজনের সময় তা ভেজে পরিবেশন করা যায়। এর উপকরণগুলো হলো–

| উপকরণসমূহ | পরিমাণ |
|---|---|
| খোসা ছাড়ানো সাগর কলা | ২টি |
| তেল | ৬০ গ্রাম |
| লবণ | ২.৫ গ্রাম |
| চিনি | ১২৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : হালকা গরম পানিতে লবণ গুলে নিতে হয়। মাঝারি আকৃতির পুষ্ট কলা সংগ্রহ করে তা ছিলে নিতে হয়। কলা স্লাইসার দিয়ে পাতলা করে কেটে লবণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ছাকনি দিয়ে কলার স্লাইসগুলো ছেঁকে পানি ঝরিয়ে ফেলতে হয়। থালা বা ডালায় রেখে তা রোদে শুকাতে দিতে হয়। শুকিয়ে মচমচে ভাজা গরম চিপসে চিনি পরিবেশন করতে হয়।

কলার চপ: আলুর চপের মতো কলার চপ ও একটি মজাদার খাবার। প্রতিদিন আলু চপের পরিবর্তে একদিন কলার চপ পরিবেশন করে বৈচিত্র আনা যায় কলার চপের উপকরণগুলো নিম্নরূপ–

| উপকরণ | পরিমাণ | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| কাঁচা কলা | ৪টা | পেঁয়াজ বাটা | পরিমাণমতো |
| শুকনা মরিচ | পরিমাণমতো | জিরা | পরিমাণমতো |
| হলুদ বাটা | পরিমাণমতো | ডিম | ২টি |
| আদা বাটা | অল্প | লবণ | পরিমাণমতো |
| রসুন বাটা | অল্প | সয়াবিন তেল | ৫০ গ্রাম |
| ধনে বাটা | সামান্য | | |

প্রস্তুত প্রণালি : চুলায় হলুদ ও পানি দিয়ে কড়াই বসাতে হবে। কাঁচাকলা খোসাসহ টুকরা করে কড়াইতে দিতে হবে। সিদ্ধ হলে কলার খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। পরিমাণ মতো সব বাটা মসলা ও লবণ সিদ্ধ কলার সাথে চটকাতে হবে। এর সাথে দুটো ডিমও ভালোভাবে মিশিয়ে খামিরের মতো তৈরি করতে পারবে। এই খামির হতে অল্প পরিমাণ নিয়ে চপ এর আকৃতি করে গরম তেলে ভেজে নিলেই কলার চপ হয়ে যাবে।

এই চপ আবার রান্নাও করা যায়। গরম ঘি এ পেঁয়াজ কুচি ভেজে মরিচ বাটা, ধনে ও জিরা বাটা, আদা রসুন বাটা, অল্প পেঁয়াজ বাটা ও সামান্য হলুদ বাটা দিয়ে কষাতে হবে, তারপর টক দিতে হবে। এরপর গরম মশলা দিতে হবে। সমস্ত মশলা কষালে সুগন্ধ বের হলে অল্প পানি দিতে হবে। এরপর ভাজা চপ ও পরিমাণতো লবণ দিতে হবে। সকল উপকরণ মাখামাখি হলে নামিয়ে নিতে সাবধানে চপ নাড়তে হবে যাতে চপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে না যায়।

৫.৩ কলা থেকে পিঠা তৈরি :

(ক) পাকা কলার পিঠা : এটি নতুন ধরনের পিঠা যা মেহমানদের পরিবেশন করে নাস্তায় বৈচিত্র আনা যায়। এর উপরকরণগুলো হলো-

| উপকরণসমূহ | পরিমাণ |
|---|---|
| খোসা ছাড়ানো সাগর কলা | ২টি |
| ময়দা | ৬০ গ্রাম |
| গুড় বা চিনি | ৩০ গ্রাম |
| তেল | ৬০ মি.লি |
| পানি | পরিমাণমতো |

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথম পাকা কলা ছিলে স্লাইসার দিয়ে ১-২ সেমি. পুরু করে পাতলা স্লাইস করে নিতে হয়। ময়দা, চিনি ও পানি মিশিয়ে পাতলা লেইয়ের মতো খামির তৈরি করতে হয়। চুলায় তেল গরম হলে একটার পর পিঠা বাদামি রং না হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হয়। ভাজা পিঠা ঝাঁঝরিতে করে তেল ঝরিয়ে রাখতে হয়। পিঠাগুলো টিস্যু পেপারের উপর রাখলে তেল শুষে নেওয়ার পর পরিবেশন করতে হয়।

(খ) কলার বড়া পিঠা : এ পিঠা অত্যন্ত জনপ্রিয়। দেশের সকল এলাকায় এটি প্রচলিত। পিঠাটি বানানো খুবই সহজ। এর উপকরণগুলো নিম্নরূপ–

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| খোসা ছাড়ানো কলা | ৬টি |
| ময়দা | ৫০০ গ্রাম |
| গুড় বা চিনি | ১০০ গ্রাম |
| তেল | ১০০ এম. এল. |
| নারিকেল কোরা | ১টি |
| পানি | পরিমাণমতো |
| দুধ | ১ কাপ |

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে একটি ঝুনা নারিকেল ঝুরিয়ে বাটিতে রাখতে হবে। একটি পাত্রে ময়দা ও চালের গুঁড়ি নিয়ে তাতে পরিমাণমতো পানি ও দুধ নিয়ে ভালো করে ছাঁকতে হবে। অত:পর পাকা কলা চটকে ময়দার খামিরের সাথে মিশাতে হবে। এরপর এর সাথে গুড় বা চিনি, নারিকেলের কোরা উত্তমভাবে মিশায়ে খামিরটি শক্ত করতে হবে। চুলার তেল চড়ায়ে গরম হলে খামির থেকে বড়া আকৃতির খামির নিয়ে তেলে ভেজে হালকা লাল করে নামাতে হবে। ঠাণ্ডা হলে কলার বড়া পিঠা পরিবেশন করা যাবে।

কলার খোসার ভর্তা তৈরি : দুটি পরিপুষ্ট কাঁচা কলা সিদ্ধ করে ছিলে খোসা বা বাকল সাবধানে আলদা করে নিতে হয়। পরিমাণ তো শুকনা মরিচ, রসুন , পেঁয়াজ ও সরিষা দিয়ে খোসাসহ পাটায় মিহি করে বেটে নেওয়া হয়।

৫.৪ কলার কাবাব বা কোফতা তৈরি :

কাঁচা কলার কোফতা : কোফতা অনেকটা কাবাবের মতো। কাঁচা কলা দিয়ে সুন্দর কোফতা তৈরি করা যায়। কোফতা তৈরিতে দুটি খোসা ছাড়ানো কাঁচা কলা, ৩০ গ্রাম চিংড়ি মাছ, ১৫ গ্রাম পেঁয়াজ কুচি, ৫ গ্রাম আদা বাটা, ২.৫ গ্রাম গোলমরিচের গুড়া, ধনে পাতা কুচানো, ৩০ গ্রাম বিস্কুটের গুঁড়া ও ৬০ গ্রাম সয়াবিন তেলের প্রয়োজন । প্রথমে কলা ব্লেন্ডিং করে নিতে হয়। চিংড়ি ও ব্লেন্ড করে নিতে হয় বা পিষে নেয়া যায়। পেঁয়াজ কুচি, লবণ আদা বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, ধনে পাতা দিয়ে ব্লেন্ড করা মাছ ও কলা একত্রে ভালো করে মিশাতে হয় চুলায় কড়াই চাপিয়ে তেল ঢেলে গরম করতে হয়। তেল গরম হলে কলার মিশ্রণের কিছু অংশ হাতে নিয়ে গোল চ্যাপ্টা কোফতার আকৃতি করে চুলায় ঢেলে একটা করে করে ভেজে নিতে হয়। সস বা সালাদ দিয়ে গরম গরম পরিবশেন করতে হয়।

কলার রুটি : এই রুটি তৈরি করতে মাঝারি আকারের দুইটি কলা ও ৬০ গ্রাম বা ৪ টেবিল চামচ আটার প্রয়োজন হয়। কাঁচা অথবা পাকা উভয় কলাই এ কাজে ব্যবহার করা যায়। কলা কাঁচা হলে আগেই সিদ্ধ করে নিতে হয। রুটি তৈরি করার সময় কলা হাত দিয়ে চটকে নিতে হয়। আটা পানি দিয়ে একটু শক্ত করে মথে খামির তৈরি করতে হয়। চটকানো কলা ও আটার খামির একসাথে ভালো করে মিশাতে হয়। মিশানো মণ্ড বা খামির দিয়ে চারটি রুটি বানানো যায়। চুলায় তাওয়া গরম হলে রুটি সেকে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করা যায়। কাঁচা কলার রুটি হলে গুড় দিয়ে পরিবেশন করতে হয়।

# অনুশীলনী -৫

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে কলার ব্যাপক চাষ হয়?
২. কলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কী?
৩. ব্যাবসায়িক দৃষ্টিতে কলা থেকে কী কী নতুন পণ্য তৈরি করা যায়?
৪. কলার মিষ্টি চিপসের জন্য কত মি.লি. পুরু করে স্লাইস করতে হয়?
৫. কতভাগ KMS দ্রবণে কতক্ষণ চিপস ডুবিয়ে রাখতে হয়?
৬. কাঁচা কলাকে স্লাইস করার পূর্বে কিসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়?
৭. কলার কোফতা তৈরিতে কী কী জিনিস লাগে?
৮. কলার বড়া পিঠা তৈরিতে কী কী উপকরন লাগে?
৯. কলার রুটি কী দিয়ে পরিবেশন করতে হয়?

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কলার পরিচিতি ও পুষ্টিমান বর্ণনা কর।
২. কলার মিষ্টি চিপস তৈরির প্রবাহ চিত্র লিখ।
৩. কলার ঝাল চিপস-এর উপরকরণগুলো কী কী?
৪. পাকা কলার পিঠা তৈরির উপকরণ ও প্রণালি লেখ।
৫. কলার বড়া পিঠার উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালি লেখ।
৬. কাঁচা কলার কোফতা তৈরি প্রক্রিয়া লেখ।

## রচানমূলক প্রশ্ন

১. কলার পরিচিতি, পুষ্টিমান ও ব্যবহার লেখ।
২. কলা থেকে মিষ্টি ও ঝাল চিপস তৈরির উপকরণ ও প্রণালি লেখ।
৩. কলার বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরির প্রদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. কলার কোফতা, কলার রুটি, কলার চিপস সংরক্ষণ পদ্ধতি লেখ।

অধ্যায়-৬

# পেয়ারা, কমলা ও লেবুজাতীয় ফল থেকে খাদ্য

## ৬.১ পেয়ারা ও লেবুজাতীয় ফলের পরিচিতি ও পুষ্টিমান

পেয়ারা পরিচিতি : পেয়ারা (Psidium guajava) একটি স্বল্প অম্লধর্মী ফল, ইংরেজিতে-Guava বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে এর ব্যাপ্তি। সবুজ থেকে হলুদ এবং মাংসল অংশ সাদা, হলুদ, গোলাপি বা লাল বর্ণের বহিরাবরণ হয়ে থাকে। পেয়ারার বহিরাবরণ জাতভেদে পুরু অথবা পাতলা হতে পারে। সব পেয়ারাই ছোট ছোট ভক্ষণীয় বীজ বহন করে। ধারণা করা হয় পেয়ারার আদি আবাদস্থল মেক্সিকো ও পেরু। পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে এর আবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। পেয়ারা গাছের জীবনকাল প্রায় ৩০ বছর। পেয়ারা সাধারণত চার টুকরা করে শুকিয়ে জাহাজ বা বিমানে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পরিবহন করা হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বিশুষ্ক পেয়ারার জলীয় অংশ থাকা উচিত ৬% আমদের দেশের ফলের মধ্যে পেয়ারা খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। এটি দ্রুতবর্ধনশীল গ্রীষ্মকালীন ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র কমবেশি এ ফল জন্মে। কোন কোনো স্থানে একে সবরি বলা হয়। পর্তুগিজরা এ ফল ভারতে প্রবর্তন করেন। বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা বরিশাল, স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি এলাকায় চাষ হয়ে থাকে। পেয়ারা ভিটামিন 'সি' ও পেকটিন সমৃদ্ধ। একমাত্র আমলকী ব্যতীত অন্য কোন ফলে এত ভিটামিন 'সি' নেই । বহুবিধ গুণাগুণের সমন্বয়ের জন্য পেয়ারাকে নিরক্ষীয় এলাকার আপেল বলা হয়।

লেবুজাতীয় ফলের পরিচিতি :

লেবুজাতীয় ফল থেকে খাদ্য : লেবু জাতীয় ফল বলতে কয়েকটি ফলকে একত্রে বুঝানো হয়ে থাকে। যেমনঃ লেবু, পাতি লেবু, কমলা, মাল্টা, বাতাবি লেবু ইত্যাদি। লেবু মুখরোচক, উপাদেয় বলবর্ধক ও রসাল ফল। লেবুতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে বিশেষ করে এতে ভিটামিন 'সি' -এর পরিমাণ খুব বেশি। সাইট্রিক এসিডের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে কোনো কোনো লেবু বেশ টক। বাতাবি ও কাগজি লেবুতে পেকটিনের পরিমাণ অনেক বেশি বলে মার্মালেড ও জেলি তৈরিতে এবস ফল বেশি ব্যবহার হয়। লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে কমলা সবচেয়ে জনপ্রিয় সুগন্ধী ও ভিটামিনসমৃদ্ধ ফল। লেবু, বাতাবি লেবু ও কমলার পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো-

লেবু :

লেবু বাংলাদেশে একটি টকজাতীয় জনপ্রিয় ফল। সারা দেশেই এর আবাদ হয়ে থাকে। দেশের প্রায় ৪.৫ হাজার হেক্টর জমিতে লেবুর চাষ হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে বছরে প্রায় ২০০টি পর্যন্ত লেবু ধরতে পারে। আমাদের দেশে লেবুর কয়েকটি জাত আছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

বারি লেবু-১ : এ লেবুর গন্ধ এলাচির মতো। এ লেবুর গাছ, পাতা ও ফল আকারে বড়। বছরে ২ বার ফল দিতে পারে। প্রতিটি ফলের ওজন হতে পারে ২৫০-২৭০ গ্রাম। ফলে রস প্রায় ২৫%, TSS ৬% এবং এসিডিটি- ৫.৩%।

চিত্র : পেয়ারা ফল

চিত্র : লেবু ফল

বারি লেবু-২ : পাতা সবুজ ও ছোট আকৃতির। গোলাকার ফল নিয়মিত ধরে ফলের ওজন ৭৫-৭৮ গ্রাম এবং টিএসএস ৭.৩%। রস থাকে ৩১-৩৪% এবং এসিডিটি মাঝারি পরিমাণের। একটি গাছে ফল ধরে ১৮০-১৯০টি।

বারি লেবু-৩ : লেবু গাছের পাতা ছোট ও সবুজ । গাছে নিয়মিত ফল ধরে ও ফল গোলাকার । ফলের গড় ওজন ৫০-৬০ গ্রাম। ফলে রসের পরিমাণ ৩৭.৭%। এসিডিটি কম। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে ফল ধরে ২০০-২২০টি। এ জাতের লেবুর আবাদ বর্ষাকালে ভালো হয়।

বাতাবি লেবু : বাংলাদেশে সব এলাকাতেই বাতাবি লেবু চাষ করা যায়, তবে সিলেট অঞ্চলে সবচেয়ে ভালো জন্মে। হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ৩ টন। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে ১০০টি পর্যন্ত বাতাবি লেবু ধরতে পারে। বাতাবি লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি ফল।

কমলা : ইংরেজি নাম-Mandarin. লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে কমলা দেশে ও বিদেশে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। কমলাতেও প্রচুর ভিটামিন সি বিদ্যমান। আমাদের দেশে সিলেট, মৌলভীবাজার ও পার্বত্য জেলাসমূহে কমলার আবাদ হচ্ছে। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ২.৫ টন। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে ১০০-৩০০টি পর্যন্ত কমলা ধরতে পারে।

চিত্র : বাতাবি লেবু গাছ

যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতে কমলা বংশবিস্তার ঘটাতে পারে। তবে অযৌন পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ভালো হয়। ভালো ফলন পেতে কমলা গাছে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কমলা গাছে ফুল ধরে এবং ফল পাকে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। বর্তমানে সারা বছরই কমলা পাওয়া যায়।

পেয়ারার পুষ্টিমান :

পুষ্টিসমৃদ্ধ পেয়ারা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার হয়। যেমন– সরাসরি খাওয়া ও প্রক্রিয়াজাত রূপ হচ্ছে– জুস নেকটার পিউরি, জ্যাম জেলি, প্রিজার্ভ, পেয়ারাসত্ত্ব বিশুষ্ক ও টিনজাত পেয়ারা ইত্যাদি। একটি মাঝারি আকারের পেয়ারা যাতে ১০০ গ্রাম পাল্প (বীজ ছাড়া) থাকে তার পুষ্টিমান নিচে দেওয়া হলো :

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১ | আমিষ (গ্রাম) | ১.৪ |
| ২ | শ্বেতসার (গ্রাম) | ১৫.২ |
| ৩ | চর্বি (গ্রাম) | ১.১ |
| ৪ | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.৬ |
| ৫ | ভিটামিন বি১ (মি. গ্রাম) | ০.২১ |
| ৬ | ভিটামিন বি২ (মি. গ্রাম) | ০.০৯ |
| ৭ | ভিটামিন সি (মি. গ্রাম) | ২১০ |
| ৮ | ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম) | ২০ |
| ৯ | লৌহ (মি.গ্রাম) | ১.৪ |
| ১০ | ক্যারোটিন (মাই. গ্রা) | ১০০ |
| ১১ | খাদ্য শক্তি (কি. ক্যালরি) | ৭৬ |

লেবু, বাতাবি লেবু ও কমলা লেবুর পুষ্টিমান নিম্নে দেওয়া হলো-

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান | লেবু | বাতাবী লেবু | কমলা লেবু |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমিষ (গ্রাম) | ০.৩ | ০.৫ | ০.৭ |
| ২ | শ্বেতসার (গ্রাম) | ১০ | ৮.৫ | ৯.৭ |
| ৩ | চর্বি (গ্রাম) | ০.৭ | ০.৩ | ০.১ |
| ৪ | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.৬ | ০.৩ | ০.১ |
| ৫ | ভিটামিন বি১ (মি. গ্রাম) | অল্প | ০.০৬ | ০.০৪ |
| ৬ | ভিটামিন বি২ (মি. গ্রাম) | ০.০৩ | ০.০৪ | ০.০১ |
| ৭ | ভিটামিন সি (মি. গ্রাম) | ৪৭ | ১০৯ | ০.৪০ |

### ৬.২ পেয়ারা ও কমলালেবুর জেলি ও জ্যাম

**(ক) পেয়ারা জেলি : পেয়ারা জেলী তৈরির উপকরনগুলো নিম্নরূপ–**

| উপকরণসমূহ | পরিমাণ |
|---|---|
| পেয়ারার রস | ১ কেজি |
| চিনি | ৭০০ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিড | ৬ গ্রাম |
| কে এম এস | ০.৫ গ্রাম |
| পেকটিন | ৮ গ্রাম |
| মোম | পরিমাণমতো |

**প্রস্তুত প্রণালি :** দেশি পেয়ারা জেলি তৈরির জন্য খুবই উপযোগী এবং স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। পরিপুষ্ট কিন্তু বেশি পাকা নয় এরূপ পেয়ারা জেলি তৈরির জন্য বেছে নিতে হয়। পেয়ারা বেছে ধুয়ে ধারালো ছুরি টুকরো দিয়ে টুকরো করে কাটা হয়। পেয়ারার সমান ওজনের পানিতে পেয়ারার টুকরাগুলোকে রেখে চুলায় কড়াইতে বসিয়ে জ্বাল দিতে হয়। কাঠের হাতল দ্বারা নাড়াচাড়া করে পুরো পেয়ারা পেস্টের মতো করতে হয় যাতে আঠালো ভাবের সৃষ্টি হয়। এরপর পাতলা সুতি কাপড় বা মার্কিন কাপড় দিয়ে পেয়ারার পেস্ট সাবধানে ছেঁকে নিয়ে রস আলাদা করা হয়। জেলির বিভিন্ন উপাদান নিক্তিতে মেপে ঠিক করে রাখতে হয়। চিনি ও পেকটিন অল্প অল্প করে মিশাতে হয়। মিশ্রণটি চুলায় দিয়ে জ্বাল দিতে হয় ও অনবরত নাড়তে হয়। রস জ্বাল দেয়ার সময় উপরে ময়লা বা গাঁদ জমলে তা ফেলে দিতে হয়। জেলির রং না ধরা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হয়। মিশ্রণের টিএসএস-এর মান ৬৫-৬৭ হলে (যা রিফ্রাক্টোমিটারে পাঠ থেকে জানা যায়) চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হয়। সাইট্রিক এসিড ও হালকা গরম পানিতে গুলানো কেএমএস ঘনীভূত মিশ্রণে যোগ করতে হয়। তারপর জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার কাচের বোতলে মিশ্রণটি ঢালতে হয়। কিছুটা ঠাণ্ডা হলে মোম গলিয়ে বোতলের মুখে মোম যোগ করতে হয়। মোম ময়লা হলে কাপড় দ্বারা ছেঁকে নিতে হয়। বোতলের মুখ ছিপি লাগিয়ে বোতলের বাইরের দিকটা ভেজা কাপড়ে মুছে নিতে হয়। বোতলগুলো বাজারজাত করার জন্য প্যাকেট করতে হয়। শুষ্ক আলোবিহীন ও কম তাপমাত্রায় গুদামজাত করা হয়।

চিত্র : পেয়ারার জেলি

লেবুর জেলির উপাদান নিম্নরূপ–

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| চিনি | ২৫ কেজি |
| পানি | ২৫ লিটার |
| পেকটিন | ২৫০ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ৩০ গ্রাম |
| লেমন ফ্লেভার | ৭০ সি সি |
| লেমন অয়েল | ১০ সিসি |
| আপেল গ্রিন কালার | ১০ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিড | ১৫০-২০০ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

ক. পরিষ্কার চিনি ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা হয়।

খ. প্রত্যেক উপাদান আলাদা আলাদাভাবে মেপে নেওয়া হয়।

গ. শুকনা চিনির সাথে পেকটিন ভালোভাবে মিশাতে হয় এবং আস্তে আস্তে এতে পানি যোগ করে পানির সাথে মোটামুটিভাবে মিশিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হয়।

ঘ. দ্রবণের ঘনত্ব বা টিএসএস যখন ৬৫-৬৭% হবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হয়।

ঙ. সাইট্রিক এসিড, সোডিয়াম বেনজয়েট (পানিতে দ্রবীভূত), লেমন ফ্লেভার, লেমন অয়েল ও রঙ গরম দ্রবণে যোগ করে ভালোভাবে মেশাতে হয়।

চ. সাথে সাথে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলে ঢালতে হয়।

ছ. সাথে সাথে অথবা ঠাণ্ডা হলে মোম গলিয়ে জেলির উপর দেয়া হয়।

জ. ছিপি লাগিয়ে ভেজা কাপড় দিয়ে বোতলের বাইরের দিক মুছে নেয়া হয়।

ঝ. লেবেল লাগানো হয়।

ঞ. শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও আলোবিহীন কক্ষে গুদামজাত করা হয়।

(গ) কমলালেবুর জেলি

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| চিনি | ২৫ কেজি |
| পানি | ২৫ লিটার |
| পেকটিন | ২৫০ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ৩০ গ্রাম |
| অরেঞ্জ ফ্লেভার | ৩০ সি. সি |
| অরেঞ্জ ওয়েল | ১০ সি সি |
| অরেঞ্জ এমালশন | ৭০ সিসি |
| সাইট্রিক এসিড | ১৫০-২০০ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : লেবুর জেলি তৈরিতে যে পদ্ধতি বা ধাপগুলো অনুসরণ হরা হয়েছে পেকটিন যোগে অরেঞ্জ জেলি তৈরিতে একই বা ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে।

৬.৩ লেবু জাতীয় ফল ও কমলার জুস ও স্কোয়াশ

লেবু ও কমলালেবু থেকে সরাসরি রস বের করে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য যেমন- জুস, স্কোয়াশ বা জেলি তৈরি করলে তাতে তিক্ত স্বাদ পাওয়া যায়। এসব ফলের অভ্যন্তরীণ গঠনগত অবস্থার কারণেই এমন হয়ে থাকে। আমাদের দেশে, এমনকি ভারতেও এ সমস্যা দূর করা এ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। তাই রিফাইন করা কনসেনট্রেট আমেরিকা বা ইউরোপের কিছু দেশ (জার্মানি, ইংল্যান্ড ইত্যাদি) থেকে আমদানি করা হয়। এই কনসেনট্রেট ব্যবহার করে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা যায়। এগুলোর কয়েকটির প্রস্তুত প্রণালি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

(ক) কমলালেবুর স্কোয়াশ

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| চিনি | ৬ কেজি |
| পানি | ১৫ লিটার |
| তরল গ্লুকোজ | ১.৩ কেজি |
| সাইট্রিক এসিড | ১২০ গ্রাম |
| সিএমসি (কার্বো অক্সি মিথাইল সেলুলোজ) | ১৫ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ১০ গ্রাম |
| অরেঞ্জ ইমালশন | ৫০ সিসি |
| অরেঞ্জ ফ্লেভার | ১০ সিসি |
| অরেঞ্জ অয়েল | ২সিসি |

প্রস্তুত প্রণালি :

ক. স্কোয়াশ তৈরিতে পরিষ্কার চিনি ও তরল গ্লুকোজ এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা হয়।

খ. সবগুলো উপাদান কাজের শুরুতেই আলাদা আলাদাভাবে মেপে রাখা হয়।

গ. চিনি ও পানি চুলায় দিয়ে জ্বাল দেয়া হয়।

ঘ. প্রায় ১ ঘণ্টা পর তরল গ্লুকোজ যোগ করা হয় ও নাড়তে হয়।

ঙ. তারপর সামান্য চিনির সাথে সিএমসি মিলিয়ে অল্প অল্প করে মিশ্রণে যোগ করে নেড়ে মেশানো হয়।

চ. যখন মিশ্রণ কিছুটা ঘন হবে (প্রায় ২ ঘণ্টা পর) অর্থাৎ দ্রবণের টিএসএস ৪০% হবে তখন চুলা থেকে মিশ্রণ নামিয়ে ফেলতে হয়।

ছ. সামান্য পানিতে গলানো সোডিয়াম বেনজয়েট, সাইট্রিক এসিড, অরেঞ্জ এমালশন, ফ্লেভার ও অয়েল যোগ করে নেড়ে ভালোভাবে মেশানো হয় ও পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নেয়া হয়।

জ. পরিষ্কার শুষ্ক জীবাণুমুক্ত বোতলের গা বেয়ে স্কোয়াশ ঢেলে বোতলে সম্পূর্ণভাবে ভরতে হবে এবং সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করতে হবে।

ঝ. বোতলের বাইরের দিক ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নেয়া হয়।

ঞ. ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও আলোবিহীন কক্ষে গুদামজাত করা হয়।

অরেঞ্জ অয়েল যোগ করলে স্বাদ ভালো হয়, কিন্তু স্কোয়াশের উপরে তেল ভাসতে থাকে। না চাইলে তেলের ব্যবহার বর্জন করা যেতে পারে।

(খ) লাইম জুস কর্ডিয়াল

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| চিনি | ৬ কেজি |
| পানি | ১২ লিটার |
| তরল গ্লুকোজ | ১.২ কেজি |
| সাইট্রিক এসিড | ১৬০ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ১৫ গ্রাম |
| লেমন ফ্লেভার | ১৫ সিসি |
| লেমন অয়েল | ২সিসি |
| লেমন ইয়েলো কালার | ০.৭ গ্রাম |
| আপেল গ্রীন কালার | ০.৭ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পরিষ্কার চিনি, পানি ও তরল গ্লুকোজ নেয়া হয়।

২. প্রত্যেক উপাদান আলাদা আলাদাভাবে মেপে রাখতে হয়।

৩. চিনি ও পানি এক সাথে নিয়ে চুলায় জ্বাল দেয়া হয়।

৪. প্রায় ১ ঘণ্টা পরে ফুটন্ত পানিতে তরল গ্লুকোজ যোগ করে নেড়ে মেশাতে হয়।

৫. যখন দ্রবণ কিছুটা ঘন হবে অর্থাৎ প্রায় ২ ঘণ্টা পর যখন দ্রবণের টি.এস.এস ৪২% হবে তখন চুলা থেকে দ্রবণ নামিয়ে নেয়া হয়।

৬. সাইট্রিক এসিড, সোডিয়াম বেনজয়েট দ্রবণ, লাইম ফ্লেভার ও অয়েল, কালার ইত্যাদি যোগ করে ভালোভাবে নেড়ে মেশাতে হয় ও পরিষ্কার কাপরে মাধ্যমে ভালোভাবে ছেঁকে নেয়া হয়।

৭. পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলে তাড়াতাড়ি বোতলের গা বেয়ে গরম মিশ্রণ ঢালা হয় ও সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করা হয়।

৮. ভেজা কাপড় দিয়ে বোতলের বাইরের দিক মুছে নেয়া হয়।

৯. লেবেল লাগিয়ে শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও আলোবিহীন কক্ষে গুদামজাত করা হয়।

লেমন অয়েল যোগ করলে স্বাদ বাড়ে, কিন্তু তেল দ্রবণের উপরিভাগে ভাসতে থাকে। কেউ চাইলে তেলের বর্জন করতে পারে।

(গ) লেবুর স্কোয়াশ

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| চিনি | ৬০ কেজি |
| পানি | ১৫০ লিটার |
| তরল গ্লুকোজ | ১৩ কেজি |
| সাইট্রিক এসিড | ১.৬ কেজি |
| সি.এম.সি | ১০০ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ১০০ গ্রাম |
| আপেল গ্রীন কালার | ৭ গ্রাম |
| লেমন ফ্লেভার | ১৫০সিসি |

প্রস্তুত প্রণালি : অরেঞ্জ স্কোয়াশ প্রস্তুত প্রণালি এবং লেমন স্কোয়াম প্রস্তুতপ্রণালি হুবহু একই। কাজেই অরেঞ্জ স্কোয়াশ প্রস্তুত প্রণালির ধাপগুলো অনুসরণ করে লেবুর স্কোয়াশ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

(ঘ) ফ্রুট লেমন সিরাপ : যে কোনো ফ্রুট সিরাপে চিনির পরিমাণ থাকবে ৬৫-৭৫%। আমাদের দেশে বিএসটিআই -এর মান অনুসারে এতে চিনির পরিমাণ থাকবে কমপক্ষে ৬৫%। যেহেতু সিরাপ এমনিতেই ঘন থাকে সেহেতু ঘনীকারক কোনো বস্তু ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে আরো ঘন করতে চাইলে পরিমাণমতো পেকটিন অথবা সিএমসি ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে ফ্রুট সিরাপ (লেমন) প্রস্তুতির একটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| চিনি | ৫০ কেজি |
| পানি | ৩০ লিটার |
| তরল গ্লুকোজ | ১৩ কেজি |
| সাইট্রিক এসিড | ১০০ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ১০০ গ্রাম |
| লেমন ফ্লেভার | ১০০ সিসি |
| লেমন অয়েল | ১০ সিসি |
| লেমন ইয়েলো কালার | ৫০ গ্রাম |
| আপেল গ্রীন কালার | ১৫০ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. চিনি ও পানি পাত্রে নিয়ে জ্বাল দেয়া হয়।

২. চিনি মিশে গেলে মিশ্রণ যখন ফুটতে থাকে তখন তরল গ্লুকোজ যোগ করে নাড়তে হয়।

৩. সোডিয়াম বেনজয়েট ও রঙ হালকা গরম পানিতে গুলিয়ে রাখা হয়।

৪. সিরাপের টিএসএস যখন ৬৫-৭০% হবে তখন চুলা থেকে সিরাপ নামিয়ে নেয়া হয়।

৫. সিরাপে সাইট্রিক এসিড, সোডিয়াম বেনজয়েট, রঙ, ফ্লেভার ইত্যাদি যোগ করে নেড়ে ভালোভাবে মেশানো হয়।

৬. পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সিরাপ ছাঁকা হয়।
৭. জীবাণুমুক্ত বোতলে সিরাপ ঢেলে সিল করা হয়।
৮. ছিপি লাগানোর পর ভেজা কাপড় দিয়ে বোতলের বাইরের দিক মুছে লেবেল লাগানো হয়।
৯. শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও আলোবিহীন কক্ষে সিরাপ গুদামজাত করা হয়।

(ঙ) ফ্রুট (অরেঞ্জ) সিরাপ: এর উৎপাদন কৌশল লেমন সিরাপের মতোই। উপাদানগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। এই সিরাপ প্রস্তুতির একটি ফর্মুলা উপস্থাপিত হলো।

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| চিনি | ৫০ কেজি |
| পানি | ৩০ কেজি |
| তরল গ্লুকোজ | ১৪ কেজি |
| সাইট্রিক এসিড | ৯০ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ৯০ গ্রাম |
| অরেঞ্জ ফ্লেভার | ১৬৫ মিলিলিটার |
| অরেঞ্জ অয়েল | ১০মিলিলিটার |
| অরেঞ্জ রেড কালার | ২৫০ গ্রাম |
| ক্যারামেল কালার | ৭০ মিলিলিটার |

বাজারজাতকরণ :

লেবু ও কমলা সরাসরি ফল হিসেবে মানুষ ব্যবহার করে থাকে। কমলালেবুর জুস ও জেলির চাহিদা বাজারে খুবই বেশি। কমলালেবুর জুস কনসেনট্রেট থেকে উৎপাদিত ড্রিংকের বাজার বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্নস্থান দখল করে আছে।

কমলালেবুর সুমিষ্ট ঘ্রাণ ও স্বাদ ভোক্তাকে কমলাভিত্তিক পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করে। আমাদের দেশে প্রাপ্ত কমলা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমদানি করা । বর্তমানে বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামে কমলার আবাদ সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে। আশা করা যায় কমলার চাষ সম্প্রসারিত হবে। এতে কমলার প্রক্রিয়াজাতপণ্যের মূল্যও স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়বে।

বাতাবি লেবু ও অন্যান্য লেবু থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত প্রণ্যের প্রচলন আমাদের দেশে তেমন অগ্রসর হয়নি। পর্যাপ্ত প্রচারে এদের ব্যবহার বাড়াতে পারে।

৬.৪ লেবুর আচার ও চাটনি :

(ক) লেবুর আচার : বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই লেবু উৎপন্ন হয় তবে পাহাড়ি অঞ্চলে লেবুর উৎপাদন অত্যন্ত বেশি। এর ভিটামিন সি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দারুণ কার্যকর। আমাদের দেশে সাধারণত ভাতের সাথে সরাসরি লেবু খাওয়া হয় এবং মেহমান, অতিথি এলে লেবুর শরবত বানিয়ে খাওয়া হয়।

কিন্তু লেবুর আচার বানিয়ে তেমন খাওয়া হয় না। ভারতে লেবুর আচারের যথেষ্ট কদর রয়েছে। আমাদের দেশেও লেবুর আচার জনপ্রিয় হবে যদি লেবুর আচার তৈরির কৌশল জানা থাকে। নিম্নে আচার তৈরির বর্ণনা দেয়া হলো :

| উপকরণসমূহ | পরিমাণ |
|---|---|
| লেবু | ১০ কেজি |
| লবণ (আচারে লেবু ও লবণের অনুপাত হবে ৬:১ ) | ১.৬৭ গ্রাম |
| লাল মরিচের গুঁড়া | ৮০০ গ্রাম |
| মেথির গুঁড়া | ১২ গ্রাম |
| হলুদের গুঁড়া | ১০০ গ্রাম |
| হিং | ২ গ্রাম |
| সরিষার বীজ | ১৫০ গ্রাম |
| তেল (সূর্যমুখী) | ৪০০ মি.লি. |

প্রস্তুত প্রণালি: সর্বপ্রথমে সম্পূর্ণ পাকা, রসালো হলদে বর্ণের লেবু বেছে নিতে হয়। পরিষ্কার পানিতে ভালো করে লেবুগুলো ধুয়ে নিতে হয়। প্রত্যেকটি লেবুকে চার টুকরা করে কাটা হয়। সম্পূর্ণ লেবুর তিন ভাগের দুই ভাগ লেবু নিতে হয়। পাত্রে এই লেবু দিয়ে এক স্তর লেবু সাজিয়ে তার উপর লবণের স্তর এরপর আবার লেবু ও লবণ এভাবে সাজাতে হয়। অবশিষ্ট লেবু হাত দিয়ে চটকে নিতে হয় এবং পাত্রের উপর রাখা লেবুর উপর ছড়িয়ে দিতে হয়। তারপর ঢাকনা লাগিয়ে ৭-৯ দিন পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হয়। এ সময়ে লেবু নরম হয় এবং লেবুর হলুদ রং পরিবর্তিত হয়ে হালকা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। চুলায় কড়াই চেপে তেল ভালোভাবে ফুটিয়ে নেওয়া হয় এবং উক্ত তেলে সরিষার বীজ ভেজে নিতে হয। তাপর সব মসলা ও তেল একসাথে লেবুতে যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। তারপর লেবুর আচার জীবাণুমুক্ত পাত্রে বায়ুরোধী করতে হয়। অতঃপর পাত্রের ছিপি লাগিয়ে লেবেলসহ বাজারজাত করতে হয়।

(খ) লেবুর চাটনি : যে জিনিস চেটে চেটে খেতে হয় তাকে চাটনি বলে। চাটনির কদর এখন দেশেই নয় বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। দৈনন্দিন খাবারের সাথে চাটনি খেতে ভালোই লাগে। চাটনি সংরক্ষিত করা হয় চিনি, ভিনেগার বা এসিটিক এসিড দিয়ে। ভালোভাবে সিল করে রাখলে চাটনি ১ বছর ভালো থাকে। পানির সংস্পর্শে এলে চাটনি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

লেবুর চাটনির উপকরণ :

| | |
|---|---|
| ১। লেবু | ২। তেল |
| ৩। সরিষা | ৪। জাফরান |
| ৫। কিসমিস | ৬। লবণ |
| ৭। চিনি | |

প্রথমে লেবুর খোসা ছিলে লেবুকে লম্বা লম্বা করে কাটতে হবে। তারপর লেবুর বিচি ফেলে দিতে হবে। চুলায় তেল গরম করে তাতে সরিষার ফোঁড়ন দিয়ে একে একে লেবু দিয়ে নাড়তে হবে। তারপর, চিনি, লবণ, কিসমিস, জাফরান ও পরিমাণমতো পানি দিতে হবে। মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে প্রিজারভেটিভ দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। এরপর বোতলে ভরে চাটনি সংরক্ষণ করতে হবে।

# অনুশীলনী -৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পেয়ারার মাংসল অংশ কী কী বর্ণের হয়ে থাকে?
২. রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রেরিত বিশুষ্ক পেয়ারার জলীয়অংশ কত থাকে?
৩. পেয়ারাকে অন্য কী নামে ডাকা হয়?
৪. বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা কোথায় কোথায় চাষ হয়?
৫. আমলকী ছাড়া অন্য কোন ফলে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন 'সি' আছে?
৬. বহুবিধ গুণের কারণে পেয়ারাকে কী বলে?
৭. লেবু জাতীয় ফল বলতে কী বুঝায়?
৮. লেবু জাতীয় ফলে বেশি টক থাকলে কোন এসিড বেশি থাকে?
৯. একটি পূর্ণবয়স্ক গাছে কতটি লেবু ধরে?
১০. বারি লেবুর তিনটি জাত কী?
১১. বারির কোন জাতের লেবুর ঘ্রাণ এলাচির মতো?
১২. দেশের কোথায় কোথায় কমলালেবু পাওয়া যায়?
১৩. পেয়ারা হতে কী কী প্রক্রিয়াজাত খাবার তৈরি করা যায়?
১৪. কোন মাসে কমলা গাছে ফুল ফোটে এবং কোন মাসে কমলা পাকে?
১৫. লেবু, বাতাবি লেবু ও কমলার মধে কোনটিতে ভিটামিন 'সি' বেশি থাকে?
১৬. কীরূপ পেয়ারা জেলী কলার জন্য উত্তম।
১৭. জ্বাল দেয়া মিশ্রণের মান কত ডিগ্রি ব্রিক্স হলে জেলি হয়েছে ধরা হয়?
১৮. দেশি লেবু বা কমলার রস দিয়ে জেলী করলে কী সমস্যা হয়?
১৯. কেন ইউরোপ হতে আমদানিকৃত রিফাইন কনসেস্ট্রেপ দিয়ে জেলী বা স্কোয়াশ তৈরি করা হয়?
২০. সিএমসি কী এবং কী কাজে লাগে?
২১. স্কোয়াশে অরেঞ্জ অয়েল দিলে কী হয়?
২২. লাইম জুস কর্ডিয়ালের TSS কত হলে চুলা হতে নামানো হয়?
২৩. BSTI মান অনুযায়ী সিরাপে চিনির পরিমাণ শতকরা কত থাকে?
২৪. আমাদের দেশে লেবুর আচার তেমন জনপ্রিয় নয় কেন?
২৫. আচারে লেবুর ও লবণের অনুপাত কত থাকে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পেয়ারাকে কেন নিরক্ষীয় এলাকার আপেল বলে?
২. লেবু জাতীয় ফলের পরিচিতি দাও।
৩. লেবুর তিনটি জাতের বর্ণনা দাও।
৪. পেয়ারার জেলি তৈরির উপকরণ কী কী?
৫. কেন লেবুর জুস, স্কোয়াস তৈরিতে কনসেস্ট্রেপ ব্যবহার হয়?
৬. লেবুর স্কোয়াশ কীভাবে তৈরি হয়?
৭. লেবুর আচার কীভাবে তৈরি হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পেয়ারা ও লেবুজাতীয় ফলের পরিচিতি দাও। লেবুর বিভিন্ন জাতের বর্ণনা দাও।
২. পেয়ারার জেলি ও লেবুর জেলি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. কমলার স্কোয়াশ ও লাইম জুস কার্ডিয়াল তৈরি পদ্ধতি র্বণনা কর।
৪. লেমন ফ্রুট সিরাপ ও অরেঞ্জ ফ্রুট সিরাপ ও লেবুর চাটনী তৈরি প্রণালি বর্ণনা কর।

## অধ্যায়-৭

# আনারস, পেঁপে ও লিচু থেকে খাদ্য

### ৭.১ আনারস, পেঁপে ও লিচুর পরিচিতি ও খাদ্যমান

**আনারসের পরিচিতি :**

আনারস গাছ একটি দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ। আনারসের বৈজ্ঞানিক নাম এনানাস কমোসাস (Ananas comosus) এবং ইংরেজি pineapple গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফলের মধ্যে পৃথিবীতে কলার পরেই আনারসের স্থান। দক্ষিণ আমেরিকা বিশেষ করে ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ে সম্ভবত আনারস চাষে প্রথম। যেসব দেশ আনারস উৎপাদনে এগিয়ে আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাওয়াই দ্বীপ, কোস্টারিকা, মেক্সিকো, হন্ডুরাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, তাইওয়ান, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, আইভরিকোস্ট, গিনি, ভারত, এল-সালভাদর, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন। বাংলাদেশে কয়েকটি বিশেষ এলাকায় আনারস উৎপন্ন হয়ে থাকে। যথা- টাঙ্গাইল, সিলেট ও চট্টগ্রাম। আমাদের দেশে সাধারণত তিন জাতের আনারস আবাদ করা হয়; যথা- হানিকুইন, জায়েন্টকিউ ও ঘোড়াশাল। হানিকুইন আকারে ছোট এবং বেশ মিষ্টি হয়ে থাকে। অন্য দুই জাতের আনারস বড় এবং হানিকুইনের চেয়ে কিছুটা কম মিষ্টিই সম্পন্ন।

আনারসের পুষ্টিমান : আনারসে বিদ্যমান ভিটামিন, খনিজ লবণ, আঁশ ও এনজাইম দেহের পরিপাকক্রিয়ার জন্য বেশ ভালো ভূমিকা রাখে এবং দেহের উপযুক্ত ওজন ও সুষমপুষ্টি পেতে সহায়তা করে। এটি ভিটামিন 'সি'-এর একটি উত্তম উৎস এবং এতে খুবই কম ফ্যাট ও সোডিয়াম আছে, তবে কোলেস্টেরল নেই।

চিত্র : আনারসের মাঠ

পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত আনারসের পুষ্টিমান নিচে উপস্থাপিত হলো :

সারণি : আনারসের পুষ্টিমান (আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম)

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান | ফল |
|---|---|---|
| ১. | আমিষ (গ্রাম) | ০.৯ |
| ২. | শ্বেতসার (গ্রাম) | ৬.২ |
| ৩. | চর্বি (গ্রাম) | ০.২ |
| ৪. | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.২ |
| ৫. | ভিটামিন বি$_1$ (মি.গ্রা.) | ০.১১ |
| ৬. | ভিটামিন বি$_2$ (মি.গ্রা.) | ০.৪ |
| ৭. | ভিটামিন সি (মি.গ্রা.) | ২১ |
| ৮. | ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.) | ১৮ |
| ৯. | লৌহ (মি.গ্রা.) | ১.২ |
| ১০. | ক্যারোটিন (মাই.গ্রা) | ১৮৩০ |
| ১১. | খাদ্য শক্তি (কি. ক্যালরি) | ৪২ |

আনারস হতে খাদ্য : আনারস হতে আমাদের দেশে নিম্নের খাদ্যগুলো সবচেয়ে বেশি তৈরি হয়। যেমন-

১) আনারসের শরবত
২) আনারসের স্কোয়াস
৩) আনারসের ডি-হাইড্রেশন
৪) আনারসের জেলী
৫) আনারসের সত্ত্ব বা লেদার
৬) আনারসের জ্যাম
৭) আনারসের জর্দা
৮) আনারসের প্রিজার্ভ
৯) আনরসের চাটনি
১০) আনরসের ক্যান্ডি
১১) টিনজাত আনারস ইত্যাদি

পেঁপে পরিচিতি : পেঁপে আমাদের দেশে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত ফল। সারাবছর এ ফল বাজারে পাওয়া যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম ক্যারিকা পাপায়া (Carica Papaya) এবং ইংরেজি Papaya। এর উৎপাদন এলাকা গ্রীষ্মমণ্ডল হতে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। পেঁপে গাছ দ্রুত বর্ধণশীল ও স্বল্প আয়ুবিশিষ্ট গাছ। গাছ লাগানোর ৯-১৪ মাসের মধ্যে ফল ধরে। পেঁপের গায়ে ৮০% রঙ ধরলে পেঁপে তোলার উপযুক্ত হয়। পেঁপে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি ফল হিসেবে খাওয়া হয়। কাঁচা পেঁপে সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাকা পেঁপে থেকে জুস, জ্যাম এবং স্কোয়াশ এবং কাঁচা পেঁপে থেকে আচার ও চাটনি পাওয়া যায়। কাঁচা পেঁপেতে প্রোটিওলাইক এনজাইম যেমন প্যাপাইন ও কাইমো প্যাপাইন থাকে। এর কারণে রান্নার সময় মাংস নরম করতে কাঁচা পেঁপে ব্যবহার করা হয়।

পেঁপের পুষ্টিমান :

তুলনামূলকভাবে পাকা পেঁপে কাঁচা পেঁপের চেয়ে পুষ্টিমানের দিক থেকে উন্নত। পাকা পেঁপেতে শর্করা, খাদ্য শক্তি, ক্যালসিয়াম, ক্যারোটিন ও ভিটামিন-সি বেশি আছে। কিন্তু কাঁচা পেঁপের মধ্যে পেপিন নামক একটি জারক রস আছে যা আমিষকে হজম করতে সাহায্য করে। কাঁচা পেঁপেতে বেশি লৌহ আছে। আমাদের দেহে যে ভিটামিন-সি ও ক্যারোটিন প্রয়োজন তা আমরা ৫০ গ্রাম পাকা পেঁপেতে পেয়ে থাকি।

চিত্র : গাছভর্তি পেঁপে

পেঁপের পুষ্টিমান নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো -

সারণি : পেঁপের পুষ্টিমান (আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান | পাকা পেপে | কাঁচা পেপে |
|---|---|---|---|
| ১. | আমিষ (গ্রাম) | ১.৯ | ০.৯ |
| ২. | শ্বেতসার (গ্রাম) | ৮.৩ | ৬.৪ |
| ৩. | চর্বি (গ্রাম) | ০.২ | ০.৮ |
| ৪. | খনিজ লবণ(গ্রাম) | ০.৭ | ১.৩ |
| ৫. | ভিটামিন-বি$_১$ (মি.গ্রা.) | ০.০৮ | ০.৪০ |
| ৬. | ভিটামিন-বি$_২$ (মি.গ্রা.) | ০.০৩ | ০.০২ |
| ৭. | ভিটামিন-সি (মি.গ্রা.) | ৫৭ | ৬ |
| ৮. | ক্যালসিয়াম | ৩১ | ১৩ |
| ৯. | লৌহ (মি.গ্রা.) | ০.৫ | ০.৯ |
| ১০. | ক্যারোটিন (মাই. ক্যালরি) | ৮১ | ৫৬০ |
| ১১. | খাদ্য শক্তি (কি. ক্যালরি) | ৪২ | ৩৬ |
| ১২. | জলীয় অংশ (গ্রাম) | ৮৮.৪ | ১০.৭ |

পেঁপে থেকে খাদ্য :

সাধারণত পেঁপে থেকে অনেক ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

১) পেঁপের হালুয়া
২) পেঁপের সালাদ
৩) পেঁপের জ্যাম
৪) পেঁপের পায়েস
৫) পেঁপের আচার
৬) পেঁপের চাটনি
৭) পেঁপের স্যুপ
৮) পেঁপের ক্যান্ডি ইত্যাদি।

২০২০

লিচু পরিচিতি : লিচু Sapindaceac গোত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল। বৈজ্ঞানিক নাম (লিচি চাইনেনসিস) Litchi chinensis. ইংরেজি litchi লিচু গাছ ঘন শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান গাছ। গাছের বৃদ্ধি ঘটে ধীরে ধীরে, লম্বায় ৩০ থেকে ১০০ ফুট হতে পারে। লিচুর আকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোলাকার, আকার ১.৫০ - ১ বর্গ ইঞ্চি, বহিরাবরণ পুরু, অমসৃণ। বহিত্বকের নিচে সাদা রসাল পাল্প যা সহজেই বীজ থেকে পৃথক থাকে। লিচুর প্রথম আবাদ চীনে হতো বলে অনুমান করা হয়। সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। উৎপাদনে চীনের পরেই ভারতের অবস্থান। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তাইওয়ান, জাপান, ফিলিপাইন, মাদাগাস্কার, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লিচু আবাদ করা হয়।

চিত্র : গাছভর্তি লিচু

লিচুর পুষ্টিমান:

(প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণীয় লিচুতে বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান)

| উপাদান | পরিমাণ | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| শক্তি | ৬৩-৬৪ কি.ক্যালরি | লৌহ | ০.৪ মি.গ্রাম |
| জলীয় অংশ | ৮১.৯-৮৪.৮৩ গ্রাম | সোডিয়াম | ৩ মি. গ্রাম |
| প্রোটিন | ০.৬৮-১ গ্রাম | পটাসিয়াম | ১৭০ মি.গ্রাম |
| ফ্যাট | ০.৩-০.৫৮ গ্রাম | থায়ামিন | ২৮ মা. গ্রাম |
| কার্বোহাইড্রেট | ১৩.৩১-১৬.৪ গ্রাম | নিকোটিনিক এসিড | ০.৪ মি.গ্রাম |
| আশ | ০.২৩-০.৪ গ্রাম | রিবোফ্লাভিন | ০.০৫ মি. গ্রাম |
| ক্যালসিয়াম | ৮-১০ মি.গ্রাম | ভিটামিন সি | ২৪-৬০ মি. গ্রাম |
| ফসফরাস | ৩০-৪২ মি.গ্রাম | | |

## ৭.২ পেঁপে, আনারস ও লিচুর জুস তৈরি

### ১। পেপের স্কোয়াশ

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| পেপের পাল্প | ২৫০ গ্রাম |
| চিনি | ৪০০ গ্রাম |
| পানি | ৩৩৬ মি.লি. |
| সাইট্রিক এসিড | ১৩ গ্রাম |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ০.৫-১ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পাল্প চালুনিতে ভালাভাবে ছেঁকে নিতে হবে এবং প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে তাপ দিতে হয়।

২. চুলা থেকে পাল্প নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে।

৩. পানি ও চিনি চুলায় নিয়ে ফুটাতে হবে এবং সাথে সাথে সাইট্রিক এসিড পরিমাণ মেশাতে হবে।

৪. প্রাপ্ত সিরাপ পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে তাপমাত্রা কমিয়ে আনতে হবে।

৫. সিরাপের তাপমাত্রা কমে গেলে তাতে পাল্প যোগ করে ভালোভাবে মেশাতে হবে।

৬. সোডিয়াম বেনজয়েট অল্প পানিতে গুলিয়ে স্কোয়াশে যোগ করতে হবে।

৭. জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলে স্কোয়াশ ভর্তি করে বায়ুরোধী করে বোতল সিল করতে হবে।

### ২। পেঁপের স্যুপ :

স্যুপ একটি অতি প্রয়োজনীয় খাবার। বিশেষ করে অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য খুবই উপকারী। শহর অঞ্চলে স্যুপ খাওয়ার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। সেক্ষেত্রে পেঁপের স্যুপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। পেঁপের স্যুপ তৈরির উপকরণগুলো নিম্নে দেয়া হলো -

| ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | সিদ্ধ পেপে কাটা | ১০০ গ্রাম |
| ২. | সিদ্ধ মুগের ডাল | ১০০ গ্রাম |
| ৩. | সয়াবিন তেল | ১৫ গ্রাম |
| ৪. | পেঁয়াজ কুচানো | ৫ গ্রাম |
| ৫. | লবণ | ৫ গ্রাম |
| ৬. | গোলমরিচের গুঁড়া | ৩ গ্রাম |
| ৭. | পানি | পরিমাণমতো |

প্রস্তুত প্রণালি :

সর্বপ্রথমে পরিপুষ্ট ও দোষমুক্ত পেঁপে সংগ্রহ করে খোসা ছিলে ফেলতে হয়। তারপর পেঁপেকে ৪-৫ টুকরা করে কেটে পরিমাণ মতো পানি নিয়ে চুলায় সিদ্ধ করতে হয়। পেঁপে ভালোভাবে সিদ্ধ হলে চুলা হতে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। । অতঃপর ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে বা শিল পাটায় বেটে নিতে হয়। মুগডাল ভালো করে ধুয়ে একটু ভেজে নিলে ভালো হয়।

পরিমাণমতো পানি নিয়ে মুগডাল সিদ্ধ করে নিতে হয়। অতঃপর পেঁপে বাটা, সিদ্ধ ডাল ও লবণ ভালো করে পানিতে গুলে মিশিয়ে নিতে হয়। তেলে পিঁয়াজ লাল করে ভেজে মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নিতে হয়। এরপর সম্পূর্ণ মিশ্রণটি চুলায় চাপিয়ে ফুটিয়ে নিতে হয়। অল্প আঁচে রেখে স্যুপে গোল মরিচেরগুঁড়া মিশিয়ে নামিয়ে ফেলতে হয়। স্যুপ গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

৩। আনারসের স্কোয়াশ :

স্কোয়াশ ফল বা সবজির রস বা পাল্প থেকে তৈরি একটি মিষ্টিজাতীয় ঘন পানীয়। আনারসের রস থেকে তৈরি করা স্কোয়াশ বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। দেহ ও মনে সতেজ অনুভূতি আনয়ন করে। এটি আরটিএস (Ready to Serve) বেভারেজের খুব কাছাকাছি। কৃত্রিম উপাদান পরিহার করে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আনারসের স্কোয়াশ তৈরি করা সম্ভব। নিচে আনারস স্কোয়াশ তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| আনারসের রস | ২৫০ গ্রাম |
| চিনি | ৪০৮ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিড | ১০-১১ গ্রাম (আনারসের টকের উপর নির্ভরশীল) |
| পানি | ৩৩১ মিলি লিটার |
| সোডিয়াম বেনজয়েট | ০.৫-১ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পাকা আনারস নির্বাচন করা প্রয়োজন।
২. আনারসের বোঁটা ছাড়িয়ে পানিতে ধুয়ে নেয়া হয়।
৩. খোসা ছাড়িয়ে আনারসের চোখও অক্ষীয় অংশ অপসারণ করে ছোট ছোট টুকরায় কাটা হয়।
৪. পাল্পার বা ব্লেন্ডারের সাহায্যে আনারস থেকে প্রথমে পাল্প ও পরে ছেঁকে পরিষ্কার রস নেয়া হয়।
৫. সিরাপের তাপমাত্রা কমে গেলে তাতে পাল্প যোগ করে ভালোভাবে মেশাতে হবে।
৬. প্রত্যেকটা উপকরণ আলাদা আলাদা মেপে নেয়া হয়।
৭. প্রাপ্ত পরিষ্কার রস চুলায় নিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। পাস্তুরাইজেশনের পরে রসকে ঠাণ্ডা হতে দেয়া হয়।
৮. কাপড়ের সাহায্য দ্রবণ ছেঁকে ঠাণ্ডা হতে দেয়া হয়।
৯. প্রস্তুতকৃত দ্রবণে পাস্তুরিত রস মিশানো হয়।
১০. সোডিয়াম বেনজয়েট হালকা গরম পানিতে গুলিয়ে স্কোয়াশে যোগ করা হয়।
১১. প্রস্তুতকৃত স্কোয়াশ জীবাণুমুক্ত শুষ্ক বোতলে ঢেলে বায়ুরোধী করে সিল করা হয়।

৪. আনারসের শরবত :

পানীয় হিসেবে আমরা শরবত সব সময় খেয়ে থাকি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের সময় শহরে বন্দরে ঠাণ্ডা বরফের শরবত বিক্রি করতে দেখা যায়। দ্রুত মেহমানকে আপ্যায়নের জন্য এক টুকরা লেবু দিয়ে ঠাণ্ডা শরবত বানিয়ে পরিবেশন করা হয়।

এক্ষেত্রে আনারসের শরবত হলে খুবই ভালো হয়। শরবত তৈরির উপকরণ নিম্নরূপ :

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| আনারসের রস | ২৫০ মি.লি |
| চিনির সিরাপ | ৬০ মি.লি |
| লেবুর রস | ১৫ মি.লি |
| ঠাণ্ডা পানি | ২৫০ মি.লি |

প্রস্তুত প্রণালি :

পরিপক্ব দোষমুক্ত আনারস লম্বালম্বি দুই টুকরা করে কাটতে হয়। তারপর চামচ দিয়ে ভিতরের নরম অংশ কুরিয়ে নিতে হবে। ১০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিতে হয়। তারপর মোটা চালুনিতে রস ছেঁকে নিতে হয়। এর সাথে পানি, সিরাপ, আনারসের রস ও লেবুর রস একত্রে মিশাতে হয়। এরসঙ্গে বরফকুচি দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজন হলে শরবতে সামান্য লবণ দিয়ে পরিবেশন করা যায়।

৫. লিচুর স্কোয়াশ

মনে করি প্রস্তুতকৃত স্কোয়াশে বিভিন্ন উপকরণগুলোর উপস্থিতি থাকবে নিম্নবর্ণিত হারে।

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| পাল্প | ২৫% |
| চিনি | ৪৫% |
| এসিডিটি | ১.২৫% |
| কেএমএস | ০.০৫% |

আরও ধরা যাক, লিচুর পাল্পের টিএসএস ও এসিডিটি পাওয়া গেল যথাক্রমে ১২% ও ০.৩০%। এ হিসাবে ১ কেজি স্কোয়াশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হবে।

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| পাল্প | ২৫০ গ্রাম |
| চিনি | ৪২০ গ্রাম |
| সাইট্রিক এসিডি | ১১.৭৫ গ্রাম |
| পানি | ৩১৭.৭৫ মি. লিটার |
| কেএমএস | ০.৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পাকা লিচু থেকে পাল্প সংগ্রহ করে ভালোভাবে ব্লেন্ডিং করা হয়।
২. সবগুলো উপকরণ পৃথক পৃথকভাবে পরিমাপ করা হয়।
৩. পরিমাপকৃত পাল্প প্রায় ৩০ মিনিট পাস্তুরিত করে ঠাণ্ডা হতে দেয়া হয়।
৪. চিনি, পানি ও সাইট্রিক এসিড একত্রে যোগ করে তাপ প্রয়োগে মিশ্রণ ফুটিয়ে নেয়া হয় ও ছেঁকে ঠাণ্ডা হতে দেয়া হয়।

৫. প্রস্তুতকৃত সিরাপ ও পাল্প ভালোভাবে মেশানো হয় ও তাতে কেএমএস অল্প পানিতে গুলিয়ে যোগ করা হয়।

৬. স্কোয়াশ জীবাণুমুক্ত বোতলে ভর্তি করে বায়ুরোধী করে সিল করা হয়।

বাজারজাতকরণ : এদেশে লিচু সরাসরি ফল হিসেবে খাওয়া হয়। প্লাস্টিকের ছোট পাত্রে যে লিচুর জ্যাম পাওয়া যায় তা কৃত্রিম। লিচু প্রক্রিয়াজাত করে জ্যাম, স্কোয়াশ ও জুস বিক্রি করে ব্যবসা শুরু করা যায়।

## ৭.৩ পেঁপে ও আনারসের জ্যাম ও জর্দা

আনারসের জ্যাম :

আনারসের জ্যামের জন্য নিম্নের উপকরণগুলো সংগ্রহ করতে হয়-

| ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | আনারসের রস বা জুস | ১.৫ কেজি |
| ২. | চিনি | ১.৮ কেজি |
| ৩. | সাইট্রিক এসিড | ১০ গ্রাম |
| ৪. | পেকটিন | ৪০ গ্রাম |
| ৫. | কেএমএস | ২ গ্রাম |
| ৬. | আনারসের ফ্লেভার | ০.৪ মি. লি |
| ৭. | আনারসের ইমালশন | ০.৪ মি. লি |

প্রস্তুত প্রণালি :

পরিপক্ব ও উন্নতমানের আনারস ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হয়। জ্যাম তৈরির যন্ত্রপাতি ও বাসনপত্র উত্তমরূপে ফুটানো পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। ধারালো স্টিলের ছুরি দিয়ে আনারসের চোখসহ খোসা অপসারণ করতে হয়। আনারসের মাঝের শক্ত অংশ ফেলে দিতে হয়। আনারস ছোট ছোট টুকরা করে মেশিনে ব্লেন্ড করে ভালোভাবে ছেঁকে নিতে হয়। চিনি এবং পেকটিন শুকনা অবস্থায় মিশানো হয়। এর সাথে তৈরিকৃত আনারসের পাল্প মেশাতে হয়। চিনি, পেকটিন এবং পাল্পের মিশ্রণ চুলায় দিয়ে ফুটিয়ে নেওয়ার সময় অনবরত নাড়তে হয়। যখন মিশ্রণের টিএসএস ৬০% এর মতো হয় তখন সাইট্রিক এসিড যোগ করতে হয়। তারপর মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে উঠিয়ে দেখতে হয়। যাতে চামচ থেকে মিশ্রণটি স্রোতের মতো না পড়ে। শিট আকারে পড়লে এবং পানিতে কয়েক ফোঁটা ফেললে যদি তা নিচে এমনভাবে পড়ে যে, তা পানির সাথে একদম মেশে না, তখন বুঝতে হবে জ্যাম তৈরি হয়েছে। মিশ্রণের ঘনত্ব বা টিএসএস যখন ৬৫-৬৭% পর্যন্ত হলে তখন চুলা থেকে মিশ্রণ নামাতে হয়। এর সাথে কেএমএস দ্রবণ মিশাতে হয়। আগেই জ্যামের বোতলগুলো গরম করে জীবাণুমুক্ত করে শুকিয়ে রাখা হয়। গরম অবস্থায় তৈরি জ্যাম বোতলে ভরতে হয়। পরের দিন যখন দেখা যাকে সে জ্যাম জমে গেছে তখন শুকনা ন্যাকড়া দিয়ে বোতলের উপরের দিকের গায়ে লেগে থাকা জ্যাম মুছে ফেলে মোম গরম করে জ্যামের উপর ঢেলে দিতে হয়। এমনভাবে মোম দিতে হয় যাতে জ্যামের কোনো অংশ দেখা না যায়। তারপর বোতলের মুখের ঢাকনা লাগাতে হয় এবং বোতলের পুরো গা ভেজা কাপড় দ্বারা মুছে দিতে হয়। শুষ্ক, ঠাণ্ডা, আলোকবিহীন জায়গায় গুদামজাত করতে হয়।

আনারসের জেলী :

জেলি একটি অর্ধসুস্বাদু খাদ্য যা ৪৫% ফলের রস ও ৫৫% চিনির মিশ্রণে তৈরি করা হয়। জেলিতে টিএসএস -এর পরিমাণ ৬৫-৬৭. ভাগ থাকতে হয় । ফলে যদি পেকটিন ও এসিড কম থাকে তবে পেকটিন ও এসিড যোগ করা হয়।

আনারসের জেলীর উপকরণসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো।

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| ১। আনারসের রস | ৪৫ গ্রাম |
| ২। চিনি | ৫৫০ গ্রাম |
| ৩। পেকটিন | ৫ গ্রাম |
| ৪। সাইট্রিক এসিড | ৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

প্রথমে পরিপক্ব, দোষমুক্ত, টাটকা মোটামুটি একই জাতের আনারস বাছাই করে সংগ্রহ করতে হয়। তারপর আনারসের সব পাতা ও মুকুট ফেলে দিতে হয়।

স্টেইনলেস স্টিলের ছুরি দিয়ে আনারসের সব খোসা ভালোভাবে ছিলে ফেলতে হয়, যাতে কোনো চোখ না থাকে। আনারসের মাঝের অংশ যা কোর বা শক্ত অংশ তা ফেলে দিতে হয়। স্টীলের ছুরি দিয়ে আনারসকে ছোট ছোট টুকরা করতে হয়। ব্লেন্ডিং মেশিনে আনারসের টুকরাগুলো দিয়ে ২-৩ মিনিট চালালে সমস্ত আনারস ব্লেন্ড হয়ে যাবে। পরিষ্কার পাটায় বেটেও রস সংগ্রহ করা যেতে পারে। পাতলা, স্বচ্ছ, সাদা কাপড় দিয়ে রসকে ভালোভাবে ছেঁকে নিতে হয়। এরপর রস, চিনি ও পেকটিন সঠিকভাবে ওজন করে এবং ভালোভাবে মিশিয়ে চুলায় বসিয়ে উত্তপ্ত করতে হয়। মিশ্রণের বা দ্রবণের টিএসএস যখন ৬৫-৬৭ ভাগ এর মধ্যে দেখা দিলে বা চামচের সাহায্যে পরীক্ষা করে অর্ধকঠিন মনে হলে পাত্রটি তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলতে হবে। নামাবার ২-৩ মিনিট পূর্বে সাইট্রিক এসিড যোগ করতে হবে। জেলি সংরক্ষণের জন্য কাচের বোতল ও মুখকে গরম পানিতে ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। শুষ্ক জীবাণুমুক্ত বোতলের উপরিভাগের ১/৮ ইঞ্চি জায়গা খালি রেখে জেলি ভরতে হবে। বোতলের উপরিভাগে গলানো মোম দিয়ে বোতলের মুখ ভালোভাবে আটকিয়ে দিতে হবে। শুষ্ক, পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত জায়গায় বোতলগুলো রেখে ঠাণ্ডা করতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত লেবেলের সাহায্যে লেবেলিং করতে হবে এবং জেলি খাবারের জন্য পরিবেশন করা যাবে।

চিত্র : আনারসের জেলী

আনারসের জর্দা :

বিয়েবাড়ি বা বড় কোনো নিমন্ত্রণের পর মিষ্টি জর্দা খেতে দেওয়া একটি রেওয়াজ। খাবারের পর এ ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবারকে ডেজার্ট বলে। সেই জর্দা যদি আনারসের জর্দা হয় তবে তা খেতে নিশ্চয়ই বেশি আকর্ষণীয় হবে। আনারসের জর্দার উপকরণ নিম্নরূপ-

| উপকরণ | পরিমাণ | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১। পোলাও চাল | ১ কেজি | ৭। ঘি | ২০০ গ্রাম |
| ২। লেমন ইয়েলো কালার | সামান্য | ৮। চিনি | ৪০০ গ্রাম |
| ৩। কুরানো আনারস | ৫ কেজি | ৯। কিসমিস | ৪০ গ্রাম |
| ৪। দারচিনি | ৪ টুকরা | ১০। পেস্তা বাদাস | ১০টি |
| ৫। এলাচ | ৫টি | ১১। মাওয়া | ৫০ গ্রাম |
| ৬। লবঙ্গ | ৩টি | | |

প্রস্তুত প্রণালি :

চুলায় সসপ্যান চাপিয়ে পরিমাণমতো পানিতে রং দিয়ে ফুটাতে হয়। চাল ধুয়ে ফুটানো পানিতে দিয়ে নাড়তে হয়। ঠিকমতো ভাত সিদ্ধ হলে মাড় ফেলে দিয়ে বাতাসে ভাত ছড়িয়ে রেখে দিতে হয়। যে হাঁড়িতে জর্দা রান্না হবে তাতে চিনি নিয়ে আধা কাপ পানি মিশাতে হয়। তারপর তাতে এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ দিয়ে মৃদু জ্বালে চুলায় দিতে হয়। চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে হয়। চিনি গলে গেলে কুরানো আনারস ও ঘি দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করতে হয়। আনারস সিদ্ধ হলে ভাত দিয়ে নাড়তে হয়। পানি শুকিয়ে আসলে হাঁড়ি ঢেকে উপরে, নিচে এবং চারপাশ কাঠ-কয়লার আগুনে দম দিতে হয় বা অল্প জ্বালে রেখে দিতে হয় বা ওভেনে রাখতে হয়। রান্না হয়ে গেলে হাঁড়ি নামিয়ে খোলা বাতাসে রেখে ঠাণ্ডা করতে হয়। ঠাণ্ডা হলে চামচ দিয়ে নেড়ে ঝরঝরে করতে হয়।

আনারসের মোরব্বা :

পরিপুষ্ট, পাকা উন্নত মানের একটি আনারস ১ কেজি চিনি ও ২ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট দিয়ে আনারসের মোরব্বা তৈরি করা যায়। প্রথমে আনারসের খোসা ছাড়িয়ে, চোখ উঠিয়ে, মাঝের অংশ বাদ দিয়ে বাকি আনারস টুকরা টুকরা করে কাটা হয়। তারপর ফুটন্ত পানিতে ৬-৭ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরাতে হয়। আনারসের টুকরাগুলো কাঁটা চামচ দিয়ে সাবধানে খোঁচাতে হয়। ১ কেজি চিনি ৩ কাপ পানিতে গুলে রস তৈরি করে চুলায় ফুটাতে হয়। এ রসে আনারসের টুকরাগুলো ৫-৭ মিনিট হয়। তারপর ১ দিন রেখে পরদিন ৫-৭ মিনিট মোরব্বাগুলো ফুটাতে হয়। এভাবে ৫-৬ দিন জ্বাল দিতে হয়। চিনি বেশি ঘন হয়ে এলে ২ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট পানিতে গুলে মোরব্বার সাথে মিশাতে হয়। এ মোরব্বা বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

পেঁপের জ্যাম :

নিম্নলিখিত পরিমাণ উপাদান উল্লিখিত পরিমাণে ব্যবহার করে জ্যাম তৈরি করা যায়।

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| পাকা পেঁপের পাল্প | ১ কেজি |
| চিনি | ১ কেজি |
| সাইট্রিক এসিড | ১১ গ্রাম |
| পেকটিন | ১৬গ্রাম |
| কেএমএস | ১৬গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পেঁপের বহিরাবরণ ও বিচি অপসারণ করার পর পেঁপে ছোট ছোট টুকরা কেটে নিতে হয়।
২. ব্লেন্ড করে পাল্প করতে হয়।
৩. চিনি এবং পেকটিন ভালোভাবে মিশাতে হয়।
৪. তাতে পাল্প যোগ করে মিশাতে হয়।
৫. চুলায় দিয়ে অনবরত নাড়তে হয়।
৬. টি এস এস যখন ৬৭.৫% হবে তখন চুলা থেকে সিরাপ নামিয়ে সাইট্রিক এসিড যোগ করে মেশাতে হয়।
৭. হালকা গরম পানিতে ভালোভাবে কেএমএস মিশিয়ে জ্যামের সাথে যোগ করতে হয়।
৮. বোতলে ভরতে হয়।
৯. বোতলের গা ও মুখ শুকনা কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হয়।
১০. ফুটন্ত তরল মোম বোতলের মুখে এমনভাবে দিতে হয় যাতে জ্যাম সম্পূর্ণভাবে মোমের নিচে ঢাকা থাকে।
১১. ছিপি আটকিয়ে বোতলের গায়ে লেবেল লাগাতে হয়।
১২. শুষ্ক, আলোবিহীন ও কম তাপমাত্রার (২° সে - ১৫° সে.) গুদামজাত করতে হয়।

৭.৪ পেঁপের হালুয়া

পেপের হালুয়া : পেঁপের হালুয়া খুবই মজাদার একটি খাবার এর তৈরির উপকরণগুলো হচ্ছে–

| ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমাণ | ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সিদ্ধ পেঁপে বাটা | ২৫০ গ্রাম | ৫ | গোলাপজল | ৩ মিলি |
| ২ | চিনি | ২৫০ গ্রাম | ৬ | কিসমিস | ৫ গ্রাম |
| ৩ | ঘি বা তেল | ১০ গ্রাম | ৭ | বাদাম কুঁচি | ৫ গ্রাম |
| ৪ | এলাচ গুঁড়া | ৩ গ্রাম | | | |

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপুষ্ট, নিখুঁত ভালো পেপে সংগ্রহ করে খোসা ছিলে টুকরা টুকরা করে কেটে নিতে হয়। তারপর পরিমাণমতো পানি দিয়ে পেঁপে সিদ্ধ করে নিতে হয়। হালুয়ার জন্য পরিমাণমতো পেঁপে বেটে নিতে হয়। চুলায় কড়াই চাপিয়ে তেল বা ঘি গরম করে নিতে হয়। তেল গরম হলে কিসমিস বাদাম ও কেওড়ার পানি ছাড়া অন্যান্য সব উপকরণ একসাথে মিশিয়ে তেলে ছেড়ে দিতে হয়। চুলায় জ্বাল দেবার সময় ঘন ঘন নাড়তে হয়। পানি শুকিয়ে বাদামি রং ধারণ করলে কেওড়ার পানি দিয়ে নামিয়ে নিতে হয়। হালুয়া প্লেটে সাজিয়ে উপরে কিসমিস ও বাদাম কুচি ছড়িয়ে দিতে হয়। ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করতে হয়।

চিত্র : পেঁপের হালুয়া

পেঁপের-প্রিজার্ভ বা মোরব্বা : সদ্য বানানো পেঁপের প্রিজার্ভ দেখতে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। স্বাদও বেশ ভালো। উপযুক্তভাবে পরিপক্ব ফল থেকে প্রিজার্ভ তৈরির জন্য আস্তফল বা বড় বড় টুকরায় কাটা ফল ব্যবহার করা হয়। খুব ঘন চিনির দ্রবণে এগুলো রেখে নরম এবং স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত তাপ দেয়া হয়। সাধারণত ৪৫% ফলের সাথে ৫৫% চিনি যোগ করে ততক্ষণ তাপ দেয়া হয় যতক্ষণ না দ্রবণের মধ্যে চিনির ঘনমাত্রা কমপক্ষে ৬৮% হয়। স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ০.৫% সাইট্রিক এসিড চূড়ান্ত সিরাপে যোগ করা যেতে পারে।

কখনও কখনও সংরক্ষণের জন্য উত্তপ্ত সিরাপ থেকে ফল তাড়াতাড়ি আলাদা করে নিয়ে শুষ্ক জীবাণুমুক্ত বোতলে ভর্তি করা হয়। তারপর ৬৮% ঘনমাত্রার সিরাপ এতে যোগ করে ৬-৮ মিনিট বাষ্পীয় অবস্থায় অথবা ফুটন্ত পানিতে বোতল রেখে বোতলের মধ্য বা উপরিভাগ থেকে বায়ু দূর করে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করা হয়।

৭.৫ লিচুর ক্যান্ডি

সিরাবিহীন শুকনা মোরব্বাকেই ক্যান্ডি বলে। ক্যান্ডিতে মোরব্বার চেয়ে বেশি চিনি প্রয়োগ করতে হয়। ক্যান্ডি তৈরিতে আখের চিনি ও গ্লুকোজ ৩ : ১ অনুপাতে ব্যবহার করা হয়। আম, আনারস, কমলালেবু হতে ক্যান্ডি করা যায়। পুরোপুরি পাকেনি অথচ পুষ্ট এবং ফলে রং ধরেছে এরূপ লিচু নিতে হবে। লিচুর খোসা ও বীজ ফেলে মাঝের যে শাঁস থাকে তাকে দুই টুকরা করে কেটে নিতে হবে। তারপর আমের ক্যান্ডি করার একই প্রক্রিয়ায় চিনির সিরার জ্বাল দিয়ে ৩০° ব্রিক্স থেকে শুরু করে ৭৫° ব্রিক্স পর্যন্ত করতে হবে। প্রতিদিন জ্বাল দিয়ে ৫° ব্রিক্স করে বাড়াতে হবে। এরপর লিচুর ক্যান্ডি তৈরি হলে তা সেলোফেন শিটে মুড়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

## অনুশীলনী -৭

### অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আনারস, পেঁপে ও লিচুর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
২. আনারস চাষে কোন দুটি দেশ সবচেয়ে এগিয়ে আছে?
৩. বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় আনারস উৎপাদন হয়?
৪. বাংলাদেশে কোন কোন জাতের আনারস উৎপাদন হয়?
৫. কখন পাকা পেঁপে পাড়ার উপযুক্ত হয়?
৬. কাঁচা পেঁপেতে যে দুটি এনজাইম থাকে তাদের নাম কী?
৭. কাঁচা পেঁপের এনজাইম কী কাজ করে?
৮. আনারস থেকে উৎপাদিত কয়েকটি খাদ্যের নাম লেখ।
৯. কাঁচা পেঁপের পেপিন নামক জারক রস কী কাজ করে?
১০. ৫০ গ্রাম পাকা পেঁপে হতে আমরা কী পেয়ে থাকি?
১১. পেঁপে থেকে আমরা কী কী খাবার পাই?
১২. পেঁপের স্যুপ তৈরির উপকরনগুলো কী কী?
১৩. RTS বেভারেজ মানে কী?
১৪. জেলীতে TSS পরিমাণ কত হতে হবে?
১৫. পেঁপের হালুয়া তৈরিতে কী কী উপকরণ লাগে?

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আনারসের পরিচিতি লেখ।
২. পেঁপের পরিচিতি লেখ।
৩. আনারস ও পেঁপের পুষ্টিমান লেখ।
৪. আনারসের স্কোয়াশ তৈরির উপকরণগুলো কী কী?
৫. আনারসের শরবত কীভাবে তৈরি করে?
৬. লিচুর স্কোয়াশ তৈরির উপকরণ কী কী?
৭. আনারসের জর্দা তৈরির উপকরণ কী কী?
৮. পেঁপের মোরব্বা কীভাবে তৈরি হয়?

### রচনামূলক প্রশ্ন

১. আনারস, পেঁপে ও লিচুর পুষ্টিমান ও পরিচিতি দাও।
২. পেঁপে, আনারস ও লিচু হতে স্কোয়াশ তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৩. আনারসের জ্যাম, জেলী ও জর্দা তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
৪. আনারস ও পেঁপের মোরব্বা, পেঁপের জ্যাম ও হালুয়া তৈরির উপকরণ ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।

# অধ্যায়-৮
# কুল, আমড়া, চালতা, তেঁতুল, করমচা, জলপাই ও আমলকী থেকে খাদ্য

## ৮.১ কুল, আমড়া, চালতা, তেঁতুল, কামরাঙ্গা, জলপাই, আমলকীর পরিচিতি

### বরই বা কুলের পরিচিতি

স্বাদ পুষ্টিগুণ ও প্রাপ্যতার বিচারে কুল বা বরই এ দেশের মানুষের কাছে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশের সর্বত্রই বরই উৎপাদন হয়। আমাদের দেশে পাকা বরই সরাসরি ফল হিসেবে খাওয়া হয়। বরই হতে উন্নত মানের আচার ও চাটনি তৈরি হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বরই চাটনি ও আচার তৈরি করে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড করে থাকে। পাকা বরই সূর্যালোকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং অনেক সময় পাউডার করেও ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বরই ক্ষত, আলসার নিরাময়ে, ফুসফুসের রোগ ও জ্বরে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

তেঁতুলের পরিচিতি : তেঁতুল বাংলাদেশের বহুল পরিচিতি একটি অম্লীয় ফল। দেশের সর্বত্রই কম-বেশি তেঁতুল উৎপন্ন হয়। তেঁতুলের পাল্প সরাসরি বা প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়া হয়। অনেকে তেঁতুলের বীজ ভেঙ্গে খেয়ে থাকেন। আমাদের দেশের তেঁতুল বেশ টক কিন্তু থাইল্যান্ডে উৎপাদিত তেঁতুল কিছুটা মিষ্টি স্বাদযুক্ত। তেঁতুলজাত সামগ্রী ক্ষুধা ও রুচিবর্ধক হিসেবে কাজ করে, চর্বি ও কোলেস্টেরল না থাকায় উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি থাকে না এবং তেঁতুলের জুস দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে থাকে। তেঁতুলের চাটনি বানিয়ে ব্যবসা করেছে প্রাণ, স্কয়ার, বিডি ফুড প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে থাইল্যান্ড ও ভারত তেঁতুল সামগ্রী নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের পক্ষেও এটি সম্ভব। তবে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের গুণগত মান অতি উন্নত হতে হবে। তেঁতুল হতে জুস, শরবত, চাটনি, সস, ক্যান্ডি, পাউডার ও জ্যাম তৈরি করা সম্ভব।

জলপাই পরিচিতি : জলপাই একটি টকজাতীয় ফল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল অর্থাৎ ইতালি, স্পেন, গ্রিস, তুরস্ক, সিরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে মোট উৎপাদনের ৯৬% জলপাই উৎপাদন হয়। বাংলাদেশেও কমবেশি জলপাই হয়ে থাকে। দেশে জলপাই সরাসরি বা আচার বা চাটনি বানিয়ে খাওয়া হয়ে থাকে। জলপাই ব্যবহারের পূর্বে গাঁজন করে নেওয়া ভালো। ভোজ্যতেলের মধ্যে জলপাইয়ের তেল অতি উন্নত মানের এবং কোলেস্টেরলমুক্ত। এই তেলে লিনোলেনিক এসিড ৭০% এর বেশি রহিয়াছে যা খুবই উপকারী।

আমড়ার পরিচিতি :

আমড়া আমাদের দেশের সুপরিচিত ও সমাদৃত ফল। বৃহত্তর বরিশাল ও সাতক্ষীরায় এর সবচেয়ে বেশি ফলন হয়। আমড়া খেতে বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এতে প্রচুর ভিটামিন এ, বি, লৌহ, ক্যালসিয়াম ও খনিজ লবণ আছে। আমড়ার মৌসুমে ঝাল-লবণ মাখানো আমড়া বাচ্চা থেকে বয়স্ক মানুষের নিকট লোভনীয় খাবার হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে বৃহত্তর বরিশালের আমড়া যা বিলাতি আমড়া নামে বেশ জনপ্রিয়। এর চাষ করা খুব কঠিন নয়। এর কিছু ঔষধি গুণও রয়েছে। আমড়া পিত্ত ও কফ নিবারক, আমনাশক ও কণ্ঠস্বর পরিষ্কারক।

চালতার পরিচিতি :

দেশের সর্বত্রই এটি বুনো গাছ হিসেবে জন্মে থাকে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবনে ও সিলেট এলাকায় ভালো হয়। চালতায় কম-বেশি পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কচি ফল পেটের গ্যাস, কফ, বাত ও পিত্তনাশক। পাকা ফলের রস চিনিসহ পান করলে সর্দিজ্বর উপশম হয়।

করমচার পরিচিতি :

করমচা ছোট কিন্তু আকর্ষণীয় ফল। দেশের সব জায়গাতেই এই গাছ চোখে পড়ে। টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদীতে বেশি দেখা যায়। ফলটি খাদ্যগুণে ভরপুর। এই ফল থেকে পাওয়া যায়- প্রচুর ভিটামিন 'সি', পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। কাঁচা করমচা গায়ের ত্বক ও রক্তনালি শক্ত ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। করমচার লাল সাদা ও বেগুনি ফল হতে দেখা যায়। শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং ভাদ্র মাসে ফল পাকে।

আমলকীর পরিচিতি :

আমলকী অবহেলিত মূল্যবান ফসল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সিলেট এলাকায় আমলকী চাষ বেশি হয়। বাংলাদেশের কোন ফলে এত বেশি ভিটামিন সি নেই বিধায় এ ফলকে ভিটামিন সি -এর রাজা বলে। প্রতি ১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী আমলকী ফলে ৪৬৩ মি. গ্রা. ভিটামিন সি রয়েছে। এ পরিমাণ ভিটামিন মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা হতে অনেক বেশি। প্রতিদিন শিশুদের ২০ মি. গ্রাম এবং বয়স্কদের ৪০ মি গ্রা, ভিটামিন 'সি' দরকার হয়। আমলকী মৌসুমে এ পরিমাণ ভিটামিন 'সি' এর চাহিদা মিটানো খুব সহজ হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ভিটামিন সি-এর অভাবে মারাত্মক রোগে ভুগছে। তাই সরকারের উচিত এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা। এ ছাড়া আমলকীর রস যকৃৎ, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমূত্র , অজীর্ন ও জ্বর নিরাময়ে বিশেষ উপকারী।

দেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং ফল ও সবজির বিরাট অংশের অপচয় রোধকল্পে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বিকল্প নেই। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান ফল ছাড়াও অন্যান্য ফলের মধ্যে কুল বা বরই, আমড়া, চালতা, তেঁতুল, করমচা, জলপাই, কামরাঙ্গা, বেল, আমলকী ইত্যাদি যথেষ্ট পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল। এগুলো মৌসুমের সময় প্রক্রিয়াজাত করলে ফলের অপচয় কমে, চাষিরা ন্যায্য মূল্য পান, পুষ্টি সংরক্ষণ হয় এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য সারা বছর পাওয়া যায়। এ সকল ফলের পুষ্টিমান নিম্নের ছকে দেয়া হলো :

| পুষ্টি উপাদান | কুল | আমড়া | চালতা | তেঁতুল | | জলপাই | জাম | আমলকী | বেল | করমচা | কামরাঙ্গা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | কাঁচা | পাকা | | | | | | |
| আমিষ (গ্রামে) | ২.৯ | ১.২ | ০.৮ | ১.১ | ১৩.৯ | ১.০ | ১.০ | ০.৯ | ২.৬ | ১.১ | ০.৫ |
| শ্বেতসার (গ্রামে) | ২৩.৮ | ১৫ | ১৩.৪ | ৩.১ | ৬৬.৪ | ১৬.২ | ১.৪ | ৬.৯ | ১৮.৮ | ২.৯ | ৯.৫ |
| চর্বি (গ্রামে) | ০.১ | ০.১ | ০.২ | ০.২ | ০.১ | ০.১ | ০.৮ | ০.১ | ০.২ | ২.৯ | ১ |
| খনিজ লবণ (গ্রামে | ১. | ০.৬ | ০.৮ | ১.২ | ২.৯ | ০.৭ | ০.১ | ০.৭ | ০.৯ | ০.৬ | ০.৪ |
| ভিটামিন বি১ (মি. গ্রা) | ০.২ | ০.২৫ | - | ০.০১ | | ০.০৩ | ০.০৯ | ০.০২ | ০.৩ | - | ০.১২ |
| ভিটামিন ২ (মি. গ্রা) | ০.৫ | ০.৪ | - | ০.০২ | ০.৭ | ০.০১ | ০.০২৪ | ০.০৮ | ০.০২ | - | ০.০৪ |
| ভিটামিন সি (মি.গ্রা) | ৫১ | ৯৫ | - | ৬ | ৩ | ৩৯ | ৬০ | ৪৮৩ | ৯ | - | ৬১ |
| ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.) | ১১ | ৫৫ | ১৬ | ২৪ | ১৭০ | ২২ | ২২ | ৩৪ | ৩৮ | ২.১ | ১১ |
| লৌহ (মি.গ্রা.) | - | ৩.১ | - | - | ১০.৯ | ৩.১ | ৪.৩ | ১.২ | ০.৩৬ | - | ১.২ |
| ক্যারোটিন (মাই গ্রা.) | - | ৮০০ | - | - | ৬০ | - | ১২০ | - | - | - | অল্প |
| খাদ্যশক্তি (কি. ক্যা) | ১০৪ | ৬৬ | ৫৯ | ৬২ | ২৮৩ | ৭০ | ১১ | ৯৬ | ৮৭ | ৪২ | ৫০ |

২০২০

চিত্র : কুল, চালতা, তেঁতুল, করমচা ও আমলকী

৮.২ কুল, আমড়া, চালতা, তেঁতুল, করমচা, জলপাই ও আমলকীর আচার ও চাটনি

বরই-এর চাটনি : বরই বা কুল আমাদের দেশেল অন্যতম ফল। সাধারণত দেশি বরই হতেই আচার বা চাটনি তৈরি করা হয়। স্কুল-পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরা এই চাটনি খুবই পছন্দ করে।

বরই-এর চাটনি তৈরির উপকরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | পাকা বরই | ১ কেজি | ৬. | কালজিরা | ৩ গ্রাম |
| ২. | আখের গুড় | ১ কেজি | ৭. | শুকনা মরিচের গুঁড়া | ৫ গ্রাম |
| ৩. | লবণ | ৫০ গ্রাম | ৮. | সরিষার গুঁড়া | ১০ গ্রাম |
| ৪. | জিরা | ৫ গ্রাম | ৯. | ভিনেগার | ১০ গ্রাম |
| ৫. | মেথি | ২ গ্রাম | ১০. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ |

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে পরিষ্কার ও দোষমুক্ত পাকা বাছাই করা বরই সংগ্রহ করে বোঁটা ফেলে ভালো করে পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। ১ কেজি গুড়ে ৭৫ মি.লি. পানি চুলায় জ্বাল দিয়ে রস করে নিতে হয়। রস ঘন হয়ে ফুটে উঠলে বরই ও লবণ দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। এরপর বরই এ ভিনেগার যোগ করে জ্বাল দিতে হয়। একটু গরম পানিতে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলে বরই এর সাথে মিশিয়ে নিতে হয়। রস ফুটাতে হয় এবং ঘন করে বরই এর গা মাখা করা হয়। সমস্ত মসলা শুকনো কড়াইয়ে ভেজে গুঁড়ো করে বরই-এর সাথে মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিতে হয়। চাটনি হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা করে গরম সরিষার তেল মিশাতে হয়। তারপর জীবাণুমুক্ত কাচের স্বচ্ছ বোতলে চাটনি ভরে বায়ুরোধী করে মুখ বন্ধ করে দিতে হয়।

২. বরই ও তেঁতুলের (বরতুলের) চাটনি : আচার ও চাটনির বাজারে বরতুলের চাটনি একটি নতুন সংযোজন। এতে একই সাথে বরই ও তেঁতুলের টক-মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়। এই বরতুলের চাটনির উপকরণ নিম্নে দেওয়া হলো –

প্রয়োজনীয় উপাদান :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | পাকা শুকানো বরই | ১ কেজি | ১০. | লবণের গুঁড়া | ০১ গ্রাম |
| ২. | তেঁতুল | ২৫০ কেজি | ১১. | দারচিনির গুঁড়া | ১ গ্রাম |
| ৩. | চিনি | ১ কেজি | ১২. | গোলমরিচের গুঁড়া | ১ গ্রাম |
| ৪. | লবণ | ৩৮ গ্রাম | ১৩. | জয়ফল | ১ গ্রাম |
| ৫. | মেথির গুঁড়া | ৫ গ্রাম | ১৪. | জৈয়ত্রী | ১/২ গ্রাম |
| ৬. | কালিজিরা | ১০ গ্রাম | ১৫. | সরিষার তেল | ১০০ মি.লি. |
| ৭. | শুকনা মরিচ গুঁড়া | ৬ গ্রাম | ১৬. | এসিটিক এসিড | ৫.২৫ মি.লি. |
| ৮. | সরিষার গুঁড়া | ১২ গ্রাম | ১৭. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |
| ৯. | জিরার গুঁড়া | ৩ গ্রাম | | | |

প্রয়োজনীয় উপাদান :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | শুকনা বরই | ১ কেজি | ৬. | লবণ | ১০ গ্রাম |
| ২. | চিনি | ৩৫০ গ্রাম | ৭. | শুকনা মরিচ | ৫ গ্রাম |
| ৩. | সরিষার তেল | ১৫০ গ্রাম | ৮. | পাঁচফোড়ন | ৫ গ্রাম |
| ৪. | আদা | ২০ গ্রাম | ৯. | জিরা | ৫ গ্রাম |
| ৫. | রসুন | ১০ গ্রাম | ১০. | ভিনেগার | ২৫০ গ্রাম |
| | | | ১১. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ০.৫ গ্রাম |
| | | | ১২. | পটাশিয়াম মেটাবাই সালফেট (কেএমএস) | ০.৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে পরিপুষ্ট দোষমুক্ত পাকা ও শুকনা লাল রঙের বরই সঠিক পরিমাণে সংগ্রহ করতে হয়। পোকাযুক্ত, কাঁচা ও খাওয়া বরই বাদ দিতে হয়। বরই এর বোঁটা ফেলে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। বরইগুলো এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। গ্রাইন্ডিং মেশিনের সাহায্যে মসলা অল্প পরিশ্রমে এবং কম সময়ে ভালোভাবে গুঁড়ো করা যায়। আদা, রসুন, শুকনা মরিচ, পাঁচফোড়ন ও জিরা সঠিক পরিমাণে নিয়ে শিলপাটায় বেটে নিতে হয়। বাটা মসলাগুলো ভিনেগারের সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। ব্লেন্ডারে ভিনেগারের সাথে মসলা দিয়েও ভালোভাবে মিশানো যেতে পারে। কড়াই বা সসপ্যানে সরিষার তেল গরম করে ভিনেগারে মিশ্রিত মসলা, লবণ ও চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দেওয়া মসলার সাথে পানি ঝরানো বরই দিয়ে আবারও ভালোভাবে জ্বাল দিতে হয়।

চুলা থেকে আচার নামিয়ে প্রতি কেজি আচারে ১ গ্রাম সংরক্ষক দ্রব্য বা প্রিজারভেটিভ হিসেবে আধা গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট ও আধাগ্রাম কেএমএস মিশাতে হয়। আচার রাখার জন্য কাচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফুটন্ত গরম পানিতে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয় এবং পানি ঝরিয়ে ফেলতে হয়।
বোতলের উপর কিছু অংশ খালি রেখে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকিয়ে দিতে হয়। শুষ্ক, পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত জায়গায় বোতলগুলো রেখে ঠান্ডা করতে হয়। অতঃপর লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করতে হয়।

আমড়ার প্রক্রিয়াজাত খাদ্য : আমড়া ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মুখরোচক ফল । বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এটি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। উৎপাদন মৌসুমে আমড়া কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয় এবং আমড়া দিয়ে নিম্নের খাদ্য তৈরি করা যায়-
ক) আমড়ার ঝাল আচার
খ) আমড়ার চাটনি
গ) আমড়ার মোরব্বা ইত্যাদি।

৪. আমড়ার ঝাল আচার
আমড়ার ঝাল আচারের উপকরণ নিম্নরূপ

| | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | পরিপক্ক কাঁচা আমড়া | ১ কেজি |
| ২. | লবণ | ২০ গ্রাম |
| ৩. | চিনি | ২৫ গ্রাম |
| ৪. | লাল মরিচ | ১২৫ গ্রাম |
| ৫. | পোস্তদানা | ২০ গ্রাম |
| ৬. | হলুদ | ৫ গ্রাম |
| ৭. | মেথি | ৫ গ্রাম |
| ৮. | সরিষার তেল | ৫০০ মি. লি. |
| ৯. | ভিনেগার | ১২৫ মি.লি. |
| ১০. | ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড | ১০ গ্রাম |
| ১১. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |

চিত্র : আমড়া কাটা হচ্ছে।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে দোষমুক্ত ও পরিপক্ক কাঁচা আমড়া সংগ্রহ করতে হয়। আমড়াগুলো পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হয়। স্টেইনলেস স্টিলের ছুরির সাহায্যে পাতলা আমড়ার খোসা বা ছাল ছিলে ফেলতে হয়। কাঁটা চামচের সাহায্যে খোসা ছাড়ানো আমড়াগুলো ছিদ্র করতে হয়। শতকরা ১ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে (১ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ৯৯ ভাগ পানি) ২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার পানিতে আমড়া ধুয়ে নিতে হয়। তারপর আমড়াগুলোকে ৪-৫ টুকরা করে কেটে আঁটি আলাদা করতে হয়।
ভিনেগারের সাথে হলুদের গুঁড়া, মেথির গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া ভালোভাবে মিশাতে হয়। কড়াই বা সসপ্যানে সরিষার তেল গরম করে এর মধ্যে ভিনেগার মিশ্রিত মসলা ঢেলে কিছুক্ষণ জ্বাল দেয়ার পর চিনি ও লবণ মিশিয়ে একটু জ্বাল দিয়ে কন্ডিমেন্ট সস তৈরি করতে হয়। কন্ডিমেন্ট সসে আমড়ার টুকরাগুলো দিয়ে আবারও

কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। আমড়ার টুকরাগুলো নরম হলে আচার চুলা থেকে নামিয়ে প্রতি কেজি আচারে ১ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট মিশাতে হয়। আচার রাখার জন্য কাচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফুটন্ত গরম পাতে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত বোতলে আমড়ার আচার ভরে বায়ুশূন্য করে বোতলের মুখ আটকে দিতে হয়। শুষ্ক, পরিষ্কার জায়গায় রেখে ঠান্ডা করে বোতলের গায়ে লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করা যায়।

৫. আমড়ার চাটনি : আমড়ার চাটনি উপকরণগুলো নিম্নরূপ-

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | আমড়ার পাল্প | ১ কেজি | ৮. | পাঁচফোড়ন গুঁড়া | ২০ গ্রাম |
| ২. | চিনি | ৩০০ গ্রাম | ৯. | আস্ত সরিষা | ৫ গ্রাম |
| ৩. | আদা কুচি | ৫০ গ্রাম | ১০. | লবণ | ১৫ গ্রাম |
| ৪. | রসুন কুচি | ৫০ গ্রাম | ১১. | ভিনেগার | ১৫০ গ্রাম |
| ৫. | হলুদের গুঁড়া | ১০ গ্রাম | ১২. | সরিষার তেল | ১৫০ মি.লি. |
| ৬. | মরিচের কুচি | ৫ গ্রাম | ১৩. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ০.৫ গ্রাম |
| ৭. | মেথি গুঁড়া | ৫ গ্রাম | ১৪. | পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট (কেএমএস) | ০.৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপুষ্ট, দোষমুক্ত ও পরিপক্ব আমড়া সংগ্রহ করতে হয়। আমড়াগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ধুতে হয়। এরপর স্টেইনলেস স্টিলের ছুরির সাহায্যে পাতলা করে আমড়ার খোসা বা বাকল ছিলে নিতে হয়। এরপর ধারালো ছুরির সাহায্যে আমড়া চাক চাক করে কেটে আঁটি বা বিচি আলাদা করতে হয়। চাকচাক করা আমড়ার টুকরাগুলোকে গরম পানিতে সিদ্ধ করে বাঁশের চালুনির সাহায্যে আমড়ার পাল্প বা শাঁস বের করতে হয়। আদা কুচি, রসুন, কুচি, হলুদ গুঁড়া ও মরিচ কুচি ভিনেগারের সাথে মিশিয়ে ব্লেন্ডিং মেশিনে ব্লেন্ড করতে হয়। অথবা শিল-পাটায় মসলা বেটে নিতে হয়। কড়াইতে গরম তেলে আস্ত সরিষা ভেজে নিয়ে ভিনেগার মেশানো মসলাগুলো ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। চুলায় ভিনেগার মিশানো মসলাগুলোর সাথে চিনি, লবণ ও পাঁচফোড়ন গুঁড়া মিশানোর পর আমড়ার পাল্প দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। চাটনি যখন জেলীর ন্যায় ঘন হবে, তখন চুলা হতে নামিয়ে প্রতি কেজি চাটনিতে ১ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট ও (কেএমএস) মিশাতে হয়। চাটনি রাখার জন্য কাচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফুটন্ত গরম পানিতে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয় এবং পানি ঝরিয়ে ফেলতে হয়। জীবাণুমুক্ত বোতলের উপরিভাগে সামান্য জায়গা খালি রেখে চাটনি ভরে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকিয়ে দিতে হয়। শুষ্ক, পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত জায়গায় বোতলগুলো রেখে ঠাণ্ডা করতে হয়। অতঃপর বোতলে লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করতে হয়।

৬. আমড়ার মোরব্বা : আমড়ার মোরব্বা অত্যন্ত সুস্বাদু ও মজাদার। গ্রামীণ নারীরা সহজেই ঘরে বসে আমড়ার মোরব্বা তৈরি করে সারা বছর খেতে পারেন। আমড়ার মোরব্বা তৈরির উপকরণ নিম্নে দেয়া হলো –

| | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | আমড়া | ১ কেজি |
| ২. | চিনি | ৬০০ গ্রাম |
| ৩. | সাইট্রিক এসিড | ২.৫ গ্রাম |
| ৪. | পটাশিয়াম মেটা বাই সালফেট | ৫ গ্রাম |
| ৫. | ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড | ১৫ গ্রাম |
| ৬. | আইসিং সুগার | ১৫০ গ্রাম |
| ৭. | লবণ | ৩০ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপক্ব, দোষমুক্ত ও পরিপুষ্ট আমড়া সংগ্রহ করতে হয়। পোকা ধরা, কালচে ধরনের পচে যাওয়া এবং অপরিপক্ব আমড়া মোরব্বা বানানোর জন্য ভালো হবে না। আমড়া পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে স্টেইনলেস স্টিলের ছুরির সাহায্যে পাতলা করে চামড়া বা খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। কাটা আমড়াগুলো শতকরা ৩ ভাগ লবণ দ্রবণে (৩ ভাগ লবণ ও ৯৭ ভাগ পানি) ২-৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরিষ্কার পানি দিয়ে আমড়ার টুকরাগুলো ধুয়ে নিতে হয়। কাটা চামচ দিয়ে আমড়ার টুকরাগুলো ছিদ্র করতে হয় যেন ভিতরের অংশে চিনির সিরাপ ঢুকতে পারে। শতকরা ২ ভাগ দ্রবণে (১/২ ভাগ কেএমএস, ১.৫ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ৯৮ ভাগ পানি) ছিদ্রযুক্ত কাটা আমড়ার টুকরা ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। একটি গামলায় আমড়াগুলো পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে বাঁশের চালুনির উপর রেখে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত গরম পানিতে আমড়ার টুকরাগুলো ২-৩ মিনিট রেখে পুনরায় পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। শতকরা ৩০ ভাগ চিনির দ্রবণে (৩০ গ্রাম চিনি + ৭০ গ্রাম পানি) ২.৫ গ্রাম সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে আমড়ার টুকরাগুলো জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল ফুটে উঠলে চুলা হতে নামিয়ে রেখে দিতে হয়। পরদিন আচার জ্বাল দিতে হবে। এভাবে তিন দিন পর সিরাপের টিএসএস যখন ৭০ ভাগ হবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে মিশ্রণ বা সিরাপ ঠাণ্ডা করতে হবে। টিএসএস মাপার জন্য রিফ্যাক্ট্রোমিটার ব্যবহার করতে হয়। আমড়ার মোরব্বাগুলো সিরাপ থেকে আলাদা করে টিস্যু পেপারে বা পাতলা কাপড়ের সাহায্যে সিরাপ মুছে সূর্যতাপে বা সোলার ড্রায়ারে শুকিয়ে নিতে হয়। ট্রেতে আইসিং সুগার নিয়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় মোরব্বাগুলো মাখিয়ে নিতে হয়। আমের মোরব্বা রাখার জন্য কাচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফুটন্ত গরম পানিতে ৫ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয় এবং বোতলের পানি সম্পূর্ণ ঝরিয়ে নিতে হয়। আমড়ার মোরব্বা পলিপ্রপাইলিন ব্যাগেও সংরক্ষণ করা যায়। জীবাণুমুক্ত বোতল ও পলিব্যাগে আমড়ার মোরব্বা ভরে বায়ুরোধী করে বাজারজাত করতে হয়।

৭. চালতার আচার : আমাদের দেশে প্রায় সব জায়গায়ই চালতা উৎপন্ন হয় এবং চালতার আচার ছোট বড় সকলেই পছন্দ করেন। চালতার আচারের উপকরণসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | চালতা | ৩টি | ৭. | ধনিয়া বাটা | ৫ গ্রাম |
| ২. | তেল | ১০০ মি.লি. | ৮. | চিনি | ২০০ গ্রাম |
| ৩. | পাঁচফোড়ন | ১০ গ্রাম | ৯. | শুকনা মরিচের গুঁড়া ভাজা | ১০ গ্রাম |
| ৪. | হলুদ বাটা | ৫ গ্রাম | ১০. | মৌরি | ১০ গ্রাম |
| ৫. | লবণ | ১০ গ্রাম | ১১. | ভিনেগার | ১০০ মি.লি. |
| ৬. | সরিষা বাটা | ১০ গ্রাম | ১২ | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |

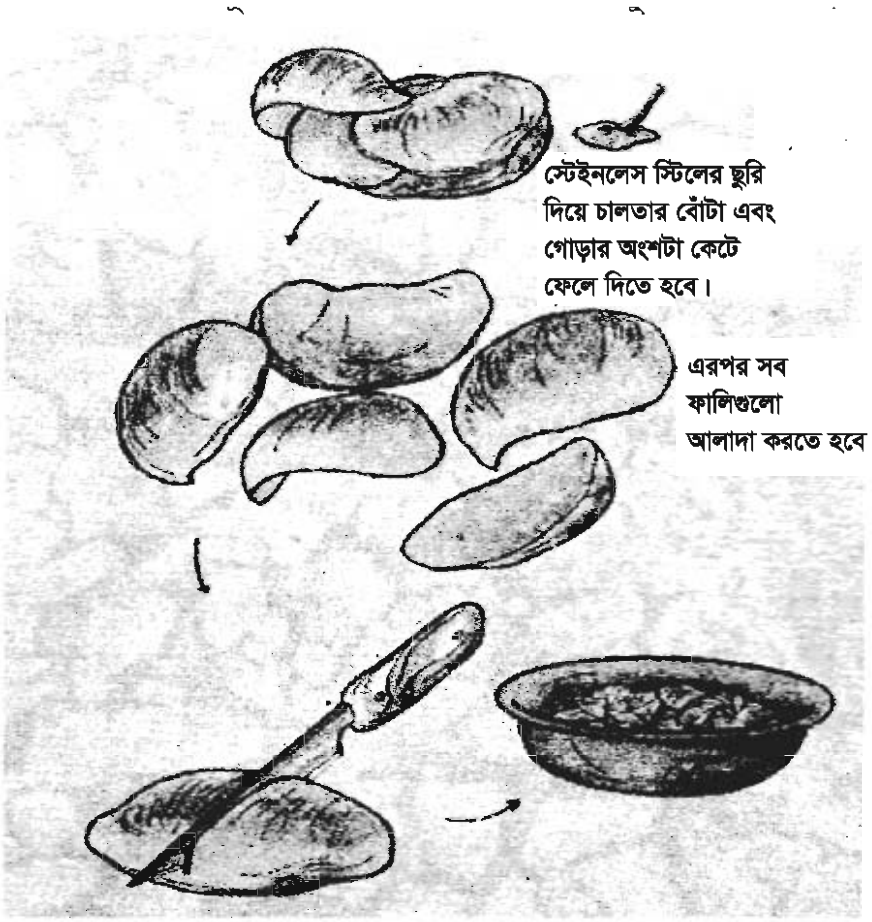


চিত্র : চালতার ফালি

২০২০

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপক্ব, দোষমুক্ত ও পরিপুষ্ট চালতা সংগ্রহ করতে হয়। চালতার বোঁটা এবং গোড়ার অংশ কেটে এর ফালিগুলো সুবিধামতো সাইজে কেটে ফেলতে হয়। ধারালো ছুরির সাহায্যে চালতার ফালির উপরের ও নিচের ছাল কেটে ছাড়িয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হয়। চালতার টুকরাগুলো তিন ভাগ লবণ দ্রবণে ২-৩ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়। অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে চালতাগুলো ১০-১৫ মিনিট সিদ্ধ করতে হয় এবং একটু নরম হলে চুলা হতে নামাতে হয়। চালতার টুকরাগুলো শিলপাটায় একটু থেঁতলে নিতে হয়। ব্লেন্ডিং মেশিনে হলুদ বাটা, সরিষা বাটা, ধনিয়া বাটা ও লবণ ভিনেগারের সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। চুলায় তেল গরম করে পাঁচফোড়ন ছেড়ে ভিনেগার মিশ্রিত মসলা ও চিনি মিশিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে কভারিং সস তৈরি করতে হয়। কভারিং সস জ্বাল দেওয়ার পর চালতার টুকরাগুলো দিয়ে আবার জ্বাল দিতে হয়। সাথে ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া ও মৌরির গুঁড়া মিশাতে হয়। চুলা থেকে আচার নামিয়ে প্রতি কেজি আচারে ১ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট (সংরক্ষক দ্রব্য) মিশাতে হয়। আচার রাখার জন্য কাচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফুটন্ত গরম পানিতে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। শুষ্ক, পরিষ্কার বোতলে আচার বায়ুরোধীভাবে সংরক্ষণ করে ঠাণ্ডা করতে হয় এরপর লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করতে হয়।

৮. চালতার মিষ্টি চাটনি : চালতার মিষ্টি চাটনির উপকরণসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :.

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | চালতার পাল্প | ১ কেজি | ৯. | মৌরির গুঁড়া | ২ গ্রাম |
| ২. | চিনি | ৭০০ গ্রাম | ১০. | দারুচিনির গুঁড়া | ২ গ্রাম |
| ৩. | রসুন | ১০ গ্রাম | ১১. | লবঙ্গের গুঁড়া | ১ গ্রাম |
| ৪. | লবণ | ৩০ গ্রাম | ১২. | জৈয়ত্রী | ১.৫ গ্রাম |
| ৫. | সরিষার গুঁড়া | ১০ গ্রাম | ১৩. | সরিষার তেল | ৫০গ্রাম |
| ৬. | শুকনো মরিচের গুঁড়া | ৫ গ্রাম | ১৪. | সাদা এলাচের গুঁড়া | ১/২ মি. লি. |
| ৭. | জিরার গুঁড়া | ২ গ্রাম | ১৫. | কে এম এস | ১/২ গ্রাম |
| ৮. | কালিজিরা | ২.৫ গ্রাম | ১৬. | এসিটিক এসিড | ২ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে কাঁচা অথচ পরিপক্ব চালতা সংগ্রহ করে পানিতে ধুয়ে নিতে হয়। ধারালো ছুরি দিয়ে চালতার বোঁটা ও গোড়ার অংশ ফেলে দিয়ে চালতার ফালিগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ফালিগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করে ভিতরের বিচি ফেলে দিতে হয়। টুকরাগুলোর সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে কড়াই বা সসপ্যানে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করতে হয়। সিদ্ধ হলে চুলা থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে হাত দিয়ে চিপে পাল্প বের করে আঁশ আলাদা করা হয়। চুষে খাওয়ার জন্য পাল্পের মধ্যে কিছু আঁশ রেখে দিতে হয়। উপকরণের সব মসলা আলাদাভাবে ভেজে গুঁড়া করে পরিমাণমতো ওজন করে নিতে হয়। চুলায় পরিমাণমতো সরিষার তেল নিয়ে গরম করা হয় এবং তাতে বাটা রসুন ও মরিচের গুঁড়া নিয়ে ভালোভাবে ভেজে চালতার পাল্প ও চিনি যোগ করে জ্বাল দিতে হয় এবং ভালোভাবে নাড়তে হয়। পাল্প বা মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে সব মসলা মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হয়। শেষে লবণ যোগ করতে হয়। মিশ্রণের ঘনত্ব ৬২° ব্রিক্সের মাপ হলে ওজন করা কেএমএস ১ চামচ গরম পানিতে গুলিয়ে ঠাণ্ডা চালতার পাল্পের সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। অতঃপর চুলা থেকে নামিয়ে চাটনি জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলে ভরে ছিপি লাগিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। চালতার চাটনির বোতল পরিষ্কার করে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। বাজারজাত করার পূর্বে বোতলে লেবেল লাগাতে হয়।

**৯. জলপাই-এর মিষ্টি চাটনি :** জলপাই আমাদের দেশের অন্যতম ফল, যা দিয়ে মজাদার ও মুখরোচক আচার ও চাটনি তৈরি করা যায়। জলপাই-এর আচার ও চাটনি কিশোর-কিশোরীদের নিকট খুবই প্রিয়। নিম্নে জলপাই এর চাটনি তৈরির উপকরণ দেওয়া হলো :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | জলপাই -এর পাল্প | ১ কেজি | ৯. | এলাচের গুঁড়া | ১/২গ্রাম |
| ২. | গুড় বা চিনি | ৮০০ গ্রাম | ১০. | দারুচিনির গুঁড়া | ১/২গ্রাম |
| ৩. | লবণ | ৩০ গ্রাম | ১১. | লং -এর গুঁড়া | ১/২গ্রাম |
| ৪. | রসুন | ১৫ গ্রাম | ১২. | গোলমরিচের গুঁড়া | ১গ্রাম |
| ৫. | আদা | ২০ গ্রাম | ১৩. | মৌরির গুঁড়া | ৫গ্রাম |
| ৬. | শুকনো মরিচের গুঁড়া | ৫গ্রাম | ১৪. | জৈয়ত্রী | ১/২গ্রাম |
| ৭. | জিরার গুঁড়া | ২গ্রাম | ১৫. | সরিষার তেল | ৫০ মি.লি |
| ৮. | সরিষার গুঁড়া | ১০গ্রাম | ১৬. | কেএমএস | ১/২গ্রাম |
| | | | ১৭. | এসিটিক এসিড | ৫ মি.লি |

**প্রস্তুত প্রণালি :** কাঁচা অথচ পরিপক্ব জলপাই সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে, বোঁটা ফেলে সামান্য পানি মিশিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হয়। চাটনি তৈরির সব উপকরণ পরিমাণ ওজন নিয়ে আলাদা করে রাখতে হয়। জলপাইগুলো নরম হয়ে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে বিচি থেকে পাল্প বা শাঁস ছাড়িয়ে নিতে হয়। অর্ধেক জলপাই-এর বিচি ফেলে পাল্পের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। মিশ্রণটি ফুটতে শুরু করলে লবণ ছিটিয়ে দিতে হয়। রসুন ও আদা মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করা হয়। অন্যান্য মসলা ভেজে ভালোভাবে পিষে নিতে হয়। এবার আদা রসুনের পেস্টসহ মরিচের গুঁড়া একটি কড়াইয়ে ৫০ মি.লি সরিষার তেলে কষিয়ে নিতে হয়।

চিত্র : জলপাই-এর আচার তৈরি

কড়াইয়ের মিশ্রণটি আস্তে আস্তে নাড়তে হয় এবং কষানো মসলাগুলো মিশ্রণের সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে বাকি মসলা এবং ভাজা গুঁড়া মসলা যোগ করা হয় এবং ভালোভাবে মিশিয়ে দেয়া হয়। অতপর এসিটিক এসিড দিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। চাটনির ঘনত্ব যখন ৬২° ব্রিক্স এর পাঠ আসে তখন কেএমএস যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হয়। অতঃপর চুলা থেকে নামিয়ে জলপাই-এর চাটনি জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ঠাণ্ডা করে ছিপি এঁটে দিতে হয়। চাটনির বোতলে লেবেল লাগিয়ে পরিষ্কার ও শুকনো ও ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়।

১০. জলপাই-এর টক ঝাল মিষ্টি আচার : এই আচাররের উপকরণসমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | জলপাই | ১ কেজি | ৭. | আদা বাটা | ৫০ গ্রাম |
| ২. | আখের গুঁড়া | ৩৫০ গ্রাম | ৮. | রসুন বাটা | ২০ গ্রাম |
| ৩. | লবণ | ১৫ গ্রাম | ৯. | সরিষার তেল | ১৫০ মি.লি |
| ৪. | লাল মরিচের গুঁড়া | ১০ গ্রাম | ১০. | ভিনেগার | ১৫০ মি. লি. |
| ৫. | পাঁচফোড়ন গুঁড়া | ১৫ গ্রাম | ১১. | সোডিয়াম বেনজয়েট ও কেএমএস | ০.৫+০.৫=১ গ্রাম |
| ৬. | হলুদ গুঁড়া | ১০ গ্রাম | | | |

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপুষ্ট টাটকা জলপাই সংগ্রহ করতে হয়। জলপাইয়ের বোঁটা ফেলে শতকরা ৩ ভাগ লবণ দ্রবণে (৯৭ ভাগ পানি ও ৩ ভাগ লবণ) দুই ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হয়। জলপাইগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিয়ে ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করতে হয়। জলপাইগুলো নরম হলে ফুটন্ত পানি থেকে তুলে ঠাণ্ডা করতে হয় এবং কাঠের চামচের সাহায্যে ভেঙে মণ্ড বা শাঁস বের করতে হয়। তার আগে বিচিগুলো আলাদা করে ফেলতে হয়। কড়াইতে সরিষার তেল গরম করে আদা ও রসুন বাটা বাদামি করে ভাজতে হয়। আখের গুড়, লাল মরিচের গুঁড়া, পাঁচফোড়নের গুঁড়া ও হলুদ বাটা পরিমাণমতো মণ্ডের সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। মসলা মিশ্রিত জলপাইয়ের মণ্ড গরম কড়াইতে ছেড়ে দিয়ে নাড়তে হয়। লবণ ও ভিনেগার কড়াইতে ঢেলে জ্বাল দিতে হয়। মিশ্রণের রং বাদামি হলে তা চুলা থেকে নামিয়ে সোডিয়াম বেনজয়েট ও কেএমএস মিশ্রিত সংরক্ষক দ্রব্য মিশাতে হয়। আচার রাখার জন্য কাচের বোতলগুলো ও ছিপি ফুটন্ত গরম পানিতে ৫ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয় এবং পানি ঝরিয়ে ফেলতে হয়। আচার বোতলে ভরে বায়ুরোধী করে আটকাতে হয়। এরপর ঠাণ্ডা করে লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করা বা পরিবেশন করা যাবে।

১১. তেঁতুলের চাটনি : তেঁতুল বাংলাদেশের সর্বত্র কম-বেশি পাওয়া যায়। মৌসুমে এর দামও সস্তা থাকে। আচার ও চাটনির মধ্যে তেঁতুলের টক ঝাল মিষ্টি চাটনির চাহিদা অনেক বেশি। এর উপকরণ নিচে দেওয়া হলো :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | তেঁতুল | ১ কেজি | ৮. | জায়ফল ও জয়ত্রী বাটা | ৩ গ্রাম |
| ২. | চিনি | ৭৫০ গ্রাম | ৯. | পোস্তদানা | ৫ গ্রাম |
| ৩. | কিসমিস | ১৫০ গ্রাম | ১০. | শুকনা মরিচের গুঁড়া | ৩-১০ গ্রাম |
| ৪. | আদা বাটা | ৫০ গ্রাম | ১১. | লবণ | ৩০ গ্রাম |
| ৫. | রসুন বাটা | ৫০ গ্রাম | ১২. | ভিনেগার | ২৫০ গ্রাম |
| ৬. | জিরা গুঁড়া | ৫ গ্রাম | ১৩. | সরিষার তেল | ২৫ গ্রাম |
| ৭. | পাঁচফোড়ন গুঁড়া | ১০ গ্রাম | ১৪. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : তেঁতুলের চাটনি তৈরির উপকরণসমূহ সঠিক পরিমাণে সংগ্রহ করতে হয়। পরিপক্ব, দোষমুক্ত পাকা তেঁতুল সংগ্রহ করে উপরে পরিষ্কার করে বিচি ফেলে দিতে হয়। কিসমিসের বোঁটা ফেলে দিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার কিসমিস একটি প্লাস্টিক বোলে নিয়ে কাঠের চামচ দিয়ে থেঁতলে দিতে হয়। এবার অন্য মসলাগুলো শিলপাটায় পিষে বা গ্রাইন্ডিং মেশিনে গুঁড়া করে ব্লেন্ডিং মেশিনের সাহায্যে ভিনেগারের সাথে ভালোভাবে মিশাতে হয়। সসপ্যানে তেল ভালোভাবে গরম করে গরম তেলে আস্ত সরিষা ছেড়ে দিতে হয়। গরম তেলে সরিষা দেবার পর ভিনেগার মিশ্রিত মসলা তেলে ঢেলে কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দেওয়া মসলার সাথে তেঁতুল, কিসমিস, পাঁচফোড়ন, চিনি, লবণ, পোস্তদানা মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। চাটনি যখন আঠালো বা জ্যামের মতো হবে তখন চাটনি চুলা থেকে নামিয়ে প্রতি কেজিতে ১ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট যোগ করতে হয়। চাটনি রাখার জন্য কাচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফটন্ত পানিতে ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হয়। বোতলে চাটনি ভরে বায়ুরোধী করে ছিপি আটকে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। এরপর বোতলে লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করতে হয়।

১২. আমলকীর মোরব্বা : আমলকী হতে তৈরি মোরব্বার উপকরণগুলো নিম্নরূপ

| | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | আমলকী | ১ কেজি |
| ২. | চিনি | ১.৫ কেজি |
| ৩. | এলাচ | ৫টি |
| ৪. | সাইট্রিক এসিড | ৫ গ্রাম |
| ৫. | ভিজানো চুন | ৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপক্ব ও পুষ্ট বড় আকৃতির আমলকী সংগ্রহ করে বোঁটা ফেলে পরিষ্কার পানিতে ধুতে হয়। আমলকীগুলো খেজুরকাঁটা বা কাঁটাচামচ দিয়ে ভালো করে খোঁচাতে হয়। তারপর পানিতে ডুবিয়ে ভিজিয়ে রেখে পানি কয়েকবার বদলাতে হয়। এরপর আমলকীগুলোকে ২% দ্রবণে (১ ভাগ কেএমএস ও ১ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ৯৮ ভাগ পানি) ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর আমলকীগুলো ২-৩ বার ধুয়ে-পানি ঝরিয়ে ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করতে হয়। অতঃপর থেঁতলে বিচি ফেলে দিতে হয়। ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে ১ ঘণ্টা জ্বাল দিতে হয়। পরদিন সাইট্রিক এসিড চিনি ও এলাচ দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। সিরাপ ঘন হয়ে এলে ব্রিক্স এর পাঠ ৭০ হলে চুলা হতে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করতে হয়। জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে বোতল লাগিয়ে বাজারজাত করতে হয়।

১৩. কমরচার চাটনি :

উপকরণ

| | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | করমচা | ১ কাপ |
| ২. | চিনি | ০.৫ কাপ |
| ৩. | কাঁচা মরিচ | ৮টি |
| ৪. | ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা | ১ টে. চামাচ |
| ৫. | লবণ | ০.৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. সবগুলো উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে হবে।
২. চুলায় কড়াই চড়িয়ে পানি গরম করতে হবে।
৩. করমচা ভালো করে ধুয়ে ডুবো পানিতে সিদ্ধ করতে হবে।
৪. করমচা ফুলে ফেটে গেলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে।
৫. চামচ দিয়ে করমচার বিচি বের করে ফেলে দিতে হবে।
৬. করমচাগুলো সামান্য চটকে নিতে হবে।
৭. চিনি, লবণ, মরিচ কুঁচি ধনেপাতা কুঁচি করে মিশাতে হবে।
৮. অত:পর পরিবেশন করা যাবে।

১৪. করমচার আচার উপকরণ

| | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | করমচা | ১ কাপ |
| ২. | চিনি | ১/৩ কাপ |
| ৩. | সাদা সিরকা | ১/৪ কাপ |
| ৪. | স্লাইস করা আদা | ০.৫ চা চামচ |
| ৫. | শুকনা মরিচ কুঁচি | .৫ চা চামচ |
| ৬. | লবণ | ০.৫ চা চামচ |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পরিপক্ব ও পুষ্ট এবং বড় আকৃতির করমচা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
২. করমচাগুলো ছুরি দিয়ে ২ টুকরা করে কেটে ফেলতে হবে।
৩. ২ দিন টুকরাগুলো পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে কিন্তু ৩ ঘণ্টা পর পর পানি পাল্টাতে হবে।
৪. কাঁচি দিয়ে মরিচ কুচি করে কাটতে হবে।
৫. ছুরি দিয়ে আদা স্লাইস করে কাটতে হবে।
৬. সসপ্যানে করমচা, চিনি, সিরকা, মরিচ, আদা মিশিয়ে চুলায় চড়াতে হবে।
৭. মাঝে মাঝে হাতল দিয়ে নাড়তে হবে।
৮. করমচা সিদ্ধ হলে এবং রস ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামাতে হবে।
৯. গরম গরম আচার জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরতে হবে।

## ৮.৩ আমলকী শুকিয়ে পাউডার তৈরি

আমলকী একটি গুরুত্ব ফলজ ও ভেষজ গাছ। আমলকী ফলের রঙ হালকা সবুজ বা হালকা হলুদ সবুজ বা হলুদ এবং আকৃতি গোল। এই ফল শিশু কিশোরীরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে খেয়ে থাকে। আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধ তৈরিতে আমলকীর ব্যবহার যথেষ্ট। ত্রিফলা তৈরিতে আমলকী, বহেড়া ও হরীতকী ব্যবহার হয়। আমলকীতে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমানে আছে। কমলালেবুতে যতটুকু ভিটামিন রয়েছে তার ২০ গুণ বেশি আছে আমলকীতে। আমলকী পাউডার করার পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো-

১. পুষ্ট, পরিপক্ব ও উন্নত মানের আমলকী সংগ্রহ করতে হবে।
২. বিকৃত, অপুষ্ট ও পোকায় খাওয়া ফল বাদ দিতে হবে।
৩. পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুঁয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
৪. ধারালো ছুরি বা বঁটি দিয়ে প্রতিটি আমলকীকে ২/৪ টুকরা করতে হবে।
৫. টুকরাগুলো ফুটন্ত পানিতে ২-৩ মিনিট ব্লাঞ্চিং করে নিতে হবে।
৬. ট্রেতে করে আমলকীগুলো উন্মুক্ত বাতাসে রেখে শুকাতে হবে।
৭. কয়েকবার রোদে দিয়ে এর জলীয় অংশ ১২% এ নামিয়ে আনতে হবে।
৮. উত্তমররূপে শুকানোর পর ঠাণ্ডা পলিপ্যাক বা টিনের বাক্সে বায়ুরোধী করে রাখতে হবে।
৯. অতপর বাজার হতে মেশিনে ভাঙিয়ে বৈয়ামে ভরে রাখতে হবে।
১০. এই গুঁড়া এক বছর পর্যন্ত বায়ুরোধী অবস্থায় ভালো থাকবে।

# অনুশীলনী-৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কোন দেশের তেঁতুল খেতে মিষ্টি লাগে?
২. তেঁতুল শরীরের কী উপকার করে?
৩. তেঁতুলের চাটনি নিয়ে ব্যবসা করছে কোন কোন প্রতিষ্ঠান?
৪. তেঁতুলজাত সামগ্রী নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করেছেন কোন কোন দেশ?
৫. তেঁতুল হতে কী কী তেঁতুলজাত খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা সম্ভব?
৬. পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি জলপাই উৎপাদন হয়?
৭. জলপাই এর তেলে ৭০% এর বেশি কোন এসিড আছে?
৮. দেশে আমড়ার ফলন সবচেয়ে বেশি কোথায় হয়?
৯. কোন এলাকার আমড়াকে বিলাতি আমড়া বলে?
১০. চালতা কোন এলাকায় ভালো হয়?
১১. করমচা ফলে কী কী পুষ্টি উপাদান রয়েছে?
১২. কোন ফলকে ভিটামিন 'সি' এর রাজা বলে?
১৩. আমরা আমলকী ফলে কতটুকু ভিটামিন 'সি' পেয়ে থাকি?
১৪. বরই-এর আচারে ১ কেজি গুড়ে কতটুকু পানি দিতে হয়?
১৫. প্রতি ১ কেজি আচারে কতটুকু প্রিজারভেটিভ দিতে হয়?
১৬. ৩০ ভাগ চিনির দ্রবণ বলতে কী বুঝায়?
১৭. মোরব্বার TSS কত হলে চুলা হতে নামাতে হয়?
১৮. চালতার টুকরাগুলো কেন শিল-পাটায় থেঁতলে নিতে হয়?
১৯. কভারিং সস বলতে কী বোঝায়?
২০. আমলকীর মোরব্বার জন্য ২% দ্রবণে কতক্ষণ ভিজাতে হয়?
২১. করমচার চাটনি করতে কী কী লাগে?
২২. ত্রিফলা তৈরিতে কী কী লাগে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বরই-এর পরিচিতি লেখ।
২. তেঁতুলের পরিচিতি দাও।
৩. জলপাই ও আমড়ার পরিচিতি লেখ।
৪. আমলকীর পরিচিতি বর্ণনা কর।
৫. করমচা চাটনি তৈরি প্রণালি লেখ।
৬. করমচার আচার কীভাবে তৈরি হয়?
৭. আমলকী শুকিয়ে কীভাবে পাউডার করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কুল, তেঁতুল, আমড়া, চালতা, করমচা, জলপাই ও আমলকীর পরিচয় দাও।
২. বরই ও তেঁতুলের (বরতুল) চাটনির উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালি লেখ।
৩. আমাড়র ঝাল আচার ও আমড়ার মোরব্বা তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪. চালতার আচার ও চাটনি কীভাবে তৈরি করে বর্ণনা কর।
৫. জলপাই এর চাটনি ও "টক, ঝাল ও মিষ্টি আচার" প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
৬. তেঁতুলের চাটনি ও আমলকীর মোরব্বা তৈরি বর্ণনা কর।

# অধ্যায়-৯
# টমেটো থেকে উৎপাদিত খাদ্য

## ৯.১ টমেটোর পরিচিতি

Tomato-Solanaciae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর বৈজ্ঞানিক নাম-Lycopersicon esculentum. টমেটো ভিটামিনসমৃদ্ধ একটি সবজি জাতীয় ফল। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে টমেটো প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সতেজ টমেটো শরীরের জন্য সতেজতা আনয়ন করে এবং ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে কাজ করে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে, বিশেষ করে ভিটামিন 'সি'। দেশে এখন শীতকাল এবং গ্রীষ্মকাল- উভয় ঋতুতে টমেটো উৎপন্ন হয়ে থাকে। শীতকালে উৎপাদিত টমেটো গ্রীষ্মকালে উৎপাদিত টমেটো অপেক্ষা উন্নত। কারণ এতে কঠিন পদার্থ বেশি থাকে। টমেটো উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে। যেমন- প্রথমে সবুজ, তারপর ধূসর সাদা, তারপর হলুদ এবং সবশেষে লাল। ক্লোরোফিলের জন্য সবুজ বর্ণ, ক্যারোটিনের জন্য হলুদ এবং আঁশে লাইকোপেনের উপস্থিতির জন্য লাল বর্ণ হয়ে থাকে টমেটো থেকে সাধারণত যেসব প্রক্রিয়াজাত পণ্য পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সস, কেচাপ ও ককটেইল। রান্না করে খেলে টমেটোকে সবজি বলে। সালাদ ও কাঁচা টমেটো চিবিয়ে খেলে একে ফল বলে।

টমেটোতে পানির পরিমাণ খুব বেশি (৮৫% পর্যন্ত হতে পারে) থাকায় গাছ থেকে তোলার পর টমেটো বেশি দিন ভালো অবস্থায় থাকে না। মৌসুমে এর দাম অনেক কম এবং পচেও যায় প্রচুর। তাই টমেটোকে যদি প্রক্রিয়াজাত করা যায় তবে ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের সাথে অপচয়ও রোধ করা সম্ভব।

খাদ্য হিসেবে টমেটোর প্রচলন আমেরিকাতে। সেখানে এটি Love apple নামে বাগানের সৌন্দর্যবর্ধক গাছ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৮২০ সালের পূর্বে সেখানে এটিকে বিষাক্ত ফল বলে কেউ খেত না। কর্নেল জনসন নামে জনৈক ব্যক্তি নিজে এটি খাওয়ার মাধ্যমে এর বিষাক্ততার ভ্রান্ত ধারণা দূর করেন। বর্তমানে এটি আমাদের অত্যন্ত পুষ্টিকর সবজির মধ্যে অন্যতম। টমেটোর পুষ্টিমান নিম্নে দেওয়া হলো :

২. টমেটোর পুষ্টিগুণ : টমেটো একটি অতি পুষ্টিকর ফল বা সবজি। গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, যেসব লোক বেশি পরিমাণে টমেটো অথবা টমেটেজাত খাদ্য খেয়ে থাকেন তাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক কমে যায়। এটি হয়ে থাকে সম্ভবত টমেটোতে অবস্থিত লাইকোপেনের জন্য। সদ্যপ্রাপ্ত টমেটোর চেয়ে প্রক্রিয়াজাত টমেটোতে (যেমন- সস, কেচাপ) বেশি লাইকোপেন পাওয়া যায়। কারণ, তাপে টমেটো কোষপ্রাচীর ভেঙ্গে ক্যারোটিনমুক্ত হয়ে ঘনীভূত হয়। টমেটোর সাথে সামান্য পরিমাণে চর্বি খেলে তা দেহে লাইকোপেনের শোষণে কার্যকর কাজ করে।

এছাড়া টমেটো ভিটামিন 'সি' ও ভিটামিন 'এ' এর জন্য একটি উৎকৃষ্ট উৎস। টমেটো স্বল্প চর্বিযুক্ত ও স্বল্প ক্যালরিযুক্ত ফল। এটি সম্পূর্ণ চর্বি ও কোলেস্টেরলমুক্ত। টমেটো পটাসিয়ামের জন্য একটি ভালো উৎস হলেও সোডিয়াম আছে খুবই অল্প পরিমাণে।

## টমেটোর পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রাম)

| ক্রমিক নং | পুষ্টি উপাদান | কাঁচা টমেটো | পাকা টমেটো |
|---|---|---|---|
| ১. | আমিষ (গ্রাম) | ১.১ | ০.৯ |
| ২. | শ্বেতসার (গ্রাম) | ৩.৬ | ৩.৬ |
| ৩. | চর্বি (গ্রাম) | ০.১ | ০.২ |
| ৪. | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.৬ | ০.৫ |
| ৫. | ভিটামিন বি১ (মি.গা.) | ০.০৭ | ০.১২ |
| ৬. | ভিটামিন বি২ (মি.গা.) | ০.০১ | ০.০৬ |
| ৭. | ভিটমিন 'সি' (মি.গা.) | ৩১ | ২৭ |
| ৮. | ক্যালসিয়াম (মি.গা.) | ২০ | ৪৮ |
| ৯. | লৌহ (মি.গা.) | ১.৮ | ০.৪ |
| ১০. | ক্যারোটিন (মাই. গ্রাম) | ১৯২ | ৩৫১ |
| ১১. | খাদ্য শক্তি (কি. ক্যালরি) | ২৩ | ২০ |

কাঁচা টমেটোর তুলনায় পাকা টমেটোর ক্যালরি মান বেশি। তবে পাকা টমেটো কাঁচা টমেটোর তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বিটা-ক্যারোটিন বেশি বহন করে।

উপরে উল্লিখিত উপাদান ছাড়াও অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো। যেমন- ভিটামিন 'কে' , বায়োটিন, ভিটামিন 'বি৬' প্যান্টোথেনিক এসিড, নিয়াসিন, ফলিক এসিড ও আঁশ।

চিত্র : টমেটো গাছ ও গাছে পাকা টমেটো

২০২০

টমেটোর উপকারিতা :

টমেটো একটি আদর্শ ফল ও সবজি। তাজা অবস্থায় টমেটো পুষ্টিতে ভরপুর। টমেটো আমাদের শরীরে অনেক উপকার করে থাকে। যেমন-

১. টমেটো ত্বকের রং উজ্জ্বল করে ত্বকের গঠন উন্নত করে।
২. টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে লাইকোপেন নামক এন্টি অক্সিডেন্ট বা জারক প্রতিরোধ থাকে। যা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এই লাইকোপেন রান্না করা বা প্রক্রিয়াজাত করা হলে নষ্ট হয় না।
৩. নিয়মিত টমেটো খেলে রক্তে ক্ষতিকারক কোলেস্টরেল মাত্রা কমায় ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।
৪. টমেটো ভিটামিন এবং খনিজের এক অন্যতম উৎস। মাত্র একট টমেটো খেলে আমাদের দৈনিক ভিটামিন 'সি'-এর চাহিদার ৪০ ভাগ পূরণ করতে পারে। ভিটামিন 'সি' হলো প্রাকৃতিক এন্টি-অক্সিডেন্ট যা ক্যান্সার প্রতিরোধের কাজ করে।
৫. টমেটো একটি প্রাকৃতিক জীবাণু প্রতিরোধক (Natural antiseptic) যা বিভিন্ন জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
৬. টমেটোতে ধূমপানজনিত ক্যান্সার রোগের ঝুঁকি হ্রাসের উপাদান রয়েছে।
৭. টমেটোতে 'ভিটামিন-কে' পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় শরীরের যে কোনো ধরনের রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে।

টমেটো হতে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য

টমেটো দেহ ও মনে সতেজতা আনয়ন করে এবং ক্ষুধামন্দা দূর করে। টমেটো ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি ফল বা সবজি। টমেটো হতে যে সব প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন করা যায় তা হলো -

ক) টমেটো সস
খ) টমেটো পাল্প
গ) টমেটো জুস
ঘ) টমেটো পিউরি
ঙ) টমেটো পেস্ট
চ) টমেটো কেচাপ
ছ) চিলি সস
জ) টমেটো ককটেল।

টমেটো জুস : গাছে পাকা সম্পূর্ণ লাল টমেটো জুস তৈরির জন্য নির্বাচন করা হয়। সবুজ, হলুদ, ক্ষতযুক্ত ও অতিরিক্ত পাকা টমেটো বাদ দেওয়া উচিত। বেশি পাকা টমেটো থেকে প্রাপ্ত রস পাতলা এবং স্বাদ ও গন্ধের দিক দিয়ে অনুন্নত হয়ে থাকে। জুসের উৎপাদন, বর্ণ ও ঘ্রাণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে টমেটোর পরিপক্বতার মাত্রা, জাত ও উৎপন্ন স্থানের উপর। কাজেই ভালো জুসের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. জুস অবশ্যই গাঢ় লাল হবে। যেহেতু লাল রঙ টমেটোর আঁশে থাকে, পানীয় অংশে থাকে না সেহেতু যতদূর সম্ভব চূড়ান্ত দ্রব্যে বেশি পরিমাণে আঁশাল অংশ নিতে হবে।
২. জুস অবশ্যই সদ্যতোলা টমেটোর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাদ ও ঘ্রাণ বহন করবে।
৩. জুসের এসিডিটি (সাইট্রিক এসিড হিসেবে) হবে প্রায় ০.৪%।

৪. সতেজ টমেটোতে বিদ্যমান সমস্ত ভিটামিন রসে প্রবেশ করবে। কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে জুসে ভিটামিনের উপস্থিতি। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ক্যারোটিন তাপে নষ্ট হয় না, কিন্তু বায়ুর উপস্থিতিতে ভিটামিন 'সি' জারিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

৫. উন্নত ও সুষম জুস পেতে হলে টমেটো এক জায়গা থেকে নেয়া উচিত এবং রসকে ভালোভাবে ব্লেন্ডিং করা উচিত।

৬. টমেটোর টি.এস.এস. ৫% এর কম হবে না।

টমেটো পিউরি বা পাল্প :

টমেটো জুসকে তাপ প্রয়োগ পানি বাষ্পাকারে বের করে ঘনীভূত করা হয়। এতে কঠিন পদার্থের পরিমাণ (লবণ ছাড়া) ৮.৩৭% এর কম হবে না। টমেটো জুস খোলা অথবা ভ্যাকুয়াম পাত্রে রেখে ঘনীভূত করা হয়। পিউরিকে ৮৫ - ৯০° সে. তাপমাত্রায় গরম করে তাড়াতাড়ি জীবাণুমুক্ত প্লেইন ক্যানে ভরে সিল করা হয় এবং ফুটন্ত পানিতে প্রায় ৩০ মিনিট ফুটিয়ে নেয়া হয়।

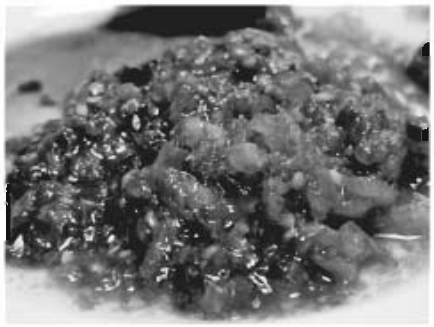

চিত্র : টমেটো জুস ও পাল্প

টমেটো পেস্ট :

টমেটো পেস্ট হচ্ছে টমেটো রসের ঘনীভূত রূপ যেখানে টিএসএস (লবণ ছাড়া) ২৫% এর কম হবে না। যদি পাল্পকে আরও ঘন করে টিএসএস ৩৩% বা তার বেশি করা হয় তবে তাকে ঘনীভূত টমেটো পেস্ট বলে। যেহেতু খোলা পাত্রে টমেটো রস জ্বাল দিয়ে টিএসএস ১০% করাটাই কঠিন, সেহেতু ২৫% টিএসএস পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে ভ্যাকুয়াম প্যান ব্যবহার করতে হবে। তারপর প্রস্তুতকৃত পেস্টকে ৮৫-৯০° সে. এ উত্তপ্ত করে এ.আর. ল্যাকুয়ারিং করা ক্যানে ভর্তি করে সিল করা হয় এবং ফুটন্ত পানিতে ৩০ মিনিট ফুটিয়ে নেয়া হয়। তারপর ঠাণ্ডা করে গুদামজাত করা হয়।

টমেটো পাউডার : টমেটো পাউডার টমেটো জুস বা টমেটো পেস্টকে ডিহাইড্রেশন করে তৈরি করা হয়। যেহেতু এর পানি আকর্ষণ ও শোষণ ক্ষমতা খুব বেশি সেহেতু এটি ভ্যাকুয়াম অবস্থায় প্যাকিং করা হয় এবং বায়ুরোধী পাত্রে ৪০° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। টমেটো পাউডার তৈরি করতে সাধারণত স্প্রে ড্রয়ার, ড্রাম ড্রায়ার অথবা ভ্যাকু ম ড্রায়ার ব্যবহার করা হয়। ভালো মানের টমেটো পাউডার সহজেই পানিতে মিশে যায় এবং বর্ণ ও ঘ্রাণ আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

## ৯.২ টমেটো জুস ও পাল্প প্রস্তুতকরণ

এটি একটি তৃপ্তিদায়ক, উপাদেয়, পুষ্টিকর পানীয়। সারা পৃথিবীতে টমেটো জুসের অত্যন্ত কদর রয়েছে। টিনের পাত্রে, কাচের পাত্রে এবং বর্তমানে অ্যালুমিনিয়াম পাত্রেও টমেটোর রস বাজারে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এ পানীয়টি প্রস্তুত হয় না। অথচ এটির প্রস্তুত প্রণালি অত্যন্ত সহজ ও কম ব্যয় সাপেক্ষ।

জুস প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে লাল ও গাছ পাকা টমেটো নির্বাচন করে ভালো করে ধুয়ে বোঁটার অংশ বাদ দিয়ে হয়। জুসের উৎপাদন, বর্ণ ও গন্ধ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে টমেটোর পরিপক্বতার মাত্রা, জাত ও উৎপাদন স্থানের উপর। এরপর রস নিষ্কাশন করতে হয়। রস নিষ্কাশন দু'ধরনের পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যথা (ক) উষ্ণ নিষ্কাশন পদ্ধতি ও (খ) ঠাণ্ডা নিষ্কাশন পদ্ধতি।

উষ্ণ পদ্ধতিতে টমেটো টুকরা টুকরো করে নিয়ে স্টেইনলেস স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ৩-৫ মিনিটকাল জ্বাল দিয়ে টমেটো থেকে বের হয়ে আসা রসেই সেগুলো ভালো করে সিদ্ধ করা হয়। সাথে সাথে হাত দিয়ে ভালো করে পিষে বা কচলে যতদূর সম্ভব রস বের করে আনতে হয়। পরে তা পাতলা মসলিন কাপড় বা স্টিলের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে বীজ বা বাকলের অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর টমেটো রস পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে তাপ প্রয়োগের ফলে টমেটোর লাল রঞ্জক উপাদানটি আরও ভালো করে নিষ্কাশিত হয়ে রসের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়, রসের পরিমাণ বেশি করে এবং নিষ্কাশনের সাথে সাথে জীবাণুমুক্তকরণের কাজও অনেকটা সমাধা হয়।
দ্বিতীয় বা ঠাণ্ডা নিষ্কাশন পদ্ধতিতে টুকরা করা টমেটো থেকে স্পাইরাল প্রেস বা পালপার বা 'জুসার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে রস বের করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রস বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং রসে জীবাণুর আক্রমণও ঘটতে পারে। তাছাড়া রসের ঔজ্জ্বল্য ও পরিমাণ কম হয়। তবে তাজা টমেটোর স্বাদ কিন্তু ঠান্ডা পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত রসেই বেশি পাওয়া যায়। আজকাল এমন রস নিষ্কাশন যন্ত্র বের হয়েছে যেটিতে বায়ুর প্রবেশ রোধ ব্যবস্থা আছে। ফলে ভিটামিন সি এর নষ্ট হওয়া কমে গেছে। তাই যারা টমেটো রস প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে ছাড়বেন, তারা ক্রেতার চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উষ্ণ বা ঠান্ডা যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। টমেটোর রসে টিএসএস এর পরিমাণ ৫% থাকতে হবে। রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা এটি মাপা যায়। রসের কষা স্বাদটি দূর করার জন্য ০.৫ থেকে ১% লবন বা ১% চিনি মিশিনো যায়। তবে তার আগে রস ভালোভাবে ছেকে নিতে হয়। রস তৈরি হলে ৮০-৮৫° .সে. তপমাত্রায় উত্তপ্ত করে জীবাণুমুক্ত ক্যান ও কাচপাত্রে গরম অবস্থায় ভরে ফেলতে হয় এবং দ্রুত ছিপি লাগাতে হয়। এরপর ফুটন্ত পানিতে ৩০-৪০ মিনিট করে ডুবিয়ে জীবাণুমুক্তকরণ শেষে বহমান ঠাণ্ডা পানিতে রেখে বোতলটি দ্রুত ঠাণ্ডা করতে হবে। তবে ৩০-৪০ মিনিট একটা লম্বা সময়। এতে করে টমেটোর ভিটামিন 'সি' এবং লাইকোপেন নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে যদি পাত্রের ভিতর বাতাস থাকে। সেজন্য বর্তমানে 'হিট এক্সচেঞ্জার' নামক যন্ত্রে ১২১° সে. তাপমাত্রায় ৭ মিনিট কাল সময়ে এই জীবাণুমুক্তকরণের কাজ করা হচ্ছে। এতে টমেটো রসের বাহিরের ও পুষ্টিগত কোন ক্ষতি হয় না।

### টমেটো পাল্প

টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণে গাছ পাকা লাল টমেটো উত্তম। সবুজ, ক্ষত যুক্ত ও বেশি পাকা টমেটো ব্যবহার করা ঠিক না। বেশি পাকা টমেটো ব্যবহার করলে খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ ততোটা ভালো হয় না। যেহেতু টমেটোর গায়ে ছোট ছোট গর্ত থাকতে পারে তাই সাধারণভাবে ধৌত করলেও জীবাণু থেকে যেতে পারে। এজন্য টমেটো ধুতে প্রবাহিত পানি বা Running water ব্যবহার করতে হয়। বড় বড় ফ্যাক্টরিতে ঘূর্ণায়মান ধৌতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

পাল্প তৈরিকরণ : টমেটো ধোয়ার পর ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে কাটতে হয়। তারপর চুলায় দিয়ে যতক্ষণ নরম না হয় ততক্ষণ জ্বাল দিতে হয়। চাপ প্রয়োগ করে থেঁতলে বা গলিয়ে ফেলা হয়। এছাড়া ব্লেন্ডার বা পাল্পারের সাহায্যে পাল্প তৈরি করতে হয়। এরপর টমেটোর খোসা বা বাকল ও বীজ ছেঁকে অপসারণ করা হয়। তাপ প্রয়োগ করে টমেটোর পাল্প তৈরির সুবিধা হল- খোসা ও বীজে অবস্থিত প্রাকৃতিক পেকটিন বের হয়ে এসে রসের সাথে মিশে পাল্পকে ঘন করে। পাল্পে অবস্থিত জীবাণু বা অণুজীবগুলো ফার্মেন্টেশন ঘটাতে পারে। তাপ প্রয়োগের ফলে সেই অণুজীবগুলো ধ্বংস হয়।

উপরোক্ত পাল্পকে পুনরায় চুলায় চড়িয়ে ঘন করে প্রায় অর্ধেক করা হয়। তারপর পাল্পের ওজনের ০.১% হারে সোডিয়াম বেনজয়েট পাল্পে যোগ করে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত ড্রামে ভরে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করতে হয়। তারপর যখন ইচ্ছা ব্যবহার করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে, একটা ড্রামের পাল্প ব্যবহার করলে পুরোটাই ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে অবশিষ্ট পাল্প নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই পাল্প যখন সস তৈরিতে ব্যবহার হবে তখন ঐ পাল্পের সমপরিমাণ পানি যোগ করতে হয়।

টমেটো সস :

এগ্রোবেসড শিল্প হিসেবে টমেটো সসের গুরুত্ব

১. টমেটো সস তৈরি পদ্ধতি তেমন জটিল নয়।

২. এ সস যথেষ্ট উপাদেয় ও রুচিবর্ধক এবং পুষ্টিমানও অনেক বেশি বিধায় এর চাহিদাও অনেক বেশি।

৩. সংরক্ষিত পাল্প থেকে যে কোন সময় টমেটো সস তৈরি করা যায়।

৪. এই শিল্পের প্রসার ঘটলে, বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

৫. স্বল্প খরচে টমেটো সস তৈরি সংরক্ষণ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ করা সম্ভব।

৬. মৌসুমি ফলের অপচয় রোধ করা সম্ভভ।

৭. বছরের সবসময় এই ব্যবসা করা সম্ভব।

৮. প্রক্রিয়াজাতকরণে এর ব্যবহার বাড়লে টমেটোর উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

৯. দেশের মানুষের রুচি পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

টমেটো সস তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | টমেটো পাল্প | ৩ কেজি | ৮. | চিনি | ১০০-২০০ গ্রাম |
| ২. | পিঁয়াজ | ৩৭ গ্রাম | ৯. | গোলমরিচ | ১ গ্রাম |
| ৩. | রসুন | ২.৫ গ্রাম | ১০. | ভাঙ্গা এলাচ | ১ গ্রাম |
| ৪. | মরিচের গুঁড়া | ১ গ্রাম | ১১. | ভিনেগার | ১৫০ গ্রাম |
| ৫. | লবণ | ৫০ গ্রাম | ১২. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |
| ৬. | লবঙ্গ | ১ গ্রাম | ১৩. | এসিটিক এসিড | ৬.৫ মি.লি. |
| ৭. | দারুচিনি | ১.৫ গ্রাম | | | |

প্রস্তুত প্রণালি :

নিখুঁত, সতেজ ও গাছপাকা লাল রঙের টমেটো থেকে প্রস্তুতকৃত পাল্প নিতে হয়। প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ পৃথকভাবে ওজন করে নিতে হয়। মরিচের গুঁড়া ছাড়া বাকি মসলাগুলো একটি কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে নিতে হবে। সসপ্যানে পাল্প নিয়ে চুলায় বসিয়ে জ্বাল দিতে হয়। সোডিয়াম বেনজয়েট হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে রাখতে হয়। কাপড়ের পুঁটলি পাল্পের মধ্যে বসিয়ে দেয়া হয়। পাল্পের ঘনত্ব যখন তিন ভাগের এক ভাগ কমবে তখন লবণ, চিনি ও মরিচের গুঁড়া যোগ করে নাড়তে হয়। এভাবে কমতে কমতে যখন টিএসএস ২৬-৩২% হবে তখন চুলা থেকে ঘনীভূত পাল্প নামিয়ে ফেলতে হয়। এসময় পাল্পের তিন ভাগের একভাগ হয়ে যায়। এ সময় পাল্পে এসিটিক এসিড বা ভিনেগার এবং বেনজয়েট দ্রবণ যোগ করে নেড়ে মেশাতে হয়। সম্ভব হলে ইস্পাত তৈরি চালুনি দিয়ে পাল্প ছেঁকে নিতে হয়, অন্যথায় ময়লা আবর্জনা পাল্পে ঢুকতে পারে। জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার বোতলে সস ভরতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ লাগিয়ে বায়ুরোধী করে সিল করতে হয়। তারপর ২ ঘণ্টা ফ্লোরে শুইয়ে রাখতে হয়। বোতল ভালো করে মুছে লেবেল লাগিয়ে শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও আলোকবিহীন ঘরে গুদামজাত করা হয়।

টমেটো কেচাপ : আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি ঘরেই ব্যবহৃত এটি একট বহুল প্রচলিত টমেটোজাত খাদ্য সামগ্রী। প্রক্রিয়াজাত অন্যান্য খাদ্য বস্তুর মতো এই সামগ্রী তৈরিতে বীজহীন ও ত্বকের অংশহীন বিশুদ্ধ টমেটো জুসের প্রয়োজন হয়। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ৫ কেজি টমেটো বাছাই করে নিয়ে তা থেকে ৩ কেজি টমেটো জুস পাওয়া হয়। টমেটো কেচাপের উপকরণগুলো হলো :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | টমেটো রস | ৩ কেজি | ৭. | শুকনা মরিচ গুড়া | ১ গ্রাম |
| ২. | কাটা পিঁয়াজ | ৪০ গ্রাম | ৮. | লবণ | ১৫ গ্রাম |
| ৩. | কাটা রসুন | ৩ গ্রাম | ৯. | চিনি | ১০০ গ্রাম |
| ৪. | লবঙ্গ | ১ গ্রাম | ১০. | ভিনেগার | ১৫০ গ্রাম |
| ৫. | এলাচা ও গোল মরিচ গুঁড়া | ২ গ্রাম | ১১. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |
| ৬. | দারুচিনি গুঁড়া | ১ গ্রাম | | | |

প্রস্তুত প্রণালি : পুষ্ট, পরিপক্ব ও লাল রঙের টমেটো নির্বাচন করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। প্রতিটি টমেটো ছুরি দিয়ে চার টুকরা করে কাটতে হয়। একটি চিকন কাঠি বা চামচ দিয়ে টমেটো হতে বিচিগুলো আলাদা করতে হয়। তারপর কাটা টমেটোগুলোকে চুলায় সিদ্ধ করতে হয়। সিদ্ধ হলে পরে বাঁশের চালনিতে কাঠের হাতা দিয়ে পিষে রস বের করতে হয়। মসলাগুলো আলাদা আলাদাভাবে ওজন করে নিতে হয়। সব মসলা মেপে নিতে হয়, সোডিয়াম বেনজয়েট, চিনি, লবণ আলাদাভাবে মেপে রেখে বাকি সব মসলা একত্রে নিয়ে একটা মসলার ব্যাগ বা থলি তৈরি করতে হয়। এই মসলার ব্যাগ টমেটোর রসে ডুবিয়ে দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। এখন নির্ধারিত পরিমাণের তিন ভাগের এক ভাগ চিনি প্রায় ৩৫ গ্রাম রসের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দেবার পর মিশ্রণ ঘন হয়ে তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে এলে মসলার ব্যাগটি হাত বা কাঠি দিয়ে চেপে নির্যাস বের করে ফেলে দিতে হয়। এবার এই মিশ্রণে

ভিনেগার, লবণ ও বাকি চিনি ভালোভাবে মিশাতে হয়। জ্বাল দিয়ে প্রয়োজনমতো ঘনত্বে আনতে হয়। চুলা থেকে নামানোর পর সোডিয়াম বেনজয়েট মেশাতে হয়। কেচাপ গরম অবস্থায় বোতলে সংরক্ষণ করে সামান্য ফাঁক রেখে ছিপি লাগিয়ে বায়ুরোধী করতে হয়। অতপর লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করতে হয়।

কেচাপ তৈরিতে রসের পরিবর্তে পিউরে ব্যবহার করা যায়। টমেটো কেচাপে আজকল কৃত্রিম রং ব্যবহার হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুষ্ট, পরিপক্ক ও লাল রঙের টমেটো ব্যবহার করলে কৃত্রিম রঙ ছাড়াও সুন্দর রং বিশিষ্ট কেচাপ তৈরি সম্ভব।

কেচাপে ব্যবহৃত চিনি, লবণ ও ভিনেগার পুরানো হলে তৈরি কেচাপ পাল্প ও রসে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পেকটিন ব্যবহার করে এই সমস্যা দূর করা যায়। আবার কেচাপের বোতল খুলে বেশি দিন রাখা যায় না, গন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য আজকাল চিনি ও ভিনেগারের পরিমাণ বাড়িয়ে মোট টিএসএস ৩২-৩৫% পর্যন্ত উঠানো হয়। এতে সংরক্ষণযোগ্যতা ঠিকই বাড়ে কিন্তু স্বাদে তারতম্য ঘটে। সেজন্য কেউ কেউ সোডিয়াম বেনজয়েটের পক্ষে মত দিয়েছেন।

টমেটো সস ও কেচাপের মধ্যে পার্থক্য :

টমেটো সস ও টমেটো কেচাপ দুটি খুবই কাছাকাছি খাদ্য সামগ্রী। তবে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। টমেটো কেচাপের টিএসএস অবশ্যই ২৫% হবে। কিন্তু টমেটো সসের ক্ষেত্রে এরকম কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। টমেটো কেচাপে এমন পরিমাণে মসলা ব্যবহার করতে হয় যাতে মসলার স্বাদ ও গন্ধ টমেটোর মূল গন্ধ ও স্বাদের পর প্রভাব বিস্তারিত করতে না পারে এবং টমেটো সসের তুলনায় কম পরিমাণে মসলা কেচাপে ব্যবহার হয়। তবে টমেটো সস ও কেচাপের উৎপাদন প্রক্রিয়া একই রকম।

৯.৪ টমেটোর খাদ্যসামগ্রী ক্যানিং

আন্তর্জাতিক বাজারে ক্যানিং করা টমেটোর যথেষ্ট কদর রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে টমেটো উৎপন্ন হয় এবং মৌসুমে দামও খুবই কম, কাজেই সবজি ক্যানিং এরক্ষেত্রে টমেটোই উত্তম সামগ্রী।

চিত্র : টমেটো ক্যানিং

চিত্র : কাচের বোতলে টমেটো

চিত্র : টমেটো পেস্ট

গাছে পাকা লাল বর্ণের টমেটো ক্যানিং -এর জন্য নির্বাচন করা হয়, পানি দিয়ে ধৌত করা হয়। ফুটন্ত পানিতে কিছুক্ষণ রেখে টমেটো চামড়া ঢিলে করা হয় এবং এই ঢিলে চামড়া সহজেই তুলে ফেলা হয়। তারপর এ টমেটো ধুয়ে নিয়ে ক্যানে ভর্তি করা হয় এবং ১% লবণ দ্রবণ যোগ করা হয়। কখনও অল্প পরিমাণ চিনিও এতে যোগ করা হয়। এরপর ক্যানকে অ্যাডজ্যাস্টিং করে সিল করা হয়। এরপর ক্যানকে ৪৫-৬০ মিনিট ফুটন্ত গরম পানিতে প্রসেসিং করা হয়। তারপর ক্যান ঠাণ্ডা করে গুদামজাত করা হয়।

টমেটো বোতলে সংরক্ষণ : টিনের কৌটায় সংরক্ষিত টমেটো একটি বহুল প্রচলিত তবে আমাদের দেশে ক্যান প্রস্তুত হয় না বলে এ পদ্ধতি এখনো শুরু হয়নি। তবে এর বিকল্প হিসেবে কাচের জার অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। কাচের গঠন যেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয় এবং অম্লধর্মী বা ক্ষারধর্মী না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে বিশেষ সতর্কতার সাথে মধ্যম আকারের সুগঠিত ও লাল রঙের অথচ নরম হয়নি এরূপ টমেটো বেছে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়। এরপর ধারালো ছুরির সাহায্যে বোঁটা ও বোঁটার লেগে থাকার জায়গাটি ফেলে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। ফুটন্ত পানিতে ত্বক বা খোসা আলগা করে ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে বাকল তুলে ফেলতে হয়। এরপর টমেটোর শাঁসগুলো জীবাণুমুক্ত টিনের কৌটায় বা কাচের পাত্রে রেখে শতকরা ১% লবণ সহকারে বীজ ও ত্বকমুক্ত টমেটোর রস দিয়ে ক্যান ভরে দিতে হয় এবং ক্যানের মুখ না লাগিয়ে ফুটন্ত পানিতে ৭-৮ মিনিট রেখে পাত্রের ভিতরটা সম্পূর্ণ বাতাসমুক্ত করে দ্রুত মুখ লাগাতে হয়। পুনরায় ফুটন্ত পানিতে ৪৫ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্তকরণের কাজটি সেরে ফেলতে হবে।
এখানে দুটো জিনিস মনে রাখা দরকার, তাহল (১) যথাসম্ভব গাছ পাকা এবং লাল রং ধরা টমেটো প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বাছাই করা দরকার, কারণ সবুজ বর্ণসহ টমেটো প্রক্রিয়াজাত করলে সেই সবুজ অংশটি পরে কালচে হয়ে যেতে পারে। (২) টমেটো যেন শক্ত হয় কারণ নরম হয়ে যাওয়া টমেটো প্রক্রিয়াজাতের সময় আরো নরম হয়ে গিয়ে গঠনের অখণ্ডতা নষ্ট করে ফলে, এতে গুণ ও মান বজায় থাকে না।

# অনুশীলনী-৯

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশে টমেটো কোন ঋতুতে জন্ম হয়?
২. গ্রীষ্মকালের টমেটোর জন্য শীতকালের টমেটো উত্তম কেন?
৩. টমেটোর উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে কী কী বর্ণ ধারণ করে?
৪. ১৮২০ সালের দিকে টমেটোর কী নাম ছিল?
৫. ফ্রেশ টমেটোর চেয়ে প্রক্রিয়াজাত টমেটোতে কী বেশি থাকে?
৬. কাঁচা টমেটো হতে পাকা টমেটোতে কতগুণ বিটা-ক্যারোটিন আছে?
৭. দৈনিক ১টি টমেটো হতে কতটুকু ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়?
৮. টমেটোতে অবস্থিত লাইকোপেন আমাদের কী উপকার করে?
৯. টমেটোর প্রক্রিয়াজাত খাদ্যগুলো কী কী?
১০. টমেটোর এসিটিডি ও TSS কত হবে?
১১. টমেটোর পেস্ট ও টমেটো পাল্পে TSS এর পরিমান কত হবে?
১২. টমেটোর জুসের TSS ২৫% নিতে হলে কী করতে হবে?
১৩. বাজারে টমেটোর রস কী কী পাত্রে পাওয়া যায়?
১৪. উষ্ম পদ্ধতিতে টমেটোর রস নিষ্কাশনের সাথে সাথে আর কী কী উপকার হয়?
১৫. কোন পদ্ধতিতে রস নিষ্কাশন করলে তাজা টমেটোর সাধ পাওয়া যায়?
১৬. ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে রস নিষ্কাশনের যন্ত্রের নাম কী?
১৭. রসের কষা স্বাদ দূর করার জন্য কী দিতে হয়?
১৮. হিট এক্সচেঞ্জার যন্ত্র দিয়ে কী করা হয়?
১৯. টমেটো কোথায় এবং কীভাবে পানিতে ধুতে হয়?
২০. তাপ প্রয়োগ করে টমেটোর পাল্প তৈরির সুবিধা কী কী?
২১. টমেটো সসে TSS এর মান কত হবে?
২২. ৫ কেজি টমেটো থেকে কত কেজি জুস পাওয়া যাবে?
২৩. কেচাপে ব্যবহৃত চিনি, লবণ ও ভিনেগার পুরানো হলে কী হয়?
২৪. কেচাপের সংরক্ষণ যোগ্যতা কীভাবে বাড়ানো যায়?
২৫. সবুজ বর্ণসহ টমেটো প্রক্রিয়াজত করলে পরে কী হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টমেটোর পরিচিতি লেখ।
২. টমেটোর পুষ্টিগুণ র্বণনা লেখ।
৩. ভালো টমেটো জুসের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৪. টমেটোর পিউরে বা পাল্প কীভাবে বের করা হয়?
৫. টমেটোর পেস্ট কীভাবে তৈরি করে?
৬. টমেটো পাউডার কীভাবে তৈরি করে?
৭. উষ্ম পদ্ধতি কীভাবে টমেটোর জুস করা হয়?
৮. টমেটো সস ও কেচাপের মধ্যে পার্থক্য কী?
৯. এগ্রোবেসড শিল্পে টমেটো সসের গুরুত্ব লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. টমেটোর পরিচিতি, পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা লেখ।
২. টমেটোর জুস ও পাল্প প্রস্তুতকরণ বর্ণনা কর?
৩. টমেটো সস ও কেচাপের উপকরণ ও প্রস্তুপ্রণালি লেখ।
৪. টমেটো ক্যানিং ও টমেটো বোতলজাতকরণ বর্ণনা কর।

## অধ্যায়-১০
# বিভিন্ন ধরনের সবজি থেকে খাদ্য

ভূমিকা : ফলমূল ও শাকসবজি আমাদের পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস। আমাদের শরীর গঠন ও রোগ প্রতিরোধে বিরাট ভূমিকা পালন করে শাক-সবজি। শরীর সুস্থ রাখার জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রতিদিন ২৩০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমরা খাই গড়ে ৭০ গ্রাম সবজি। এতে দেখা যায় দৈনিক মাত্র ৩২ ভাগ সবজি খেয়ে থাকি বাকি ৬৮ ভাগ সবজিই শরীরে ঘাটতি থাকে। ফলে আমাদের শরীর প্রতিদিন বঞ্চিত হচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি উপাদান হতে। দেশের সকল মানুষের পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণে অত্যন্ত প্রয়োজন। পারিবারিক পর্যায়ে শাক সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করলে এসব ফসলের অপচয় অনেকাংশে কমে যাবে এবং পুষ্টি সংরক্ষণ হবে, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য সারা বছর পাওয়া যাবে যা দেশের পুষ্টি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১০.১ বেগুন, গাঁজর, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি, চালকুমড়া ও করলার পরিচিতি ও পুষ্টিমান

ক) বেগুনের পরিচিতি : বেগুন বাংলাদের একটি শীর্ষ স্থানীয় সবজি। বেগুন এমন একটি সবজি যা সারা বছর পাওয়া যায় এবং সকল স্তরের মানুষ খায়। বেগুনের ইংরেজি নাম Bringal বা Eggplant এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সোলানাম মেলোংগেমা (Solanum melongena)।এটি সোলানেসী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বছরের সব ঋতুতেই বেগুনের আবাদ হযে থাকে তবে শীত মৌসুমেই ফলন বেশি হয়। স্বাদ ও পুষ্টিমানের দিক দিয়ে এটি উৎকৃষ্ট সবজি। এটি রান্না, ভাজি, ভর্তা ও সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধক, কোলেস্টেরল দূর করা, রক্তশূন্যতা দূর করা, মুখের ঘা প্রতিরোধ ও ক্ষতস্থান শুকাতে সাহায্য করে।

খ) গাজরের পরিচিতি : গাজর একটি উৎকৃষ্ট সবজি এর মধ্যে অনেক গুণের সমন্বয় রয়েছে। হিমাগারে ৬ মাসের অধিক সংরক্ষণ করা যায়। এতে প্রচুর পরিমানে বিটা ক্যারোটিন থাকে। গাজরের ইংরেজি নাম Carrot. ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এলাকায় এর উৎপত্তি হয়। গাজর একটি রূপান্তরিত মূল। মূলের আগায় একগুচ্ছ পাতা থাকে। পাতা ও মূলের সংযোগস্থলে অবস্থিত অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার কাণ্ড ভালো করে লক্ষ্য না করলে চোখেই পড়ে না। গাজরের হালুয়া অত্যন্ত উপকারী।

গ) মটরশুঁটির পরিচিতি : বসন্তের শুরুতে বা শীতের শেষে বাজারে আসে মটরশুঁটি। মটরশুঁটিকে ইংরেজিতে Green Pea বলে। এটি লিগুমিনেসি পরিবারে অন্তর্ভূক্ত। মটরশুঁটি হতে মটর ডাল হয়ে থাকে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা জাপান ও অন্যান্য দেশে অপিরপক্ব মটরশুঁটি প্রচুর পরিমাণে ক্যানিং এবং হিমাহিত করে ব্যবহার হয়। মটরশুঁটি সবজি হলেও এতে প্রচুর আমিষ আছে। আর আছে প্রচুর ভিটামিন 'কে'। মটরশুঁটিতে যে চর্বি আছে তা খুবই ভালো। মোটকথা মটরশুঁটি শরীরের জন্য অতি উপকারী সবজি।

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের সবজি

ঘ) বাঁধাকপির পরিচিতি : বাঁধাকপিকে ইংরেজিতে Cabbage বলে। এর বৈজ্ঞানিক নাম ব্রাসিকা ওলেরাসিয়া (Brasicca oleracea Uar. Capitata)। এ গোত্রের অন্যান্য সবজিগুলো হচ্ছে ফুলকপি, ব্রোকলি, ওলকপি, মূলা ও শালগম ইত্যাদি। বাংলাদেশে এটি শীতকালীন সবজি হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি পুষ্টিকর সবজি এবং সংগ্রহের উপযুক্ত হওয়ার পরও অনেকদিন ক্ষেতে রাখা যায়। এটির ফলন ও খুব বেশি। পারিবারিক বাগানের জন্য এটি একটি আদর্শ সবজি। অতিরিক্ত উৎপাদিত বাঁধাকপির পাতা কেটে শুকিয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়।

ঙ) চাল কুমড়ার পরিচিতি : চাল কুমড়াকে ইংরেজিতে Ash Gourd বলে এর বৈজ্ঞানিক নাম বেনিনকাসা হিস্পিড়া (Benincasa hispida)। এটি কুমড়া পরিবারে সবজি এ পরিবারের অন্যান্য সবজিগুলো হচ্ছে। মিষ্টি কুমড়া শসা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, করলা, কাঁকরল ইত্যাদি। এটি খরিফ মৌসুমের সবজি। চালকুমড়ার কচি ফল সবজি এবং পাকা বা পরিপক্ব ফল অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হলে সম্পূর্ণ পাকার পর ফল কাটতে হবে। পাকার সাথে সাথে ফলের গায়ে মোমের মতো একটি সাদা স্তরের সৃষ্টি হয় এজন্য পাকা ফল সাদা দেখায়।

করলার পরিচিতি : করলাকে ইংরেজিতে Bitter gourd বলে। এর বৈজ্ঞানিক নাম মোরডিয়া চ্যারান্সিয়া (Momordia charantia)। এটি কুমড়া পরিবারে সবজি। এ পরিবারে অন্যান্য সবজিগুলো চাল কুমড়ার মতো। করলা বাংলাদেশের সমাদৃত সবজিসমূহের অন্যতম। এর তিক্ত স্বাদ ঔষধের কাজ করে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চীন দেশে প্রচুর পরিমাণে এর চাষ হয়। কোনো কোনো দেশে সবজি ছাড়াও এর কচি পাতা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। করলার মধ্যে যে জাতটি ছোট আকৃতির তাকে উচ্ছে বলে। এটি চাষ করতে বাউনী দেয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বড় জাতের করলা বাউনী ছাড়া ফসল হয় না। কিউকার বিটামিন নামক দ্রব্য উপস্থিতির কারণে করলা তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার শাক সবজি যেমন বেগুন, গাজর, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, মূলা, শসা, করলা ও কাঁচা মরিচের পুষ্টিমান নিম্নে দেয়া হল।

সারণি : বিভিন্ন সবজির পুষ্টিমান (আহার উপযোগী ১০০ গ্রাম)

| ক্র: নং | পুষ্টি উপাদান | বেগুন | মুলা | গাজর | বাঁধাকপি | ফুল কপি | মিষ্টি কুমড়া | চাল কুমড়া | মটরশুঁটি | করলা | কাঁচা মরিচ | শশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমিষ (গ্রাম) | ১.৮ | ১.৩ | ১.২ | ১.৩ | ২.৬ | ১.৪ | ০.৪ | ৭.৪ | ২.৫ | ১.৬ | ১.৬ |
| ২ | শ্বেতসার (গ্রাম) | ২.২ | ৫.৪ | ১২.৭ | ৪.৭ | ৭.৫ | ৪.৫ | ১.৯ | ২৩.৭ | ৪.৩ | ২৩.৭ | ৩.৫ |
| ৩ | চর্বি (গ্রাম) | ২.৯ | ০.১ | ০.৯ | ০.২ | ০.১ | ০.৫ | ০.১ | ০.৩ | ০.১ | ০.১ | ০.১ |
| ৪ | খনিজ লবণ (গ্রাম) | ০.৮ | ০.৫ | ০.০৪ | ০.৫ | ০.৮ | ০.৭ | ০.৩ | ৯.২ | ০.০৪ | ১.০ | ০.৪ |
| ৫ | ভিটামিন বি ১ (গ্রাম) | ০.১২ | ০.৪৩ | ০.০৪ | ০.০৬ | ০.০২ | ০.০৭ | ০.০৬ | ০.০১ | ০.০৪ | ০.১৭ | ০.১৬ |
| ৬ | ভিটামিন বি২ (গ্রাম) | ০.০৮ | অল্প | ০.০৫ | ০.০৫ | ০.০৩ | ০.০৬ | ০.০১ | ০.১২ | ০.০২ | ০.১৬ | ০.০২ |
| ৭ | ভিটামিন সি (মি.গ্রাম) | ৫ | ৩৪ | ১৫ | ৬০ | ৯১ | ২৬ | ১ | ৫ | ৬৮ | ১২৫ | ৫ |
| ৮ | ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম) | ২৮ | ২৫ | ২৭ | ৩১ | ৪১ | ৪৮ | ৩০ | ২৬ | ১৪ | ১১ | ১৪ |
| ৯ | লৌহ (মি.গ্রাম) | ০.৯ | ০.৫ | ২.২০ | ০.৮ | ১.৫ | .০৭ | ০.৮ | ১.৫ | ১.৮ | ১.২ | ১.৫ |
| ১০ | ক্যারোটিন (মাই.গ্রা) | ৮৫০ | - | ১০৫২০ | ৬০০ | - | ৭২০০ | ০ | ৮৩ | ১৪৫ | ২৩৪০ | অল্প |
| ১১ | খাদ্যশক্তি (কি.ক্যালরি) | ৪২ | ২৮ | ৫৭ | ২৬ | ৪১ | ৪১ | ১০ | ১২৭ | ২৮ | ১০৩ | ২২ |

বিভিন্ন সবজি থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য

আমাদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ হচ্ছে শাক-সবজি। শরীর সুস্থ ও রোগবালাই হতে বাঁচার অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রচুর ফল ও সবজি খাওয়া। সবজি আমরা কাঁচা হিসেবে অথবা রান্না করে খেয়ে থাকি। অনেক সবজিই আমরা প্রক্রিয়াজাত করে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। এতে সবজির পুষ্টিগুণ অক্ষণ্ন রেখে সারা বছর সবজির চাহিদা মিটানো সম্ভব। বিভিন্ন সবজি হতে সাধারণত যে সকল প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরি করা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি খাদ্যের নাম বর্ণনা এ অধ্যায়ে করা হলো-

১. বেগুনের টক-মিষ্টি ঝাল আচার
২. গাজরের জ্যাম, হালুয়া ও পায়েস
৩. বাঁধাকপির আচার ও সয়ারক্রট
৪. চাল কুমড়ার মোরব্বা ও ক্যান্ডি
৫. মিশ্র সবজির আচার
৬. করলা শুষ্ককরণ
৭. মটরশুঁটি ও মাশরুম ক্যানিং ইত্যাদি।

১০.২ বেগুনের টক মিষ্টি আচার

বেগুনের টকমিষ্টি আচার বা মিশ্রিত প্রকৃতির পিকল। পিকল মানে আচার। এটা খুব রুচিকর পিকল বা আচার। খুব সহজ পদ্ধতিতে এবং দামি যন্ত্রপাতি ছাড়াই এটা প্রস্তুত করা সম্ভব বিধায় গ্রামীণ পর্যায়ে এ প্রযুক্তি প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই আচার তৈরির উপকরণসমূহ নিম্নরূপ–

| ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমাণ | ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বেগুন | ১ কেজি | ৮ | মেথির গুঁড়া | ৫ গ্রাম |
| ২ | সরিষার তেল | ৪০০ মি.লি | ৯ | জিরার গুঁড়া | ২.৫ গ্রাম |
| ৩ | রসুন | ৩০ গ্রাম | ১০ | কাঁচা মরিচ | ৩০ গ্রাম |
| ৪ | আদা | ৬০ গ্রাম | ১১ | লবণ | ৪০ গ্রাম |
| ৫ | শুকনা মরিচের গুঁড়া | ২০ গ্রাম | ১২ | চিনি | ২০০ গ্রাম |
| ৬ | হলুদের গুঁড়া | ১০গ্রাম | ১৩ | গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড | ১০০ মি.লি |
| ৭ | সরিষার গুঁড়া | ২০ গ্রাম | | | |

প্রস্তুত প্রণালি : আচার তৈরির জন্য লম্বা ও সরু জাতের বেগুন নির্বাচন এবং পুষ্ট ও দোষমুক্ত বেগুন সংগ্রহ করতে হয়। বেগুনগুলো পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে বোঁটা ফেলে দিতে হয়। অতঃপর বেগুনগুলো ৫ সে.মি. লম্বা টুকরা করে টুকরাগুলো লম্বালম্বিভাবে কেটে দুই ফালি করতে হয়। ১ কেজি পরিমাণ কাটা বেগুন ওজন করে নিতে হয়। উপকরণের পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য দ্রব্যের ওজন নিয়ে আলাদা রাখতে হয়। আদা ও রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মি.লি. ১% এসিটিক এসিড দ্রবণে পেস্ট তৈরি করা হয়। কাঁচা মরিচের বোঁটা ছাড়িয়ে ৪% এসিটিক এসিড দ্রবণে ভিজিয়ে রাখতে হয়। আদা ও রসুনের পেস্টের সাথে হলুদ ও মরিচের গুঁড়া ভালোভাবে মিশাতে হয়। একটি কড়াইতে সবটুকু সরিষার তেল নিয়ে তাতে বেগুনের টুকরাগুলো ভালোভাবে ভেজে নিয়ে তেল ঝরিয়ে অপর একটি পাত্রে রাখা হয়। অতঃপর আদা, রসুন ও হলুদ মরিচের পেস্ট কড়াইয়ের অবশিষ্ট তেলে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হয়। এবার কষানো মশলায় ভাজা বেগুনের

টুকরা , কাঁচা মরিচ, চিনি , মেথির গুঁড়া, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করতে হয় এবং জ্বাল দিতে হয়। শেষে লবণ ও অবশিষ্ট ১৪ মি.লি. এসিটিক এসিড যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। মিশ্রণটি একটি পুরু ঘনত্বে এলে পাত্রটি নামিয়ে তৈরিকৃত আচার জীবানুমুক্ত বোতলে বায়ুরোধী করে ছিপি এঁটে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বোতলে আচারের উপর যেন তেলের স্তর থাকে। আচারের বোতলগুলো শুকনো ও পরিষ্কার জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

## ১০.৩ গাজরের হালুয়া

গাজরের হালুয়া একটি অতি সুস্বাদু আকর্ষনীয় মিষ্টান্ন। এটি দেখতে খুবই সুন্দর। মৌসুমে সকলেই এই হালুয়া বানিয়ে রসনা তৃপ্তি করে থাকেন। এর প্রয়োজনীয় উপকরণ নিম্নে দেয়া হলো–

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| গাজর | ২৫ গ্রাম |
| চিনি | ২০০ গ্রাম |
| ঘি | ৩০ গ্রাম |
| গোলাপ বা কেওড়ার পানি | ৫ মি.লি. |
| কিসমিস | ১২টি |
| এলাচ গুঁড়া | ২.৫ গ্রাম |
| কুচানো বাদাম | ২.৫ গ্রাম |

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপক্ব গাজর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে সিদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা পানি ঝরিয়ে বেটে নেয়া হয়। চিনি ঘি, এলাচ গুঁড়া ও গাজর বাটা কড়াইতে মিশিয়ে চুলায় দিয়ে নাড়তে হয়। হালুয়া আঠালো হয়ে গেলে ঘি মাখানো প্লেট বা ডিশে রেখে তার উপর কিসমিস, বাদাম ও গোলাপ জল ছড়িয়ে দিতে হয়। ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করা হয়।

গাজরের পায়েস : গাজরের পায়েস একটি অতি সুস্বাদু আকর্ষণীয় মিষ্টান্ন । এটি দেখতে খুবই সুন্দর। এর প্রয়োজনীয় উপকরণ নিম্নে দেয়া হলো-

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| কুচানো গাজর | ৬০ গ্রাম |
| ঘন দুধ | ২৫০ গ্রাম |
| এলাচ গুঁড়া | ২.৫ গ্রাম |
| চিনি | ২০০ গ্রাম |
| ছোট কিসমিস | ১০টি |
| গোলাপ/ কেওড়া পানি | ১০ মি.লি. |

প্রস্তুত প্রণালি : পরিপক্ব ও পুষ্ট এবং লাল গাজরের শিঁকড় পরিষ্কার করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হয় তারপর গাজরের চতুর্দিকে লাল অংশ কুরিয়ে নেয়া হয়। এই কুচানো বা কুরানো গাজর ৫-১০ মিনিট সিদ্ধ করে নিতে হয়। তারপর পানি ঝরিয়ে গাজর আলাদা করা হয়। কড়াইতে সব উপকরণ এক সাথে দিয়ে ভালো করে নেড়ে জ্বাল দিতে হয়। পায়েস একটু ঘন হয়ে এলে পাত্রে ঢেলে রাখতে হয়। কিসমিস ও গোলাপজল দিয়ে ঠান্ডা হলে পরিবেশন করা হয়।

### ১০.৪ মটরশুঁটি ক্যানিং

সবুজ পরিপক্ব মটরশুঁটি সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়। রাসায়নিক সংযুক্তিতে সবজি হলো ফল থেকে কিছুটা ভিন্ন। ফলের চেয়ে সবজির মধ্যে স্টার্চ ও সেলুলোজ বেশি থাকে; কিন্তু চিনি ও এসিড কম থাকে। এছাড়া মাটি থেকে বিভিন্ন তাপসহিষ্ণু অণুজীব বা মাইক্রোঅর্গানিজম সবজিতে আশ্রয় নেয়। এর ফলে অনেক সবজিতে আপত্তিকর গন্ধ থাকে। তাই কৌটাতে সবজি ভর্তি করার পূর্বে সবজি ব্লাঞ্চিং করে সবজির আপত্তিকর গন্ধ দূর করা হয়। নিচের সবজির কৌটাজাতকরণ বা ক্যানিং পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

১) সবুজ মটরশুঁটি সংগ্রহ ও ধৌতকরণ : ক্ষেত থেকে সংগৃহীত সবুজ মটরশুটিকে খোসামুক্ত করে পরিষ্কার পানিতে কয়েকবার ধুয়ে নেয়া হয়। এর মধ্যে পাতার অংশ বা বোঁটা যেন না থাকে তা নিশ্চিত করা হয়।

২) কৌটা জীবাণুমুক্তকরণ : এর মধ্যে কৌটাগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং কৌটার ঢাকনা ও রিংগুলোকে একইভাবে জীবাণুমুক্ত করে উত্তপ্ত পানিতে রাখা হয়।

৩) ব্লাঞ্চিং : এরপর মটরশুঁটির দানাগুলোকে কড়াইতে নিয়ে প্রতি চার কাপ মটরদানার জন্য এক কাপ ফুটন্ত পানি যোগ করা হয়। এরপর ফুটন্ত পানিতে পাঁচ মিনিট যাবৎ উত্তপ্ত করে ব্লাঞ্চিং করা হয় এবং ঝাঁঝরি ব্যবহার করে ব্লাঞ্চিং করা মটরদানাগুলোকে 'তরল' থেকে আলাদা করা হয়।

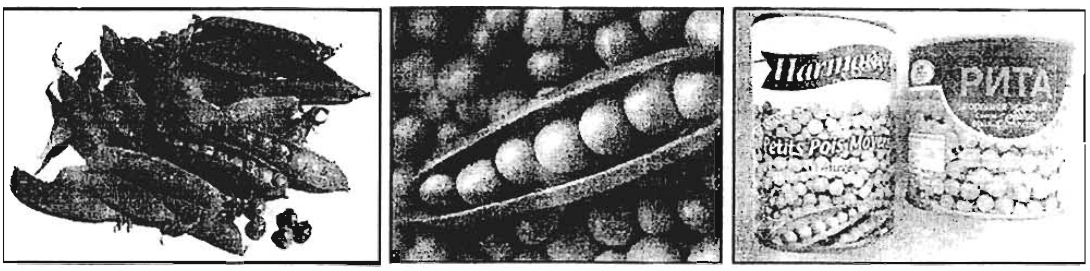


চিত্র : কাঁচা ও কৌটাকৃত মটরশুঁটি

৪) ব্লাঞ্চিং মটরকে জারে ভর্তি : ব্লাঞ্চিং শেষে মটরশুঁটিকে জীবাণুমুক্ত কৌটায় ভর্তি করা হয়। এরপর ক্যানিং লবণরূপে ২% লবণ ও ৫% চিনি মিশিয়ে 'ক্যানিং তরল' তৈরি করা হয়। এবার কৌটাগুলোকে ওপর থেকে ১ ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ ফাঁকা রেখে ক্যানিং তরল যোগ করে পূর্ণ করা হয়। মটরশুঁটির ফাঁকে তরলের মধ্যে যেন বাতাসের বুদবুদ না থাকে, তা নিশ্চিত করা হয়।

৫) এগজস্টিং, রিটর্টিং, লেবেলিং ও গুদামজাতকরণ : এরপর কৌটাগুলোকে প্রেসার ক্যানে রেখে প্রথমে ১২১° সেলসিয়াস-এ দশ মিনিট যাবৎ উত্তপ্ত করে এগজস্টিং করা হয় এবং শেষে কৌটার মুখের ঢাকনাকে সম্পূর্ণ সিলড করা হয়।

এরপর প্রেসার ক্যানারে ৩৫ মিনিট যাবত রিটর্টিং করা হয়। সব শেষে কৌটা শীতলকরণ ও লেবেলিং করে গুদামজাত করা হয়।

### ১০.৫ বাঁধাকপির সয়ার ক্রট ও আচার

বাঁধাকপির সয়ার ক্রট : সয়ারক্রট অর্থ লবণে জারানো বাঁধাকপি। এটি পশ্চিম ইউরোপে খুবই জনপ্রিয়। এই পদ্ধতিতে মৌসুমে উৎপাদিত সস্তা বাঁধাকপি ক্রয় করে প্রক্রিয়াজাত করে রাখা হয়। বাঁধাকপিতে যে শর্করা

জাতীয় উপাদান থাকে, ল্যাকটিক ব্যাকটেরিয়া তা ভেঙ্গে ল্যাকটিক এসিড তৈরি করে। এই উৎপাদিত ল্যাকটিক এসিড অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণকে দমন রাখে।

প্রস্তুত প্রণালি : টাটকা ও পরিপক্ব বাঁধাকপি নিতে হয়। বোঁটা ও বাহিরের পাতা কেটে বাদ দিতে হয়। বাঁধাকপির ভিতরের শক্ত কোর অংশটি ফেলে দিতে হয়। ধারালো ছুরি দিয়ে সম্পূর্ণ বাঁধাকপি ০.২৫ সেমি. প্রস্থে কুচি কুচি করে ফালি করতে হয়। ফালির ওজন নিতে হয় এবং এর শতকরা ২.৫ ভাগ লবণ উপরে ছিটিয়ে দিতে হয়। ফালি ও লবণ ভালো করে কচলে রস বের করতে হয়। এবারে বাঁধাকপির ফালি ও নির্গত রস ঢাকনিসহ লম্বা কাচের বৈয়াম বা স্টিল বা প্লাস্টিকের পাত্রে নিতে হয়। এবং চেপে চেপে ফালি বসাতে হয়। উপরে রস থাকবে। পলিথিন ব্যাগে পানি ভর্তি করে পাত্রের ভেতরে বসিয়ে দিতে হয় যাতে এর চাপে ফালি রসের ভেতরে ডুবে থাকে। বোতলের ঢাকনি বসিয়ে আঠাযুক্ত টেপ দিয়ে তা বন্ধ করে দিতে হয়। ৩-৪ দিন পর সামান্য বুঁদ বুঁদ উঠলে একদিকে টেপ তুলে দিলে গ্যাস বেরিয়ে যায়। ১২-১৪ দিন পর ফার্মেন্টেশন শেষ হয় গেলে ফালির রং ঈষৎ হলুদাভ হলে রস আলাদা করে ৭৫$^0$ C পর্যন্ত তাপ দিতে হয়। তারপর ফালি দিয়ে ৯০$^0$ C তাপ দেয়া হয়। এরপর জীবাণুমুক্ত পাত্রে প্রথমে উত্তপ্ত ফালি ও তার উপর রস দিতে হয়। ফুটন্ত পানিতে ১০ মিনিট ফুটিয়ে বায়ুরোধী করে মুখ লাগিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়।

বাঁধাকপির আচার : এই আচার তৈরি করতে পুরোপুরি পরিপক্ক বাঁধাকপি নিতে হয় এবং বাইরের মোটা পাতাগুলো ফেলে দিতে হয়। তারপর বাঁধাকপির মাথাকে ছোট ছোট আকারে কেটে নিতে হয়। প্লাস্টিক বা স্টেইনলেস স্টিলের পাত্রে টুকরাগুলোকে সাজিয়ে রেখে তার উপর লবণ ছিটিয়ে দিতে হয়। উক্ত বাঁধাকপির উপর ভারী কাঠের বোর্ড রাখতে হয়। এভাবে ২৪ ঘণ্টা ধরে রেখে দিতে হয়। পরের দিন প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে লবণের পানি অপসারণ করতে হয়। মসলা সমৃদ্ধ বা মসলার নির্যাস সমৃদ্ধ ভিনেগার যোগ করে পূর্ণ করতে হয়। এভাবে ২৪ ঘণ্টা রাখতে হয় এর মধ্যে মাঝে মাঝে মিশ্রণ মিশায়ে নিতে হয়। এতে বাঁধাকপির টুকরাগুলো ভিনেগার চুষে নেয়। তারপর জারে হালকাভাবে প্যাকিং করতে হয়। উপরের দিকে আরো নতুন ভিনেগার যোগ করতে হয়। তারপর জীবাণুমুক্ত করে সিল করে দিতে হয়।

১০.৬ চালকুমড়ার মোরব্বা

এটি একটি অত্যন্ত মজাদার ও জনপ্রিয় মিষ্টান্ন। গ্রামীণ নারীরা এই মোরব্বা তৈরি করে বোতলে সংরক্ষণ করে রাখে মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য। বেকারি শিল্পে এই মোরব্বা প্রচুর চাহিদা রয়েছে। চালকুমড়া মোরব্বার উপকরণ নিম্নরূপ-

| উপকরণ | পরিমাণ |
|---|---|
| পাকা চালকুমড়া | ২ কেজি |
| চিনি | ৪ কেজি |
| খাবার সোড়া | ৫ গ্রাম |
| চুন | ২% |
| দুধ | ১০ গ্রাম |
| এলাচ ও দারুচিনি | সামান্য |

চিত্র : চাল কুমড়ার মোরব্বা

**প্রস্তুত প্রণালি :** পরিপক্ব বা পাকা চাল কুমড়া চার ফালি করে কেটে খোসা বা বাকল ফেলে দিতে হয়। বিচিসহ কুমড়ার নরম অংশ কেটে ফেলে ৩-৫ সে.মি. প্রস্থ ও ৮-১০ সেমি. লম্বা টুকরা করে কেটে নিতে হয়। কাটা চামচ বা খেজুরের কাঁটা দিয়ে ভালো করে কেচে নিতে হয়। পানিতে চুন গুলে ৩-৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। চুনের পানি থেকে তুলে কুমড়ার টুকরাগুলো ডুবো পানিতে কয়েক মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিতে হয়। এরপর পানিতে চিনি দিয়ে সিরা করে নিতে হয়। চিনির সিরায় ময়লা থাকলে দুধ দিয়ে ময়লা কেটে নিতে হয়। সিরার ভিতর চালকুমড়ার টুকরা দিয়ে জ্বাল দিতে হয়। আরও জ্বাল দেয়ার পর সিরা খুব ঘন ও আঠাল হলে এলাচ, দারুচিনি ও খাওয়ার সোডা পানিতে গুলিয়ে কুমড়ার হাঁড়িতে দিতে হয়। চিনি ঘন হয়ে আসলে ঘন ঘন নাড়তে হয়। মোরব্বা চুলা হতে নামিয়ে হাঁড়ি সামান্য কাত করে রাখতে হয় যাতে সিরা নিচে জমে যায়। জমানো সিরা তুলে মোরব্বার উপর দিতে হয়। এভাবে বেশ কয়েকবারবর মোরব্বার উপর সিরা দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। চিনি জমে এলে পরিষ্কার প্লাস্টিক শিটের উপর মোরব্বা আলাদা করে ছড়িয়ে রাখা হয়। মোরব্বা ঠাণ্ডা হয়ে চিনি সম্পূর্ণ জমে গেলে বোতলে ভরে ভালো করে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। এ মোরব্বা ৩-৪ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

**চালকুমড়ার ক্যান্ডি :** এক্ষেত্রে চালকুমড়ার টুকরাগুলো মোরব্বার মতো বড় টুকরা না করে ২×২×২ সে.মি. আকারে কাটা হয়। টুকরাগুলো পাতলা চুনের পানিতে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয়। কাঁটা চামচ দিয়ে টুকরার গায়ে ছিদ্র করে পুনরায় চুনের পানিতে ১ দিন রাখতে হয়। ফিটকিরির ৩% দ্রবণ ফুটিয়ে নিয়ে তাতে চালকুমড়ার টুকরা দিয়ে দ্রবণটি ফুটিয়ে টুকরাগুলো নরম করা হয়। মোরব্বার মতো ধাপে ধাপে চিনি যোগ করে সিরায় ঘনত্ব ৭৫$^0$ ব্রিক্স হলে সাত দিন রেখে দিতে হয়। কুমড়ার টুকরা সিরা থেকে তুলে ফুটন্ত পানিতে ৫-৬ সেকেন্ড ডুবিয়ে নিতে হয়। ট্রেতে কাগজ বিছিয়ে তার উপর ক্যান্ডিগুলো বিছিয়ে পুরো একদিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। গুঁড়ো চিনি ক্যান্ডিতে মাখিয়ে সেলোফেন শীটে মুড়ে কাচের পাত্রে বা কাগজের কার্টনে প্যাক করে রাখতে হয়। ক্যান্ডির জন্য ড্রায়ার ব্যবহার করলে ৫০-৬০$^0$ C এ ১২ ঘন্টা রাখতে হয়।

**১০.৭ করলা শুষ্ককরণ :**

**করলা শুকানো :** পরিপুষ্ট ও অক্ষত করলা নির্বাচন করতে হয়। ধারালো ছুরির সাহায্যে ৩-৫ মি. মি. পুরু করে ফালি করে কাটতে হয়। চুলায় পানি গরম করে ফুটন্ত পানিতে ৭-৮ মিনিট ফুটিয়ে ব্লাঞ্চ করে নিতে হয়। পানি ঝরিয়ে করলার টুকরাগুলো সোলার ড্রায়ারে বা রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। বেশ কয়েকদিন শুকানোর পর শুকানো করলা ১৫:১ অনুপাতে শুকাতে হয়। অতঃপর শুকনা করলা পলিথিন ব্যাগে বা কাচের বোতলে বা প্লাস্টিক বোতলে ভরে মুখে ছিপি লাগিয়ে বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করতে হয়। একইভাবে ঢেঁড়স ও মিষ্টি কুমড়ার ফালিও শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

# অনুশীলনী-১০

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রতিদিন একজন বয়স্ক লোকের কতটুকু সবজি খাওয়া প্রয়োজন?
২. বেগুন কী কী রোগ সারাতে সাহায্য করে?
৩. গাজর হিমাগারে কতদিন সংরক্ষণ করা যায়?
৪. কোন কোন দেশে অপরিপক্ব মটরশুঁটি প্রচুর ব্যবহার হয়?
৫. কপি গোত্রের অন্যান্য সবজি গুলো কী কী ?
৬. চালকুমড়ার পাকা ফল কেন সাদা দেখায়?
৭. করলার ছোট আকৃতির জাতকে কী বলে?
৮. গাজরের পায়েস তৈরির উপকরন গুলো কী কী?
৯. ফলের চেয়ে সবজিতে কী বেশি ও কী কম থাকে?
১০. সবজিকে ব্লাঞ্চিং করলে কী দূর হয়?
১১. ক্যানিং তরল বা দ্রবণ কী দিয়ে তৈরি করা হয়?
১২. কতক্ষণ ক্যানকে রিটর্টিং করা হয়?
১৩. সয়ারক্রট মানে কী?
১৪. ল্যাকটিক এসিড কীভাবে তৈরি হয়?
১৫. সয়ারক্রটে কতদিন পর ফার্মেন্টেশন শেষ হয়?
১৬. বাঁধাকপির সাথে কী মিশালে আচার তৈরি হয়?
১৭. চালকুমড়ার মোরব্বার টুকরাগুলো কেন চুনে ভিজাতে হয়?
১৮. চালকুমড়ার ক্যান্ডি তৈরিতে ৭৫% ব্রিক্স হতে কত দিন লাগে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বেগুন, গাজর ও মটরশুঁটির পরিচিতি দাও।
২. গাজরের হালুয়া তৈরির প্রণালি লেখ।
৩. গাজরের পায়েস কীভাবে তৈরি করে?
৪. মটরশুটি ক্যানিং এর ধাপগুলো কী কী?
৫. বাঁধাকপির আচার কীভাবে তৈরি করে?
৬. চালকুমড়ার কান্ডি তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৭. করলা শুষ্ককর বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বেগুন, গাজর, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি, চালকুমড়া ও করলার পরিচিতি ও পুষ্টিমান র্বণনা কর।
২. বেগুনের টক, মিষ্টি ও ঝাল আচারের উপকরণ ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. মটরশুঁটি ক্যানিং ও বাঁধাকাপির সয়ারক্রট তৈরি প্রণালি লেখ।
৪. চালকুমড়ার মোরব্বা ও ক্যান্ডি তৈরি করার বিবরণ দাও।

# ব্যবহারিক
## দ্বিতীয় পত্র

অনুশীলনী- ১
ফল ও সবজির সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অনুশীলন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য
উপযুক্ত প্রযুক্তি ও আধুনিক কলাকৌশলের মাধ্যমে ভৌত ও পুষ্টিমান বজায় রেখে ফল ও সবজি দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী করে রাখার পদ্ধতিকে সংরক্ষণ বলা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ফল ও সবজির তাজা অবস্থার গুণাগুণগুলো বজায় থাকে এবং সংরক্ষিত ফসল তাজা ফল ও সবজি হিসেবে ভক্ষণ বা খাওয়া যাবে। যেমন- হিমাগারে বা কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষণ বা বাঁশের খাচায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ ইত্যাদি। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো -

১. ফল ও সবজির সজিব অবস্থা বজায় রাখা।
২. ফল ও সবজির শরীরের জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া কর্মের মাত্রা অনেক কমিয়ে আনা।
৩. ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন যেন খুব ধীরে ধীরে ঘটে তার ব্যবস্থা করা।

ফল ও সবজির সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজ অনুসরণ করতে হবে-

১. ফল ও সবজি সংরক্ষণ ৫ ভাগে করা যেতে পারে।
২. প্রথম পদ্ধতিতে তাপমাত্রা কমিয়ে। তাপমাত্রা কমানোর ফলে ফল ও সবজির শ্বসন ও প্রস্বেদন কমে যাবে এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকবে।
৩. আর্দ্রতা বাড়ানো– ফল ও সবজিতে ৮০% জলীয় পদার্থ থাকে। তাই ফল পাড়ার পর তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, আর্দ্রতা কম থাকলে ফল ও সবজি নষ্ট হয়ে যাবে। এ জন্য হিউমিডিফায়ার দিয়ে আর্দ্রতা বাড়াতে হবে।
৪. বাতাস চলাচল- শ্বসন প্রক্রিয়ায় ফল ও সবজি হতে ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে ফল ও সবজিকে পাকায়। ফল ও সবজি যদি বাতাস চলাচল স্থানে রাখা হলে ফল ও সবজি দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে।
৫. গ্যাসীয় উপাদানের পরিবর্তন ফল ও সবজির গুদামে অক্সিজেন কমিয়ে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়িয়ে দিলে আর ফল সবজি না পেকে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকবে।
৬. বিভিন্ন রাসায়নিক ও প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে ফল ও সবজির সংরক্ষণ বাড়ানো যায়।
৭. এভাবে ফল ও সবজির সংরক্ষণকাল বাড়ানো যেতে পারে। তবে কখনই রাসায়নিক বা হরমোন বা কীটনাশক অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা যাবে না।

অনুশীলনী - ২
খাদ্য প্রক্রিয়াজাকরণে পরিচ্ছন্নতা ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ অনুশীলন
প্রাসঙ্গিক তথ্য : খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হয়। কারণ খাদ্য সরাসরি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং শরীরে তার প্রভাব তাড়াতাড়ি প্রদর্শন করে। খাদ্য সঠিকভাবে তার কাজ শরীরে করবে যখন সেই খাদ্য হবে স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবাণুমুক্ত। তাই শিল্প এলাকাটি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ কাজগুলো নিম্নরূপ হবে-

১. উৎপাদন কক্ষে যাতে মশা-মাছি প্রবেশ করতে না পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।
২. যে সব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার হবে তা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
৩. বোতল, ক্যাপ আগে থেকেই স্টেরিলাইজ করে তা শুষ্ক করে রাখতে হবে।
৪. আচার বা জেলির বোতল ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় ও সিরাপ ছাঁকার জন্য কাপড় অবশ্যই পরিষ্কার করে রাখতে হবে।
৫. হ্যান্ড গ্লোভস ও অ্যাপ্রোন পরিষ্কার থাকবে।
৬. নারী শ্রমিকেরা বাড়ি থেকে পড়ে আসা কাপড় পরিবর্তন করে ফ্যাক্টরির জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধান করবে। পুরুষ ও নারি শ্রমিক উভয়ের মাথার চুল টুপি দিয়ে ঢাকা থাকবে।
৭. সকল কর্মীর হাত ও পায়ের নখ ছোট থাকবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
৮. উৎপাদন এলাকায় জুতা ব্যবহার করা যাবে না।
৯. উৎপাদনের আগের দিন সবাই জানবে যে আগামী দিন কী উৎপাদন হবে এবং এর জন্য উৎপাদন কর্মকর্তার একটি সঠিক পরিকল্পনা বা প্লান থাকবে।
১০. চুলা ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করার সময়ে সকলের সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

১১. ল্যাবরেটারিতে সবার প্রবেশ ঠিক নয়। শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সেখানে কাজ করবেন এবং কেমিক্যাল পরিমাপ ও খাদ্য যোগ করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক হতে হবে। কারণ রাসায়নিকের সামান্য তারতম্যের ফলে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের গুণগত মান অনেক পার্থক্য হতে পারে এমনকি বিপদও হতে পারে।
১২. টয়লেট ব্যবহারের পর হাত ও পা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ শেষে করণীয় কাজ

১. সমস্ত কক্ষ পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালো করে ধুঁয়ে নিতে হবে।
২. যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে প্রয়োজনে ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে।
৩. ব্যবহৃত জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে।
৭. উৎপাদিত খাদ্যগুলো প্রস্তুত করে ঢেকে রাখতে হবে।
৮. ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরাগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে জেট বা সাবান সহযোগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

**অনুশীলনী - ৩ : কলার চিপস তৈরির দক্ষতা অর্জন :**

**প্রাসঙ্গিক তথ্য :** কলা আমাদের দেশে সারা বছর পাওয়া যায়। ছোট বা বড় সবাই কলা খেতে পছন্দ করে। কলা দিয়ে বিভিন্ন খাবারও তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে কলা দুই ভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা- কাঁচা কলা ও পাকা কলা। কাঁচা কলা সবজি হিসেবে এবং পাকা কলা ফল হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করা হয়। প্রক্রিয়াজাতকৃত কলা খুবই কম ব্যবহার করা হয়। চিপস ও মিক্স ফ্রুট জ্যামে অনেকে কলা ব্যবহার করেন। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছু পণ্য কলা থেকে তৈরি করা যেতে পারে। তার মধ্যে কলার ঝাল ও মিষ্টি চিপস (তেলে ভাজা), কলার জ্যাম, ক্যান্ডি ও স্কোয়াশ। চিপস ও ক্যান্ডি পলিথিনে এবং জ্যাম ও স্কোয়াশ কাচের বোতলে সংরক্ষণ করা যায়। কাঁচা কলা দিয়ে তৈরি চিপস বেশ মুখরোচক ও মজাদার খাবার। স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে যারা অধিক লাভের আশা করে তাদের জন্য কলার চিপস তৈরি একটা সম্ভাবনাময় কর্মকাণ্ড হতে পারে।

**প্রয়োজনীয় উপকরণ :**

| | |
|---|---|
| ১. বড় কাঁচকলা (সাগর কলা) | - ১ কেজি (৮টি) |
| ২. সয়াবিন তেল | - ৩৫০ গ্রাম |
| ৩. ভিনেগার | - ২২ লিটার |
| ৪. বিট লবণ | - ৫০ গ্রাম |
| ৫. গোল মরিচ | - ১০ গ্রাম |
| ৬. পলিথিন | - ১০০ গ্রাম |
| ৭. জ্বালানি | - ৫ কেজি |

**প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :**

| |
|---|
| ১. স্প্লাইসার |
| ২. মাঝারি আকারের কড়াই |
| ৩. মাঝারি আকারের প্লাস্টিক গামলা |
| ৪. চিকন কাঠি |
| ৫. ছিদ্রযুক্ত চামচ |
| ৬. ট্রে ও সিলিং মেশিন |

চিত্র : কলা হতে চিপস তৈরি

কলার চিপস তৈরির দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজগুলো ধারাবাহিক অনুসরণ করতে হবে :

১. পরিপক্ব ও দোষমুক্ত কাঁচাকলা সংগ্রহ করতে হবে।

২. কাঁচা কলার খোসা ফেলে দিয়ে সাদা অংশ ওজন করে নিতে হবে।

৩. তারপর ভিনেগারে ৫/১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর ভিনেগার থেকে উঠিয়ে নিতে হবে।

৪ স্লাইসার গরম তেলের কড়াই এর উপর্ ধরে কলা স্লাইস করতে হবে। কলার স্লাইস গরম তেলের উপর পড়ার সাথে সাথে জট বাঁধতে পারে। তাই জট বাঁধার আগেই চিকন কাঠির সাহায্যে জট ছাড়িয়ে নিতে হবে।

৫. এবার কলার স্লাইসগুলো অল্প আঁচে হালকা হলুদ রঙে ভেজে তুলতে হবে।

৬. কলার চিপস পরিষ্কার ও শুকনা জায়গায় রেখে ঠাণ্ডা করতে হবে।

৭. ভাজা কলার চিপস প্লাস্টিক বোলের মধ্যে দিয়ে বিট লবণ ও গোল মরিচের গুঁড়া বা পাউডার ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৮. পলিথিন প্যাকেটে চিপস বায়ুরোধী করে বন্ধ করে লেবেল লাগাতে হবে। এই অবস্থায় কলার চিপস খাবার পরিবেশন বা বিক্রির জন্য বাজারজাত করা যাবে।

৯. সাধারণত ১ কেজি চিপস তৈরি করতে ৩ কেজি কলার প্রয়োজন হয়।

সতর্কতা :

১. কলার স্লাইসগুলো হালকা আঁচে ভাজতে হবে।

২. স্লাইসগুলো যেন জট না বাঁধে সেদিকে সতর্ক হতে হবে।

অনুশীলনী-৪ : লবণের দ্রবণে ফল, সবজি ও মসলা সংরক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য : টাটকা ফল ও সবজি পানিতে রেখে দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জীবাণু আক্রমণ করে এবং পচন ক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু ফল ও সবজি আস্ত বা কেটে টুকরা করে লবণ যোগ করলে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন করে। এই এসিড লবণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। পচনের জন্য দায়ী অন্যান্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দমন করে। ল্যাকটিক এসিডের পরিমাণ ০.৮% - ১.৫% হয়ে থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

১. লবণ

২. ফল, সবজি ও মসলা। যেমনঃ আম, কাঁঠাল, জলপাই, শসা, পিঁয়াজ, রসুন, আমলকী, চালতা, কামরাঙ্গা ইত্যাদি।

৩. বটি বা ছুরি

৪. প্লাস্টিকের গামলা

৫. পলিথিন ব্যাগ

৬. চালনি বা মশারির কাপড়

৭. কাঠের টুকরা বা পাথর

৮. স্যালোমিটার

লবণের দ্রবণে ফল ও সবজি সংরক্ষণে দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজ অনুসরণ করতে হবে :

১. কাঁচা, টাটকা, তাজা, পরিপক্ব ফল ও সবজি বাছাই করতে হবে।

২. ফল বা সবজি ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে আঁটি ফেলে লম্বালম্বিভাবে মোটা ফালি করে ২% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৩. একটি বড় পাত্রে ক্রমান্বয়ে লবণ যোগ করে লবণের ঘনত্ব প্রথম সপ্তাহে ৮-১০% ভাগ উন্নীত করতে হবে।
৪. এরপর প্রতি সপ্তাহে লবণ যোগ করে লবণের ঘনত্ব আরও ১% করে বাড়াতে হবে।
৫. ৪ - ৬ সপ্তাহ পর ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া শেষ হবে এবং লবণের ঘনত্ব তখন ১৬% এ উন্নীত হবে। স্যালোমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা লবণের ঘনত্ব পরিমাপ করা যাবে।
৬. ফল ও সবজির টুকরা একটি বড় পাত্রে লবণের দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে উপরে কাঠের ঢাকনা দিয়ে তার উপর পাথর দিয়ে চাপা দিতে হবে।
৭. এভাবে সংরক্ষিত ফল বা সবজি ১ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে।
৮. এই ফল ও সবজি যে কোনো সময়ে সংগ্রহ করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত করা যাবে।
৯. তবে খাবার তৈরির পূর্বে ফল বা সবজিতে ৪৫ - ৫০$^0$ C তাপমাত্রায় ১০ - ১৪ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে লবণাক্ততা কমিয়ে নিতে হবে।

সতর্কতা :
১. লবণের ঘনত্ব ১৬% এর কম হলে ফল বা সবজিতে পচন ধরতে পারে।
২. ফল ও সবজি সংগ্রহকালীন সময় নরম হলে তা পরিহার করতে হবে।

অনুশীলনী - ৫ : ফ্রিজিং পদ্ধতিতে মটরশুঁটি ও গাঁজরের ফালি সংরক্ষণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য : খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রেফ্রিজারেশন ও ফ্রিজিং পদ্ধতি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ এটি খাদ্যের গুণগত মান বিশেষ করে বাহ্যিক গুণাবলি প্রায় তাজা খাদ্যের মতো রাখে। ফ্রিজিং হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণের এমন একটি স্বল্প তাপ ব্যবহারকারী পদ্ধতি যেখানে তাপমাত্রা ০$^0$ C এর নিচে রাখা হয়। এ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য ও তার আশেপাশে অবস্থানকারী অনুজীবসমূহের কার্যকলাপকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, যাতে তারা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে খাদ্যকে নষ্ট করতে না পারে। ফলমূল ও শাকসবজিকে প্রায় সতেজভাবে পাবার জন্য বা ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই এ পদ্ধতির প্রয়োগ। এ পদ্ধতিতে রাখা খাদ্য সামগ্রীর বর্ণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ সাধারণত অটুট থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :
১. আস্ত মটরশুঁটি
২. পুষ্ট গাঁজর
৩. লবণ
৪. পলিথিন প্যাকেট
৫. স্লাইসার
৬. ফ্রিজার

চিত্র : ফ্রিজিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ

ফ্রিজিং পদ্ধতিতে মটরশুঁটি ও গাজরের ফালি সংরক্ষণের জন্য নিম্নের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে-
১. মোটা, পুষ্ট, পরিপক্ব, লাল কালার দেখে গাঁজর সংগ্রহ করে ভালো করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।
২. অতঃপর স্লাইসার দিয়ে গাজর চিকন চিকন ফালি করে কাটতে হবে।

৩. পুষ্ট ও পরিপক্ব সবুজ মটরশুঁটি সংগ্রহ করে খোসা ছাড়িয়ে ভিতরের দানাগুলো আলাদা করতে হবে।

৪. অতঃপর গাজরের ফালি ও মটরশুঁটির দানাগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে ২-৩ মিনিট ফুটন্ত পানিতে ডুবিয়ে ব্লাঞ্চিং বা ভাপিয়ে নিতে হবে। এতে শাকসবজির শারীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক কার্যকলাপ অর্থাৎ সবজির গন্ধ ও এনজাইমের ক্রিয়া দূর হয়।

৫. গরম পানিতে গাঁজরের ফালি ও মটরশুঁটির দানা ডুবানোর পর তা উঠিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত প্যাকেটে ভরে মুখ বেধে ডীপ ফ্রিজারে সাজিয়ে রাখতে হবে।

৬. ডীপ ফ্রিজারের তাপমাত্রা ১৮$^0$ C এ রাখতে হবে। এ তাপমাত্রার বেশি বা কম হলে গাজর বা মটরশুঁটি বেশি দিন সংরক্ষণ করা যাবে না। বেশির ভাগ ফলের হিমায়ন বিন্দু ০$^0$ C থেকে ৪$^0$ C তাপমাত্রার মধ্যে থাকে। যখন তাপমাত্রা ১৮$^0$ C এ পৌঁছে, তখন সবজি ও ফলের ভিতরের সব পানিই জমে যায়। এ তাপমাত্রায় ফল ও সবজি ১ বছর সংরক্ষণ করা যায়।

৭. ডীপ ফ্রিজারে সংরক্ষিত সবজির প্যাকেট থেকে অর্ধেক বা অল্প কিছু বের করার পর অবশিষ্ট সবজি পুনরায় ডীপ ফ্রিজারের রাখা হলে সেগুলো ভালো থাকে না। এজন্য প্যাকেটগুলো ছোট আকারে করতে হবে। যাতে তা ফ্রিজার থেকে বের করলে পুনরায় রাখার প্রয়োজন না হয়।

সতর্কতা :

১. ফ্রিজারের তাপমাত্রা কমানো যাবে না।

২. সবজিগুলো দোষমুক্ত হতে হবে।

অনুশীলনী - ৬ : রিফ্র্যাক্টোমিটারের ব্যবহার

প্রাসঙ্গিক তথ্য : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার একটি সাধারণ যন্ত্র। এর এক প্রান্তে চোখ লাগিয়ে দেখার জন্য একটি আই পিস বা লেন্স থাকে। লেন্স দিয়ে দেখার সময় ভেতরের স্কেল অস্পষ্ট দেখালে এটা ঘুরিয়ে স্কেল স্পষ্ট করা যায়। রিফ্রাক্টোমিটার এর অপর প্রান্তে একটি স্যাম্পল প্লেট থাকে। এই প্লেটটি তুলে ফলের রস দিয়ে রসের ব্রিক্স রিডিং নেয়া হয়।

চিত্র : রিফ্র্যাক্টোমিটার ও তার রিডিং

উপকরণ :

১. রিফ্রাক্টোমিটার

২. আমের রস বা আখের রস বা চিনির পানি

৩. বিকার

রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা ফলের রস বা সিরাপের ব্রিক্স নির্ণয়করণ নিম্নরূপ :

১. একটি রিফ্রাক্টোমিটার সংগ্রহ করে তা সঠিকভাবে কাজ করে কিনা দেখে নিতে হবে।

২. কয়েকটি বিকারে কয়েক পদের ফলের রস যেমন- আমের রস, আখের রস, গুড়ের পানি, চিনির পানি নমুনা হিসেবে নিতে হবে।

৩. রিফ্রাক্টোমিটার এর ঢাকনা তুলে যে কাচের নমুনা তল বা প্লেট দেখা যাবে তার উপর ১-২ ফোঁটা ফলের রস দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৪. তারপর মিটারের আইপিসে দেখে ব্রিক্স এর রিডিং পড়তে হবে।

৫. যন্ত্রের ভিতর যে স্কেলটা দেখা যায় তাতে $০^0$ থেকে $১০০^0$ ব্রিক্স দাগ কাটা আছে। স্কেলের রং থাকে হালকা হলুদ বা নীলাভ। যখন ০ ব্রিক্স নির্ণয় করা হয় তখন ঐ দ্রব্যের নির্দিষ্ট মান অনুসারে নিচ থেকে মান পর্যন্ত স্কেলটি একটু শেড বা কালো দেখায়।

৬. যে রেখা বরাবর স্কেলের রং -এর হালকা অংশ ও গাঢ় অংশ একসাথে মিশে থাকে ঐ স্থানে যে মান লিখা থাকে সেটাই ঐ বস্তুর প্রকৃত ডিগ্রি ব্রিক্স। যেমন: উপরের শেড অংশ স্কেলের ১৫ দাগে মিশেছে। তাই এই নমুনা ফলের ডিগ্রী ব্রিক্স হচ্ছে ১৫।

৭. এভাবে কয়েকবার একই ফলের রসের নমুনা পরীক্ষা করে গড় করে ব্রিক্স বা টিএসএস (টোটাল সলুবল সলিডস) নির্ণয় করা হয়।

সতর্কতা :

১. স্যাম্পল প্লেটে বেশি রস দেয়া যাবে না।

২. প্রকৃত ডিগ্রি ব্রিক্স মাপার জন্য আই পিস সামনে পিছনে ঘুরিয়ে নিতে হয়।

অনুশীলনী - ৭ : সোলার ড্রায়ার ব্যবহার

প্রাসঙ্গিক তথ্য : সোলার ড্রায়ার হচ্ছে উন্মুক্ত সূর্যালোকের তাপ ব্যবহার করে ফল ও সবজির টুকরা বা খাদ্যদ্রব্যকে শুকানোর যন্ত্র। যন্ত্রটি দেখতে একটি বাক্সের মতো যা সহজেই তৈরি করা যায়। সোলার ড্রায়ার তৈরি করতে বাঁশ, কাঠ, পলিথিন বা কাচ ব্যবহার করা হয়। এই ড্রায়ারের উপরের দিকে পলিথিন শিট বা কাচ ব্যবহার করা হয় এবং চতুর্পার্শ্বে কাঠ ও বাঁশ যা উত্তাপ কুপরিবাহী ব্যবহার করা হয়। গ্রামীণ যে সকল এলাকায় গ্যাস বা বিদ্যুৎ নেই সে সব জায়গায় সোলার ড্রায়ার খুবই কার্যকর। সৌর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফল ও সবজি শুকানো হয় বিধায় একে সোলার ড্রায়ার বলে। এই ড্রায়ারের মধ্যভাগে সূর্যের আলো পড়ে ভিতরে থাকা সৌর সংগ্রাহক দ্বারা শোষিত হয়ে বায়ু উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত বায়ু ড্রায়ারের উপরের ছিদ্র দ্বারা বের হয়ে যায়। ড্রায়ারের সামনের ছিদ্র দ্বারা বায়ু প্রবেশ করে এবং উত্তপ্ত হয়ে উপর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ড্রায়ারে রাখা ফলমূল বা সবজির টুকরা শুষ্ককরণ করে। এ ড্রায়ারের মধ্যভাগে প্রায় $৫০-৬০^0$ C তাপমাত্রা উঠতে পারে। মুক্ত সৌর শুষ্ককরণের চেয়ে এ পদ্ধতিতে খাদ্যসামগ্রী দ্রুত শুকানো যায়। খাদ্য দ্রব্যের মান ভালো ও নিরাপদ থাকে।

উপকরণ :

১. সোলার ড্রায়ার

২. খাদ্যসামগ্রী

৩. সূর্যালোক

৪. লম্বা কাঠি

৫. ছুরি বা বটি

৬. গাবের রস ও কাঠ কয়লা।

চিত্র : সোলার ড্রায়ার

সোলার ড্রায়ার ব্যবহার পদ্ধতি :

১. একটি সাধারণ সোলার ড্রায়ার বা টিপিক্যাল ব্রেস ড্রায়ার সংগ্রহ করতে হবে।

২. সম্ভব হলে সোলার ড্রায়ারের উপকরণ দ্বারা তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।

৩. যে সফল ও সবজি শুষ্ককরণ করতে হবে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
৪. অতঃপর তা নিয়মানুযায়ী ড্রায়ারের শুকানোর উপযোগী করে ছুরি বা বঁটি দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে নিতে হবে।
৫. ফল ও সবজির বোঁটার অংশ, মাঝের বিচি ও দানা বা শক্ত অংশ ফেলে দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশ টুকরা করতে হবে। যেমন- মটরশুঁটি সীমের বিচি, গাজরের মাঝের অংশ বাদ দিয়ে উপরের অংশ ইত্যাদি।
৬. মাঝে মাঝে একটি কাঠি দিয়ে টুকরাগুলোকে উলট পালট করে দিতে হবে।
৭. সোলার ড্রায়ারের খাদ্য শুষ্ককরণের সময় ধুলিকণা, মশা-মাছি, কীটপতঙ্গ হতে রক্ষা পাওয়া যায় যা উন্মুক্ত সূর্যালোকে শুকানো পাওয়া যায় না।
৮. গাবের রস ও কাঠ কয়লা দিয়ে ড্রায়ারের ভিতরের অংশ কালো রঙ করে দিতে হবে।
৯. ড্রায়ারের সামনে ছিদ্র দিয়ে বাতাস প্রবেশ যেন করতে পারে এবং উপরের ছিদ্র দিয়ে উত্তপ্ত বাতস বের হওয়ার ছিদ্র থাকতে হবে।
১০. ঝড়, বৃষ্টি বাদলের পূর্বেই ড্রায়ার নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে।
১১. এই ড্রায়ার দ্বারা ২-৩ দিনে ৫ কেজি ফল বা সবজি শুকানো যায়।

সতর্কতা :
১. ড্রায়ার বার বার খোলা যাবে না। এতে করে শুষ্ককরণের ব্যাঘাত ঘটবে।
২. কিছু দিন পর পর ড্রায়ার জীবাণুমুক্ত করে নেয়া উচিত।
৩. ড্রায়ার সকালে, দুপুরে ও বিকালে সূযের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়।

অনুশীলনী - ৮ আম ও আনারসের স্কোয়াশ তৈরি অনুশীলন

(ক) আমের স্কোয়াশ তৈরি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ফলের রস বা পাল্পের সাথে চিনি মিশ্রণের পর যে পানীয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে স্কোয়াশ বলে। এটি শরবত জাতীয় সুস্বাদু পানীয়। রসালো যে কোনো ফল থেকে প্রধানত স্কোয়াশ তৈরি করা হয়। স্কোয়াশে সংরক্ষক হিসেবে সোডিয়াম মেটাবাই সালফেট ও সোডিয়াম বেনজয়েট ব্যবহার করা যায়। রসে রং রাখতে চাইলে সোডিয়াম বেনজয়েট ব্যবহার করা যেতে পারে। পটাসিয়াম বা সোডিয়াম মেটা বাইসালফেট ব্যবহার করলে রসের রং চলে যায়। স্কোয়াশে ৪০ শতাংশ চিনি এবং ২৫ শতাংশ ফলের রস থাকে। স্কোয়াশে সাইট্রিক এসিডের প্রয়োজন হতে পারে। তবে তা ৩.৫ শতাংশের বেশি যেন না হয়। পাকা আম, কমলালেবু, আনারস, তরমুজ, কালোজাম ও পাতি লেবু ইত্যাদি হতে মজাদার স্কোয়াশ তৈরি করা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| ১. পাকা আমের পাল্প | ৪.৫ কেজি |
| ২. সাইট্রিক এসিড | ১১৫ গ্রাম |
| ৩. সোডিয়াম বেনজয়েট | ৬ গ্রাম |
| ৪. চিনি | ৩ কেজি |
| ৫. পানি | ২.৩ লিটার |

যন্ত্রপাতি : ছুরি, ব্লেন্ডার, চুলা, সসপ্যান, চামচ, ছাঁকনি, বোতল, লেবেল ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালি :

১. উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের পাকা দোষমুক্ত আম নির্বাচন করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।
২. ছুরি দিয়ে আমের বহিরাবরণ বা খোসা ছিলে ও কেটে আঁটি ফেলে দিতে হবে।
৩. আমের মাংসল অংশ কেটে ছোট ছোট টুকরা করতে নিতে হবে।
৪. তারপর ব্লেন্ডারে সামান্য পানি দিয়ে উক্ত টুকরাগুলো ৪-৫ মিনিট চালিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে।
৫. আমের রস বা পাল্প সব একত্র করে একটি সসপ্যানে নিয়ে চুলায় ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে।
৬. পরিমাণমতো চিনি, সাইট্রিক এসিড ও পানি একত্রে মিশাতে হবে।
৭. চুলায় চড়িয়ে চিনি না গলা পর্যন্ত উক্ত মিশ্রণে ভালোভাবে ফুটিয়ে সিরাপ তৈরি করে নিতে হবে।
৮. সিরাপ ছাঁকনি দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়।
৯. সোডিয়াম বেনজয়েট মেপে কুসুম গরম পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে।
১০. ঠাণ্ডা চিনির সিরাপে আমের পাল্পরিত রস মিশাতে হবে।
১১. সোডিয়াম বেনজয়েট চামচ দিয়ে নেড়ে ভালোভাবে মিশাতে হবে।
১২. পূর্বে স্কোয়াশ রাখার বোতল ফুটন্ত পানিতে জীবাণুমুক্ত করে পানি ঝরিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
১৩. প্রস্তুতকৃত স্কোয়াশ বোতলে ভরে বায়ুরোধী করে সিল করতে হবে।
১৪. বোতলে লেবেল লাগিয়ে ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও আলোকবিহীন কক্ষে গুদামজাত করে রাখতে হবে।
১৫. উপরোক্ত উপকরণ হতে ১০ লিটার আমের স্কোয়াশ তৈরি করা যাবে।

সতর্কতা :

১. স্কোয়াশে কোন গ্যাস বা বুঁদবুঁদ তৈরি হয়েছে কিনা তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে হবে।
২. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে।

(খ) আনারসের স্কোয়াশ তৈরি

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ফলের রস থেকে প্রস্তুত পানীয় বা (Fruit Beverage) এর মধ্যে স্কোয়াশ অন্যতম। অন্যান্য পানীয়গুলো হচ্ছে কার্ডিয়াল, ক্রাস, ফ্রুট সিরাপ ইত্যাদি। স্কোয়াশ একদিকে পানীয় হিসেবে যেমনঃ তৃপ্তিদায়ক তেমনি বেশ পুষ্টিকর। স্কোয়াশ তৈরির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ফলের রসকে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়। আমের মত আনারস হতেও সুস্বাদু স্কোয়াশ তৈরি করা যায়। আনারসের স্কোয়াশে রস ২৫%, টিএসএস ৪০%, এসিডিটি ১.২৫% এবং সোডিয়াম বেনজয়েট .১% থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

| উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|
| ১. আনারসের রস | ১.২৫ লিটার |
| ২. চিনি | ২ কেজি |
| ৩. সাইট্রিক এসিড | ৬০ গ্রাম |
| ৪. সোডিয়াম বেনজয়েট | ৫ গ্রাম |
| ৫. পানি | ১.৪৩ কেজি বা লিটার |

যন্ত্রপাতি: অ্যালুমিনিয়ামের সসপ্যান, ঝুড়ি, কাচের পাত্র, ব্লেন্ডার কড়াই, হাতা, ছুরি, বঁটি, রস ছাঁকনি (নাইলনের) কাচের মগ, বোতল, চুলা, কর্ক ও মোম ইত্যাদি।

চিত্র : আনারস টুকরাকরণ

চিত্র : আনারসের রস তৈরিকরণ

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পুষ্ট, দোষমুক্ত পাকা আনারস সংগ্রহ করতে হবে। ১ কেজি আনারস হতে ৬০০-৭০০ গ্রাম রস পাওয়া যাবে। সুতরাং সে অনুযায়ী আনারস নিতে হবে।
২. আনারসের পাতা ফেলে খোসা ছাড়িয়ে চোখ তুলে ফেলতে হবে।
৩. আনারসের অক্ষীয় বা মাঝের অংশ কেটে বাদ দিতে হবে।
৪. ছুরি দিয়ে আনারস কেটে ছোট ছোট টুকরা করতে হবে।
৫. ব্লেন্ডার মেশিনে সামান্য পানি বা রস নিয়ে আনারসের টুকরাগুলো ব্লেন্ড করে নিতে হবে।
৬. আনারসের পাল্প নাইলনের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে শুধু রস আলাদা করে কাচের পাত্রে রাখতে হবে।
৭. উপরোক্ত উপাদান আলাদাভাবে মেপে নিতে হবে এবং তা থেকে ৫ কেজি স্কোয়াশ তৈরি করা যাবে।
৮. রস সসপ্যানে গিয়ে চুলায় ৭৫$^{0}$ C তাপমাত্রায় ৫ মিনিট ফুটিয়ে পাস্তুরাইজ করে নিতে হবে।
৯. চিনি এবং সাইট্রিক এসিড শুকনা অবস্থায় মিশাতে হবে।
১০. চিনি ও এসিডের মিশ্রণে পানি মিশাতে হবে।
১১. এই দ্রবণটি চুলায় দিয়ে চিনি না গলা পর্যন্ত নাড়তে হবে এবং ফুটিয়ে নিতে হবে।
১২. কাপড়ের সাহায্যে দ্রবণটি ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে।
১৩. এই ঠাণ্ডা দ্রবণে আনারসের পাস্তুরিত রস মিশাতে হবে।
১৪. সোডিয়াম বেনজয়েট কুসুম গরম পানিতে গুলিয়ে রসে মিশাতে হবে।
১৫. জীবাণুমুক্ত বোতলে স্কোয়াস ভরে রাখতে হবে।
১৬. বোতলে লেবেল লাগিয়ে শুষ্ক, ঠাণ্ডা ও আলোবিহীন জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

সতর্কতা :

১. রস ছাঁকার পর বেশি সময় মুক্ত অবস্থায় রাখলে রস তিতা হয়ে যেতে পারে।
২. সংরক্ষণ রুমের তাপমাত্রা অবশ্যই কম হতে হবে।

অনুশীলনী : ৯ : পেয়ারা ও আনারসের জেলি তৈরি অনুশীলন

(ক) পেয়ারার জেলি তৈরি প্রণালি

প্রাসঙ্গিক তথ্য : পেয়ারা একটি সুস্বাদু ও বহুল পরিচিত ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে পেয়ারা উৎপাদিত হলেও বৃহত্তর বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি ও কাউখলী, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর ও কাপাসিয়া

এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা পেয়ারার জন্য বিখ্যাত। এসব অঞ্চলে পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। উৎপাদন মৌসুমে কম দামে পেয়ারা কিনে জেলি বানিয়ে সংরক্ষণ করে যেমন সারা বছর খাওয়া যায়, তেমন পেয়ারার অপচয় ও রক্ষা করা যায়। পেয়ারার জেলি একটি অর্ধকঠিন ও স্বচ্ছ পদার্থ যার মধ্যে ৪৫ ভাগ পেয়ারার রস ও ৫৫ ভাগ চিনি থাকে। জেলিতে মোট দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ বা টিএসএস থাকে ৬৫-৬৭ ভাগ। এছাড়া জেলিতে পেকটিন জমাট বাঁধার জন্য এবং সাইট্রিক এসিড স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপাদান : ১ কেজি পেয়ারার জেলী তৈরির জন্য নিম্নের উপাদানসমূহের প্রয়োজন হয়।

| উপাদান | পরিমাণ | যন্ত্রপাতি | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. পেয়ারার রস | ৪৫০ গ্রাম | ৮. সাদা মার্কিন কাপড় (১ টুকরা) বা স্কুয়ু ফিল্টার প্রেস যন্ত্র | ১টি |
| ২. চিনি | ৫৫০ গ্রাম | ৯. সসপ্যান | ১টি |
| ৩. পেকটিন | ৫ গ্রাম | ১০. প্লাস্টিক বোল বা গামলা | ১টি |
| ৪. সাইট্রিক এসিড | ৫ গ্রাম | ১১. স্টেইনলেস স্টিলের চামচ ও ছুরি | ২টি |
| ৫. পটাশিয়াম মেটা বাইসালফাইট (KMS) | ০.৬গ্রাম | ১২. মগ | ১টি |
| ৬. জেলি কভারিং মোম | পরিমাণমত | ১৩. চুলা | ১টি |
| ৭. রিফ্রাক্টোমিটার | ১টি | ১৪. কাচের বোতল | কয়েকটি |

চিত্র : পেয়ারার জেলি তৈরির উপকরণ

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পরিপুষ্ট দোষমুক্ত, টাটকা এক ভাগ কাঁচা ও দুই ভাগ পাকা পেয়ারা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

২. পেয়ারাগুলো বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৩. ছুরির সাহায্যে পেয়ারাগুলো সমান টুকরা করে কেটে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এতে করে পেয়ারার রং কালো হবে না।

৪. পেয়ারার সমান ওজনের পানিতে পেয়ারার টুকরাগুলো রেখে চুলায় খুব নরম হওয়া পর্যন্ত তাপ দিতে হবে। প্রতি কেজি পেয়ারাতে ১ গ্রাম সাইট্রিক এসিড যোগ করলে ফলাফল সন্তোষজনক হয়। সাইট্রিক এসিডের পরিবর্ত লেবুর রস দেয়া যায়।

৫. পেয়ারার নরম টুকরাগুলো চামচ দ্বারা নাড়াচাড়া করে পানির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। প্রায় ৫০ মিনিট সিদ্ধ হবার পর মার্কিন কাপড় দ্বারা ছেঁকে সিদ্ধ পেয়ারার বিচি ফেলে পরিষ্কার রস নিতে হবে। হু ফিল্টার প্রেস যন্ত্র দিয়েও রস সংগ্রহ করা যায়। হু ফিল্টার প্রেস (রস সংগ্রহ যন্ত্র)

৬. জেলি তৈরি করার প্রত্যেকটি উপাদান পরিমাণমতো মেপে আলাদা করা হয়।

৭. মাপকৃত চিনি থেকে অল্প চিনির সাথে পেকটিন উত্তমভাবে মিশানো হয় এবং পরে সব চিনির সাথে উত্তমরূপে মিশিয়ে নিয়ে রসে যোগ করা হয়। রসের সাথে চিনি পেকটিন মিশ্রণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হয়।

৮. সম্পূর্ণ মিশ্রণটি চুলায় নিয়ে তাপ দিতে হবে এবং চামচ দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে।

৯. যখন মিশ্রণের টিএসএস ৬৫-৬৭% (রিফ্রাক্টোমিটার এর ডিগ্রি এর ব্রিক্স পাঠ অনুযায়ী) হবে তখন চুলা হতে নামিয়ে নিতে হবে। ময়লা জমলে চামচ দিয়ে তুলে নিতে হয়।

১০. রিফ্রাক্টোমিটার না থাকলে জেলি পরিষ্কার জন্য একটি হাতার সাহায্যে রস উপর থেকে ধীরে ধীরে পড়তে দিতে হবে। রস তরল আকারে না পড়ে পাত বা পর্দার মতো বা ছাড়া ছাড়া ভাবে পড়তে থাকলে তখন বুঝতে হবে জেলি জমবে। এ পরীক্ষাটি জেলির শীটিং পরীক্ষা বলে।

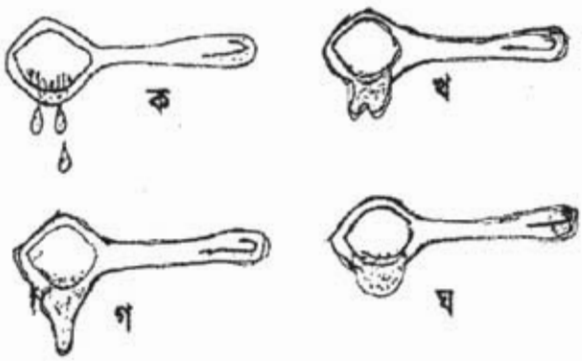


ক) আরও ফোটাতে হবে
খ) ফোটাতে হবে
গ) এসিড বা লেবুর রস মিশাতে হবে
ঘ) জ্বাল থেকে নামাবার মুহূর্ত (সমাপ্তি স্ফুটনাঙ্ক)

চিত্র : জেলীর শিটিং পরীক্ষা

১১. হালকা গরম পানিতে কে এম এস গুলিয়ে নিতে হবে। তারপর সাইট্রিক এসিড ও গুলানো কে এম এস জেলির মিশ্রণে যোগ করতে হবে।

১২. জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলে জেলি ঢালতে হবে।

১৩. কিছুটা ঠান্ডা হলে মোম গলিয়ে বোতলের মুখে মোম যোগ করতে হবে। মোম ময়লা হলে কাপড় দ্বারা ছেঁকে নিতে হবে।

১৪. বোতলের মুখে ছিপি লাগিয়ে বোতলের বাইরের দিকটা ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে।

১৫. বোতলগুলো শুষ্ক, পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত জায়গায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে।

১৬. অতঃপর বোতলগুলো লেবেলিং করে খাবার জন্য পরিবেশন বা বাজারজাত করতে হবে।

সতর্কতা :

১. অতিমাত্রায় পাকা পেয়ারা পরিহার করতে হবে।

২. ব্যবহৃত চিনিতে যেন ময়লা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

৩. রস ফোটার সময় ময়লা বা গাঁদ সৃষ্টি হলে তা চামচ দিয়ে তুলে ফেলে দিতে হবে।

(খ) আনারসের জেলী তৈরি অনুশীলন

প্রসঙ্গিক তথ্য : জেলী একটি অর্ধকঠিন সুস্বাদু খাদ্য যা ৪৫ ভাগ ওজনের ফলের রস এবং ৫৫ ভাগ ওজনের চিনির মিশ্রণে তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণে দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ শতকরা ৬৫-৬৭ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলের মধ্যে পেকটিন ও এসিডের পরিমাণ কম হলে পেকটিন ও এসিড যোগ করা হয়। জেলির গঠন পেকটিন, চিনি ও এসিড মিশ্রণের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। এ ছাড়া মৌসুমি আনারস, আম, পেয়ারা কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ভরা মৌসুমে কম দামে কিনে জেলি তৈরি করে সারা বছর খাওয়া যায়। তাই জেলি তৈরি আর্থিক ভাবেও অত্যন্ত লাভজনক।

উপকরণ :

১. আনরসের রস - ৪৫০ গ্রাম

২. চিনি - ৫৫০ গ্রাম

৩. পেকটিন - ৪-৫ গ্রাম

আনারসের জেলির দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের কাজগুলো ধারাবহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১. পরিপুষ্ট, দোষমুক্ত, টাটকা, মোটামুটি একই আকারের পাকা আনারস সংগ্রহ করতে হবে।

২. আনারস থেকে উপরের পাতার মুকুট আলাদা করে নিতে হবে।

৩. ইস্পাতের ছুরি দিয়ে আনারসের খোসা ভালোভাবে আলাদা করতে হবে যেন কোনো চোখ না থাকে।

৪. আনারসের মাঝের অংশকে কোর বা শাস বলে তা ফেলে দিতে হবে।

৫. ইস্পাতের ছুরি দিয়ে আনারসকে ছোট ছোট টুকরা করতে হবে।

৬. রস সংগ্রাহক মেশিন (জুসার মেশিন) টুকরা আনারস থেকে রস সংগ্রহ করতে হবে। পাটায় বেটেও করা যায়।

৭. পাতলা স্বচ্ছ রস সাদা পরিষ্কার কপড় দিয়ে রসকে ভালোভাবে ছেঁকে নিতে হবে।

৮. রস, চিনি ও পেকটিন সঠিকভাবে ওজন করে ও মিশিয়ে চুলায় বসিয়ে উতপ্ত করতে হবে।

৯. জেলী রাখার জন্য কাচের বোতল ও ঢাকনাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

১০. শুষ্ক জীবাণুমুক্ত বোতলের উপরি ভাগ $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি জায়গা রেখে জেলি ভরতে হবে।

১১. বোতলের উপরিভাগ গলানো মোম দিয়ে বোতলের মুখ ভালোভাবে আঁটকিয়ে দিতে হবে।

১২. শুষ্ক পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত জায়গায় বোতলগুলো রেখে ঠাণ্ডা করতে হবে।

১৩. প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত লেবেলের সাহায্যে লেবেলিং করতে হবে। এখন আনারসের জেলি খাবার জন্য পরিবেশন কিংবা বাজারজাত করা যাবে।

অনুশীলনী ১০ : চিনির সিরায় ফল সংরক্ষণ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য : আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রচুর বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ফলের সমাহার দেখা যায়। এ সকল ফলের মধ্যে বেশির ভাগ ফলের উৎপাদন এত বেশি হয় যে, অনেক ফল বাজারে কম মূল্যে বিক্রি হয়। এমনকি অনেক ফল বিক্রি না হয়ে পচে নষ্ট হয়। এসকল ফলকে যদি বাণিজ্যিকভাবে চিনির সিরায় সংরক্ষণ করা যায় তবে ফলের অপচয়ের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়। তদুপরি সারাবছর সুস্বাদু ফলের স্বাদ পাওয়া যায়। ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে চিনির সিরায় ফলের টুকরা সংরক্ষণ। এ পদ্ধতিতে পাকা আম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু চিনির সিরায় ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

প্রয়োজনীয় উপাদান :

| উপাদান | পরিমাণ | যন্ত্রপাতি | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. ফলের টুকরা | ৮০০ গ্রাম | ৬. স্টীলের ডিস | ১টি (বড়) |
| ২. চিনি | ৫৪০ গ্রাম | ৭. কাঁচের জার | কয়েকটি |
| ৩. সাইট্রিক এসিড | ৮ গ্রাম | ৮. সসপ্যান | ১টি |
| ৪. কেএমএস | ৫০০ মিলিগ্রাম | ৯. বঁটি ও ছুরি | ১টি করে |
| ৫. পানি | ১ লিটার | ১০. ওয়েট ব্যালেন্স | ১টি |

সংরক্ষণ পদ্ধতি :

১. প্রথমে উপরের উপকরণগুলো পরিমাণমত মেপে সংগ্রহ করে নিতে হবে।

২. ফলগুলো বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে, বোঁটা ফেলে, খোসা ছিলে নিতে হবে।

৩. পাকা ফলের শাঁস ২ সে.মি. x ২ সে.মি. x ২ সে.মি. আকারে টুকরা করতে হবে।

৪. পরিমাণমতো চিনি নিয়ে তার সাথে পরিমাণমতো পানি দিয়ে চুলায় জ্বাল দিয়ে চিনির সিরা তৈরি করতে হবে। এই সিরার ডিগ্রি ব্রিক্স রিফ্রাক্টোমিটার দ্বারা মেপে ৩৫ ভাগ করতে হবে। ৫৪০ গ্রাম চিনির সাথে ১ লিটার পানি মিশিয়ে জ্বাল দিলে ৩৫° ব্রিক্স চিনির সিরা তৈরি হবে।

৫. পাতলা কাপড় দিয়ে চিনির সিরার ছেঁকে ১০ মিনিট ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৬. এবার পরিমাণমতো সাইট্রিক এসিড ও কেএমএস চিনির দ্রবণে যোগ করতে হবে।

৭. ফলের টুকরাগুলোকে জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলে ভরে চিনির দ্রবণ যোগ করতে হবে যাতে করে ফলের টুকরাগুলো চিনির দ্রবণে ডুবে থাকে।

৮. হালকা করে বোতলের ছিপি এঁটে বোতলগুলো ফুটন্ত পানিতে রেখে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। এতে করে বোতলের ভিতরের বায়ুশূন্য হবে।

৯. বোতলগুলো ফুটন্ত পানি থেকে সরিয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় ছিপি এঁটে দিতে হবে।

১০. ঠাণ্ডা হয়ে এলে ছিপি ও বোতলের সংযোগস্থলে মোম গলিয়ে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করতে হবে।

১১. বোতলগুলো লেবেল লাগিয়ে শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

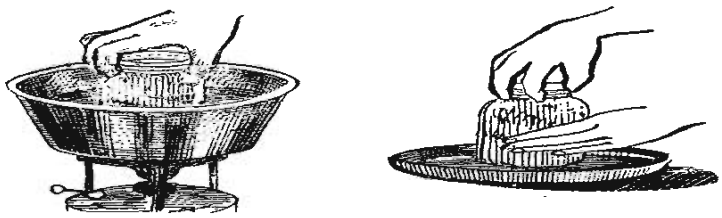

চিত্র : বোতল বায়ুশূন্য করা

অনুশীলনী - ১১ : ফলের রস বা পাল্প সংরক্ষণ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বাংলাদেশে বহুরকম মৌসুমকালীন ফল উৎপাদিত হয়। এ সকল ফলের রস একদিকে যেমন যথেষ্ট পুষ্টিকর অপরদিকে তেমনি মুখরোচক ও তৃপ্তিদায়ক। মৌসুমকালীন সময়ে এ সকল ফল সস্তায় পাওয়া যায় বলে এ ফলগুলোর রস বা পাল্প সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ড্রামে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এতে করে ফলের অপচয় রোধ এবং ফলের রস হতে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে পরিবার ও দেশের আয় বাড়ানো যায়।

| উপাদান/যন্ত্রপাতি | পরিমাণ |
|---|---|
| ১. বিভিন্ন প্রকার (আম, আনারস, কমলালেবু, পেঁপে, কালোজাম, লিচু) ফল | প্রয়োজনমতো |
| ২. অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি | ২টি |
| ৩. স্টেইনলেস স্টিলের চালুনি | ২টি |
| ৪. রস নিষ্কাশন যন্ত্র, ব্লেন্ডার ও হ্যান্ড প্রেস | ৩টি |
| ৫. পুরু প্লাস্টিকের ড্রাম | কয়েকটি |
| ৬. চুলা | ১টি |
| ৭. কাঁচের বা স্টিলের হাতা ইত্যাদি | ১টি |
| ৮. হিমায়িত কক্ষ | ১টি |
| ৯. কেএমএস ও সাইট্রিক এসিড | পরিমাণমতো |
| ১০. চিনি | পরিমাণমতো |

সংরক্ষণ পদ্ধতি :

১. পাকা, অক্ষত, দোষমুক্ত, পরিপুষ্ট ফল সংগ্রহ করতে হবে।

২. বিশুদ্ধ পরিষ্কার পানিতে ফলগুলো ধুয়ে নিতে হয়।

৩. ফলের প্রকার অনুযায়ী রস নিষ্কাশন পদ্ধতি বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ক) আমের ক্ষেত্রে : আমের পাকা রসালো ফলগুলো কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর প্রত্যেকটি ফল হাতে নিয়ে হাতের তালুর মধ্যে ডলে শাঁস নরম করে নিতে হবে। একটি বড় পাত্রের মুখে স্টিলের চালনি বসিয়ে আমের ছাল তুলে চালনির উপর ঘষলে তলার পাত্রে রস জমা হবে।

খ) কমলালেবুর ক্ষেত্রে : কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে কোয়াগুলো দুই টুকরা করে কেটে জুস এক্সট্রাকটর যন্ত্রের সাহায্যে রস নিষ্কাশন করে নিতে হবে।

গ) আনারসের ক্ষেত্রে : আনারসের ছাল ছিলে খোসা, চোখ ও মাঝের শক্ত অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশ ছোট ছোট টুকরা করা হয়। তারপর তা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে ছেঁকে রস আলাদা করা হয়।

ঘ) আঙ্গুরের ক্ষেত্রে : পরিষ্কার করে ধোয়া আঙ্গুর গুচ্ছকে মোটা কাপড়ের টুকরার মধ্যে একটু ঢিলেভাবে বেঁধে কাঠের তৈরি হ্যান্ড প্রেসের সাহায্যে চাপ দিয়ে রস নিংড়ে বের করতে হয়।

ঙ) পেয়ারা, কালোজাম, লিচু ও পেঁপে : স্টেইনলেস স্টিলের চালনি ডেকচির মুখে বসিয়ে পাকা ফলগুলোর খোসা ফেলে চালনিতে ঘসে ঘসে রস বের করে ছেঁকে নিতে হবে।

৪. কাচের পাত্রে এই সকল ফলের রস বেশিক্ষণ ধরে রাখা ঠিক নয়। প্রতি কেজি রসে ৫০ গ্রাম হিসেবে চিনি যোগ করতে হবে।

৫. ফলের রস বা পাল্প সংরক্ষণের বড় প্লাস্টিকের ড্রাম সংগ্রহ করে তা বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। স্টীলে বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

৬. ফল থেকে রস সংগ্রহ করে পরিষ্কার অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি বা কড়াইতে ফলের রসকে ছেঁকে নিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হবে। এ সময় হাতার সাহায্যে রস ঘন ঘন নাড়াচাড়া করতে হবে।

চিত্র : জুসার বা জুস এক্সট্রাক্টর

৭. ফলের রসের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ক্ষেত্র বিশেষে চিনি, এসিড বা লবণের প্রয়োজন হয়। মিষ্টি আমের রসে অল্প পরিমাণ সাইট্রিক এসিড ও সামান্য এসিডযুক্ত ফলের রসে অল্প পরিমাণ চিনি মিশ্রণের প্রয়োজন হয়।

৮. রসকে পাস্তুরিত করে উত্তপ্ত অবস্থাতেই অনুমোদিত হারে কেএমএস যোগ করতে হবে।

৯. অতঃপর জীবাণুমুক্ত পুরু ড্রামে ভরে সাথে সাথে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে সিল করতে হবে।

১০. এই ফলের রসভর্তি ড্রাম ১৬$^0$ C এর নিচে হিমায়িত কক্ষে সংরক্ষণ করা হয়।

সতর্কতা :

১. রস ধারণকারী ড্রাম অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

২. সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

অনুশীলনী - ১২ : মিশ্র ফলের জ্যাম তৈরি :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : আমাদের দেশে প্রাপ্ত সব ফল থেকেই জ্যাম তৈরি করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, তাল, বেল, লিচু, টমেটো ও কলা। গাঁজর, বাঙ্গি ও তরমুজ থেকেও জ্যাম তৈরি করা সম্ভব। জ্যাম তৈরিতে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এককভাবে এবং কখনও কখনও যৌথভাবে মিক্স ফ্রুট জ্যাম তৈরি করা হয়। বর্তমানে বাজারে এই মিক্স ফ্রুট জ্যামের দারুন চাহিদা রয়েছে। ইচ্ছা করলে মিক্স ফ্রুট জ্যাম আমরা বাড়িতে বসেও তৈরি করে এর মজাদার স্বাদ গ্রহণ করতে পারি বা স্থানীয়ভবে তৈরি করে বিক্রিও করতে পারি।

| উপাদান | পরিমাণ | উপাদান/যন্ত্রপাতি | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. আমের পাল্প | ২ কেজি | ১০. মোম | পরিমাণমতো |
| ২. আনারসের পাল্প | ২ কেজি | | |
| ৩. পেঁপের পাল্প | ২ কেজি | ১২. ফলের পাল্প নেয়ার যন্ত্র | |
| ৪. কলার পাল্প | ০.৫ কেজি | ১৩. রিফ্রাক্টোমিটার | |
| ৫. অন্য যে কোনো ফলের পাল্প | ০.৫ কেজি | ১৪. সসপ্যান | |
| ৬. চিনি | ৭ কেজি | ১৫. প্লাস্টিক বোল বা গামলা | |
| ৭. পেকটিন | ৮০ গ্রাম | ১৬. স্টেইনলেস স্টীলের চামচ ও ছুরি | |
| ৮. সাইট্রিক এসিড | ৫০ গ্রাম | ১৭. চুলা, মগ ও অন্যান্য | |
| ৯. কেএমএস | ৬ গ্রাম | | |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. উল্লিখিত ফলগুলো হতে উন্নত মানের পাল্প সংগ্রহ করতে হবে।
২. সব ফলের পাল্প একত্রে মিশিয়ে ব্লেন্ডিং মেশিনে ভালোভাবে ব্লেন্ডিং করতে হবে। প্রয়োজনে ছেঁকে পাল্প থেকে সব আঁশ জাতীয় পদার্থগুলো দূর করতে হবে।
৩. পরিমাণমতো পরিষ্কার চিনি ব্যবহার করতে হবে।
৪. পরিমাণমতো সব উপাদান মেপে আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে।
৫. অল্প কুসুম গরম পানিতে কেএমএস গুলিয়ে রাখতে হবে।

চিত্র : মিক্সড ফ্রুট জ্যাম

৬. চিনি ও পেকটিন শুকনা অবস্থায় ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে তারপর এর সাথে আস্তে আস্তে পাল্প মিশ্রণ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
৭. উপরোক্ত মিশ্রিণ সসপ্যানে নিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হবে এবং পেকটিন মিশাতে হবে।
৮. মিশ্রণ যখন ঘন বা অর্থ কঠিন অর্থাৎ মিশ্রণের টিএসএস ৬৭.৫% হবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণের টিএসএস দেখার জন্য রিফ্রাক্টোমিটার ব্যবহার করতে হবে।
৯. জ্যাম গরম অবস্থায় সাইট্রিক এসিড ও কেএমএস-এর দ্রবণ যোগ করে ভালভাবে নেড়ে মিশাতে হয়।
১০. জ্যাম রাখার বোতলগুলো ফুটন্ত পানিতে জীবাণুমুক্ত করে পানি শুকিয়ে রাখতে হবে।
১১. কাচের বোতলে গরম জ্যাম ঢালতে হবে এবং জ্যাম ঠাণ্ডা হলে মোম গলিয়ে জ্যামের উপরিভাগে দিয়ে বায়ুরোধী করতে হবে।
১২. বোতল ভালোভাবে ছিপি লাগিয়ে ভেজা কাপড় দিয়ে বোতলের বাইরের দিক মুছে নিতে হবে।
১৩. বোতলের গায়ে লেবেল লাগিয়ে শুষ্ক, ঠান্ডা ও আলোবিহীন স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

সতর্কতা :

১. ব্যবহৃত চিনি ময়লাবিহীন হতে হবে।
২. পেকটিন খারাপ হলে জ্যাম থেকে গন্ধ পাওয়া যায়।
৩. পেকটিন ও এসিডের ব্যবহার সঠিক হতে হবে তা না হলে জ্যাম সেট করবে না।

অনুশীলনী - ১৩ আমড়ার ঝাল আচার ও বরই তেঁতুলের চাটনি তৈরি অনুশীলনী

(ক) আমড়ার ঝাল আচার তৈরি :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : আমড়া ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মুখরোচক ফল। বাংলাদেশে দুই প্রজাতির আমড়া পাওয়া যায়। যেমন বিলাতি আমড়া (Golden apple) ও দেশি আমড়া (Hog plum) । বিলাতি আমড়া দেশের প্রায় সব স্থানেই কমবেশি জন্মে তবে বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চল আমড়ার জন্য বিখ্যাত। মৌসুমে এ অঞ্চলে প্রচুর আমড়া উৎপাদিত হয় এবং তখন খুবই অল্প দামে পাওয়া যায়। এ সময়ে আমড়া প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন খাদ্য তৈরি করে আমড়া সংরক্ষণ করা যায়।

**প্রয়োজনীয় উপাদান :**

| উপাদান | পরিমাণ | উপাদান/যন্ত্রপাতি | পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. পরিপক্ব কাঁচা আমড়া | ১ কেজি | ৯. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড | ১০ গ্রাম |
| ২. লবণ | ২০ গ্রাম | ১০. সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম (প্রতি কেজি আচারে) |
| ৩. চিনি | ২৫ গ্রাম | ১১. গ্রাইন্ডিং / ব্লেন্ডিং মেশিন | পরিমাণমতো |
| ৪. লাল মরিচ | ১২৫ গ্রাম | ১২. ওয়েট ব্যালান্স | |
| ৫. পোস্তদানা | ২০ গ্রাম | ১৩. চুলা | |
| ৬. মেথি | ৫ গ্রাম | ১৪. গামলা, কড়াই/ সসপ্যান | |
| ৭. সরিষার তেল | ৫০০ মি. লি. | ১৫. কাঠের চামচ | |
| ৮. ভিনেগার | ১২৫ গ্রাম | ১৬. স্টেইনলেস স্টীলের চা চামচ, টেবিল চ কাটা চামচ ও ছুরি | |

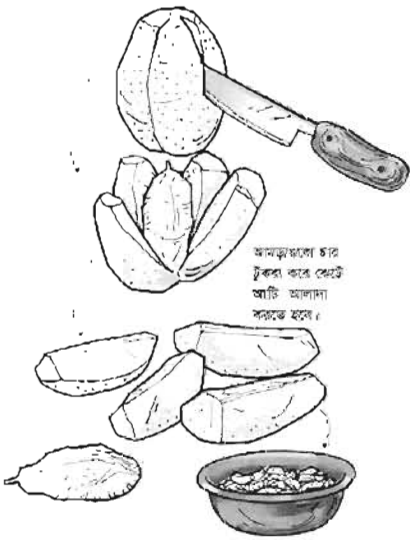


চিত্র : ঝাল আচার তৈরির জন্য আমড়া টুকরাকরণ

**প্রস্তুত প্রণালি :**

১. পরিপুষ্ট, দোষমুক্ত ও পরিপক্ব কাঁচা আমড়া সংগ্রহ করতে হবে।

২. আমড়াগুলো পরিষ্কার পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

৩. স্টেইনলেস স্টিলের ছুরির সাহায্যে পাতলা করে আমড়ার খোসা বা চামড়া কেটে ছাড়িয়ে নিতে হবে।

৪. কাঁটা চামচের সাহায্যে খোসা ছাড়ানো আমড়া ছিদ্র করতে হবে।

৫. শতকরা ১ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে (১ গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড + ৯৯ গ্রাম পানি) ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার পানিতে আমড়া ধুয়ে নিতে হবে।

৬. আমড়াগুলোকে চার টুকরা করে কেটে আঁটি আলাদা করতে হবে।

৭. ব্লেন্ডারের সাহায্যে ভিনেগারের সাথে হলুদের গুঁড়া, মেথি গুঁড়া ও মরিচের গুঁড়া ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৮. কড়াই বা সসপ্যানে সরিষার তেল গরম করে এর মধ্যে ভিনেগার মিশ্রিত মসলা ঢেলে কিছুক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পর চিনি ও লবণ মিশিয়ে একটু জ্বাল দিয়ে কভারিং সস তৈরি করতে হবে।

৯. কভারিং সসে আমড়ার টুকরাগুলো দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ জ্বাল দিতে হবে।

১০. আমড়ার টুকরাগুলো নরম হলে আচার চুলা থেকে নামিয়ে প্রতি কেজি আচারে ১ গ্রাম সোডিয়াম বেনজয়েট সংরক্ষক দ্রব্য হিসেবে মিশাতে হবে।

১১. আচার রাখার জন্য কাচের পরিষ্কার বোতল ও ছিপি ফুটন্ত গরম পানিতে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করে পানি ঝরিয়ে ফেলতে হবে।

১২. জীবাণুমুক্ত বোতলে আমড়ার আচার ভরে বায়ুশূন্য করে বোতলের মুখ আটকে দিতে হবে।

১৩. বোতলে লেবেল লাগিয়ে বাজারজাত করা যাবে অথবা শুষ্ক, পরিষ্কার ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

সতর্কতা :

১. আচার ব্যবহারের সময় শুকনা চামচ ব্যবহার করতে হবে। ভেজা চামচে আচার নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২. মসলা বেশি ব্যবহার করলে আচার তিতা হয়ে যেতে পারে।

(খ) বরই ও তেঁতুলের (বরতুলের) টক মিষ্টি চাটনি তৈরি :

প্রাসঙ্গিক তথ্য : বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাই বরই ও তেঁতুল গাছ জন্মে থাকে। বরই ও তেঁতুল উভয়ই মুখরোচক ফল। দুটো ফল থেকেই আলাদা আলাদাভাবে আচার ও চাটনি তৈরি করা হয়ে থাকে। উভয় ফল একসাথে করে চাটনি তৈরি করলে অবশ্যই তা আরও সুস্বাদু ও মজাদার লাগবে। বর্তমানে বরই ও তেঁতুলের মিশ্র চাটনি খুবই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এটি তৈরিতে খরচ কম এবং পদ্ধতি সহজ।

প্রয়োজনীয় উপাদান :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান/যন্ত্রপাতি | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | পাকা শুকানো বরই | ১ কেজি | ১২. | দারুচিনির গুঁড়া | ১ গ্রাম |
| ২. | তেঁতুল | ২৫০ কেজি | ১৩. | গোলমরিচের গুঁড়া | ১ গ্রাম |
| ৩. | চিনি | ১.২৫ কেজি | ১৪. | জয়ফল | ১ গ্রাম |
| ৪. | লবণ | ৩৮ গ্রাম | ১৫. | জৈয়ত্রী | ১ গ্রাম |
| ৫. | মেথির গুঁড়া | ৫ গ্রাম | ১৬. | সরিষার তেল | ১০০ মি.লি. |
| ৬. | কালিজিরা | ৮ গ্রাম | ১৭. | এসিটিক এসিড | ১ গ্রাম |
| ৭. | শুকনা মরিচ গুঁড়া | ৬ গ্রাম | ১৮. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |
| ৮. | সরিষার গুঁড়া | ১২ গ্রাম | ১৯. | রিফ্রাক্টোমিটার | |
| ৯. | জিরার গুঁড়া | ২.৫ গ্রাম | ২০. | ওয়েট ব্যালান্স | |
| ১০. | লবণের গুঁড়া | ০.৫ গ্রাম | ২১. | সসপ্যান, ঝাঁঝরি, কাঠের হাতা | |
| ১১. | এলাচের গুঁড়া | ০.৫ গ্রাম | ২২. | বঁটি, ছুরি, চামচ ও বোতল ইত্য | |

চিত্র : চাটনির জন্য বরই তৈরি করা

প্রস্তুত প্রণালি :

১. পুষ্ট, পাকা ও দোষমুক্ত শুকনা বরই ও তেঁতুল সংগ্রহ করতে হবে।
২. পরিষ্কার পানিতে বরই ধুয়ে বোঁটা ফেলে পরিমাণমতো পানিতে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে।
৩. পরদিন বরইগুলো ধুয়ে অল্প পানিসহ চুলায় জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।
৪. বরই নরম হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে কাঠের হাতা দিয়ে চেপে চেপে পাল্প বা শাঁস বের করতে হবে।
৫. পরিমাণমতো তেঁতুল ভালোভাবে ধুয়ে সামান্য পানি মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে।
৬. এবার বাঁশের চালনিতে তেঁতুল নিয়ে হাত দিয়ে ঘসে তেঁতুলের শাঁস বের করতে হবে এবং বিচি ফেলে দিতে হবে।
৭. অতঃপর বরই ও তেঁতুলের শাস মিশিয়ে তার সাথে চিনি যোগ করে ভালভবে মিশিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হবে।
৮. মিশ্রণটি ফুটতে শুরু করলে প্রথমে লবণ ও পরে অন্যান্য মসলা এক এক করে যোগ করতে হবে।
৯. মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে নির্ধারিত পরিমাণ এসিটিক এসিড যোগ করে নাড়তে হবে।
১০. অন্য একটি কড়াইয়ে পরিমাণমতো সরিষার তেল ভালভাবে ফুটিয়ে বরই ও তেঁতুলের মিশ্রণের সাথে যোগ করতে হবে।
১১. মিশ্রণটি কাঙ্ক্ষিত ঘনত্বে এলে (৬২° ব্রিক্স) সামান্য গরম পানিতে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলিয়ে চাটনির সাথে যোগ করতে হবে এবং ভালোভাবে মিশিয়ে চুলা হতে নামিয়ে ফেলরতে হবে।
১২. জীবাণুমুক্ত বোতলে চাটনি ভরে লেবেল লাগিয়ে ভালভাবে ছিপি বন্ধ করে শুষ্ক, পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুশীলনী - ১৪ : চালকুমড়ার মোরব্বা তৈরি

প্রাসঙ্গিক তথ্য : মোরব্বা খাবার মজলিশের এক উল্লেখযোগ্য উপকরণ। পারিবারিক প্রয়োজনে বা কোন মেহমানদারির সময় মোরব্বা পরিবেশন করা হয়ে থাকে। মোরব্বার মধ্যে চালকুমড়া মোরব্বা আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত। এটি একটি উপাদেয় ও স্থানীয় খাদ্য। সাধারণত বাড়িতে নতুন মেহমান বা মুরব্বিদের আগমনে এই মোরব্বা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এছাড়া আধুনিক অনেক গৃহিণীর ঘরে নিজের হাতে তৈরি চালকুমড়ার মোরব্বা শোভা পায়। মোরব্বার গুণগত মান উন্নত হলে এটি যেমন মুখরোচক হয় তেমনি এর দ্বারা সুনামও অর্জন করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মোরব্বা দ্বারা পরিবারের কৌলিন্য বজায় রাখা হয়। এই মোরব্বা বেকারি শিল্পেও প্রচুর ব্যবহার হয়। ফ্রুট কেক তৈরির একটি প্রধান উপাদান এই মোরব্বা। শিশু-কিশোররা এই মোরব্বা খুবই আনন্দের সাথে খেয়ে থাকে।

প্রয়োজনীয় উপাদান :

| | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১. | মাঝারি আকৃতির চালকুমড়া | ১টি |
| ২. | চিনি | ১.৫ কেজি |
| ৩. | চুন | ২% |
| ৪. | সাইট্রিক এসিড | ০.১% |
| ৫. | খাবার সোডা | ২ গ্রাম |
| ৬. | দুধ | ১০ মি.লি |
| ৭. | পানি | ১ লিটার |
| ৮. | আইসিং সুগার | ২০০ গ্রাম |

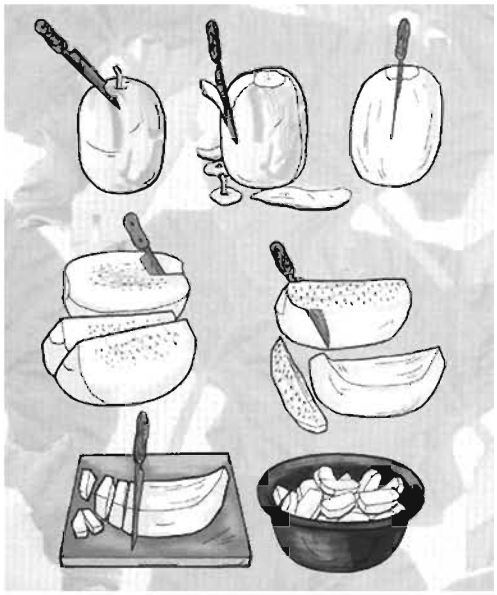

চিত্র : চালকুমড়ার মোরব্বা তৈরিকরণ

**প্রস্তুত প্রণালি :**

১. পুষ্ট, দোষমুক্ত, নিখুঁত মধ্যম আকৃতির একটি পাকা চালকুমড়া বাজার হতে সংগ্রহ করতে হবে।

২. চালকুমড়াটি লম্বালম্বিভাবে কেটে ভিতরের বিচিসহ নরম অংশ কেটে ফেলতে হবে এবং কুমড়ার উপরের খোসা ছিলে ফেলতে হবে।

৩. চালকুমড়াকে ২ সে.মি. x ৫ সে.মি. আকারে কেটে কয়েকটি টুকরা করতে হবে।

৪. স্টেইনলেস স্টিলের কাঁটা চামচ বা খেজুর কাঁটা দিয়ে চালকুমড়ার টুকরাগুলোকে ভালো করে কেঁচে নিতে হবে।

৫. পানিতে চুন গুলে ২% দ্রবণ তৈরি করে রেখে দিতে হবে। চুনের দ্রবণের ওপর থেকে পরিষ্কার পানি আলাদা করে তাতে কুমড়োর টুকরাগুলো ১.৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এতে চালকুমড়ার টুকরাগুলো শক্ত হবে এবং সহজে গলে যাবে না।

৬. তারপর টুকরাগুলো চুনের পানি হতে তুলে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে টুকরাগুলোকে ৮-১০ মিনিট ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করতে হবে।

৭. সিদ্ধ করার সাথে সাথে আবার ঠাণ্ডা করতে হবে।

৮. একটি সসপ্যানে পানি ও চিনি দিয়ে জ্বাল দিয়ে সিরা তৈরি করে নিতে হবে। সিরায় ময়লা দেখা দিলে দুধ দিয়ে ময়লা কাটিয়ে নিতে হবে।

৯. সিরার ভিতর চালকুমড়ার টুকুরা দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। জ্বাল দিয়ে সিরা খুব ঘন ও আঠালো হলে খাবার সোডা পানিতে গুলে সিরায় দিতে হবে।

১০. সিরা ঘন হয়ে এলে (সিরার ব্রিক্স ৬০°) হলে তাপ দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর ২৪ ঘণ্টা রেখে দিয়ে আবার তাপ দিয়ে ঘনত্ব বাড়াতে হবে।

১১. ব্রিক্স ৬৫° হলে আবার ২৫ ঘণ্টা রেখে কুমড়ার টুকরার উপর সিরা দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে ব্রিক্স ৭০° তে উন্নীত করতে হবে।

১২. পরদিন সকালে উক্ত কুমড়ার টুকরায় ০.১% সাইট্রিক এসিড মিশাতে হবে। তারপর সামান্য তাপ দিয়ে চুলা হতে নামাতে হবে।

১৩. চিমটার মোরব্বার টুকরাগুলো সিরা হতে উঠিয়ে টিস্যু পেপারে জড়িয়ে ট্রেতে ফ্যানের নিচে ঠাণ্ডা করতে হবে।
১৪. মোরব্বা ঠাণ্ডা হলে আইসিং সুগারে গড়িয়ে জীবাণুমুক্ত কাচের বোতলে সংরক্ষণ করতে হবে।

সতর্কতা :
১. চিনিতে কোনো ময়লা থাকা যাবে না।
২. মোরব্বা টুকরা যেন গলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনুশীলনী-১৫ : টমেটের কেচাপ তৈরি

প্রাসঙ্গিক তথ্য : টমেটো খুবই উপকারী মুখরোচক ও পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি। আমাদের দেশে শীতকালে এ সবজি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইদানীং এ সবজি গ্রীষ্মকালেও উৎপাদন শুরু হয়েছে। মৌসুমে টমেটো উদ্বৃত্ত ও দামে সস্তা হয়ে যায়। এ সময়ে টমেটো প্রক্রিয়াজাত করে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী তৈরি করে সারা বছর সংরক্ষণ করা যায়। যেমন- টমেটো রস, পেস্ট, সস ও কেচাপ। টমেটো কেচাপ একটি মুখরোচক ও উপাদেয় খাদ্য। গৃহিণীরা টমেটো কেচাপ তৈরি করে দীর্ঘদিন রেখে নিজেরা খেতে পারেন বা বাজারজাত করে অর্থ আয় করতে পারেন। কেচাপে মোট দ্রবণীয় সলিডস বা ঘনত্ব অবশ্যই ২৫% হবে, কিন্তু টমেটো সসে এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেচাপে টমেটো সলিডস এর পরিমাণ কমপক্ষে ১২% রাখতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপাদান :

| | উপাদান | পরিমাণ | | উপাদান | পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | টমেটোর রস | ৩ কেজি | ৭. | শুকনা মরিচ গুঁড়া | ১ গ্রাম |
| ২. | কাটা পেঁয়াজ | ৪০ গ্রাম | ৮. | লবণ | ১৫ গ্রাম |
| ৩. | কাটা রসুন | ৩ গ্রাম | ৯. | চিনি | ১০০ গ্রাম |
| ৪. | লবঙ্গ | ১ গ্রাম | ১০. | ভিনেগার | ১৫০ মি.লি. |
| ৫. | এলাচ ও গোলমরিচ গুড়া | ২ গ্রাম | ১১. | সোডিয়াম বেনজয়েট | ১ গ্রাম |
| ৬. | দারুচিনি গুঁড়া | ১ গ্রাম | | | |

চিত্র : টমেটো কেচাপের উপকরণ চিত্র : বোতলে কেচাপ ঢালা হচ্ছে

প্রস্তুত প্রণালি :
১. সম্পূর্ণ পুষ্ট ও পাকা দোষমুক্ত ৫ কেজি টমেটো বাছাই করে নিয়ে বিশুদ্ধ পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।
২. ধোয়া টমেটোগুলোকে চার টুকরা করে কেটে একটি কাঠি দিয়ে টমেটোর বিচিগুলো আলাদা করে ফেলতে হবে।

৩. একটি অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে টমেটোর টুকরাগুলো নিয়ে কিছু পানি সহযোগে জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।
৪. টমেটো সিদ্ধ হলে চুলা থেকে নামিয়ে সিদ্ধ টমেটো একটি বাঁশের চালুনির উপর রাখতে হবে। চালুনি সসপ্যানের উপর রাখতে হবে।
৫. একটি কাঠের হাতা দ্বারা টমেটো পিষে রস বের করতে হবে। রস সসপ্যানে জমা হবে। হাতার পরিবর্তে একটি পরিষ্কার মগের তলা দ্বারাও এ কাজ করা যেতে পারে।
৬. চালুনিতে পিষে টমেটোর খোসা ও অন্যান্য অংশ ফেলে সসপ্যানে প্রাপ্ত রস দিয়ে কেচাপ তৈরি করতে হবে। ৫ কেজি টমেটো হতে ৩ কেজি রস পাওয়া যাবে।
৭. কেচাপ তৈরির সব মসলা পরিমাণমতো মেপে নিতে হবে। সোডিয়াম বেনজয়েট, চিনি, লবণ, আলাদাভাবে মেপে রেখে সব মসলা একত্রে নিয়ে একটি মসলার ব্যাগ বা থলি করতে হবে।
৮. এখন টমেটোর রস ও একটি সসপ্যানে করে চুলায় চড়িয়ে তিন ভাগের এক ভাগ চিনি (৩৫ গ্রাম) দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। মসলার ব্যাগ উক্ত সসপ্যানে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে তা রসের মধ্যে ডুবে থাকে।
৯. জ্বাল দেওয়ার ফলে রস যখন এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে ঘন হয়ে আসবে তখন মসলার ব্যাগটি তুলে হাত বা কাঠি দিয়ে চেপে রস নিংড়ে ব্যাগটি ফেলে দিতে হবে।
১০. এবার উক্ত রসে ভিনেগার বা সিরকা, লবণ ও বাকি চিনি (৬৫ গ্রাম) ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
১১. জ্বাল দিয়ে রস প্রয়োজনমতো ঘনত্বে আনতে হবে।
১২. চুলা থেকে নামানোর পূর্বে সোডিয়াম বেনজয়েট রসের সাথে মিশাতে হবে।
১৩. কেচাপ গরম থাকা অবস্থায় জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে বায়ুরোধী করে ছিপি লাগাতে হবে।
১৪. বোতলের গায়ে লেবেল লাগিয়ে ঠাণ্ডা করে শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুশীলনী-১৬ : ভিনেগার তৈরি

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ভিনেগার বা সিরকা আমাদের দেশে বহুল পরিচিতি ও বহুল ব্যবহৃত একটি অম্লীয় তরল পদার্থ। এতে সাধারণত ৪-৬% এসিটিক এসিড থাকে। আচার, চাটনি, সস তৈরি ও পোল্ট্রি ফার্মে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ফল ও সবজি ফার্মেন্টেশন বা চোলাইকরণ প্রক্রিয়ায় ভিনেগার তৈরি করা যায় অথবা বাজার হতে ঘন কৃত্রিম ভিনেগার কিনে তার পাতলা দ্রবণ করেও ভিনেগার তৈরি করা যায়। কৃত্রিম ভিনেগার তৈরি পদ্ধতি নিম্নরূপ

প্রয়োজনীয় উপাদান :

| | উপাদান |
|---|---|
| ১. | ফুড গ্রেড গ্লোসিয়াল এসিটিক এসিড |
| ২. | চিনি |
| ৩. | সসপ্যান ও কড়াই |
| ৪. | স্বচ্ছ কাঁচের বোতল ও ছাঁকনি |
| ৫. | চুলা ও ছাঁকার কাপড় |
| ৬. | পানি |

প্রস্তুত প্রণালি :

১. একটি পরিষ্কার সসপ্যান সংগ্রহ করে তাতে ৯৫০ মি.লি পানি সংগ্রহ করতে হবে।
২. উক্ত পানি ১০ মিনিট ধরে চুলায় কড়া জ্বালে ফুটিয়ে নিতে হবে।
৩. তারপর পানি ঠাণ্ডা করে ছেকে নিতে হবে।
৪. এরপর উক্ত ঠাণ্ডা পানিতে ৫০ মি.লি. গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।
৫. অত:পর তা জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার সরু বোতলে ভরলে সাদা ভিনেগার তৈরি হবে।
৬. লাল ভিনেগারের জন্য ৫০ গ্রাম চিনি একটি কড়াইয়ে নিয়ে চুলায় ভেজে নিতে হবে।
৭. চিনি পুড়ে লাল হলে ঠাণ্ডা করে পূর্বে ফুটন্ত ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে নিতে হবে।
৮. অত:পর এসিটিক এসিড, পানি ও পোড়া চিনির দ্রবণ মিশিয়ে লাল ভিনেগার তৈরি হবে।

সতর্কতা :

১. চিনি যেন বেশি পুড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
২. বোতলে সংরক্ষিত ভিনেগার অবশ্যই বায়ুরোধী হতে হবে।

## তথ্যপঞ্জি

১. উচ্চমাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা (১ম পত্র)- ড. আনিসুর রহমান।
২. তাজা শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানীকারক নির্দেশিকা- হর্টেক্স ফাউন্ডেশন।
৩. ফুড প্রসেসিং এ্যান্ড প্রিজার্ভেশন ট্রেড-২ মোঃ আবু আবদুল্লাহ।
৪. ফল প্রক্রিয়াজতকরণ- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।
৫. জাতীয় বৃক্ষ আমগাছ- সাব্বির আহমেদ।
৬. এগ্রোবেসড ফুড-২ (ভোকেশনাল)- মোঃ মোসারফ হোসেন, ১৯৯৯ ইং।
৭. কলা উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল- ড. আবদুল হক ও ড. মোশারফ হোসেন।
৮. স্বল্প ব্যয়ে ফল ও সবজি সংরক্ষণ- ড. শ্রীকান্ত শীল, NADP, হর্টেক্স ফাইন্ডেশন, ঢাকা।
৯. ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ- ড. মো আমিরুজ্জামান, বাকাশিবো, ঢাকা।
১০. খাদ্য ও রান্না স্বাদ রহস্য- এইচ.এম সোলায়মান
১১. গৃহিনীর অভিধান- বেলা দে, আকাশ বাণী, কোলকাতা।
১২. রান্না খাদ্য পুষ্টি- অধ্যাপিকা সিদ্দিকা কবির, ঢাকা।
১৩. খাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ- ১ (কৃষি ডিপ্লোমা) : মো. মোসারফ হোসেন, হক পাবলিকেশন, ঢাকা।
১৪. রসায়ন (১ম পত্র)- ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী ও হারাধন নাগ।
১৫. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।
১৬. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ- বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা নীতিমালা ও কর্মসূচী।
১৭. এগ্রোবেসড ফুড-১ ও ২ (ভোকেশনাল): মো. মোসারফ হোসেন, ২০০৯ইং।
১৮. এগ্রোবেসড ফুড (কৃষি ডিপ্লোমা) : মোঃ মোসারফ হোসেন ও আলাউদ্দিন পিকে, ২০০২ইং।
১৯. বাংলাদেশে ফলমূল ও শাকসবজি সংরক্ষণ- মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী, ইউনিসেফ, ঢাকা।

২০২০

২০২০ শিক্ষাবর্ষ

এগ্রোবেসড ফুড-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য